প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ আষাঢ়, ১৩৪৭

মুদ্রাকর
শ্রীসুকুমার চৌধুরী
বাণীশ্রী প্রেস
৮৩বি, বিবেকানন্দ রোড
কলিকাতা-৬

আবু সয়ীদ আইয়ুব

শ্রদ্ধাস্পদেষু

ভূমিকা

চৈনিক আক্রমণের সময় বন্ধুবর মণীশ ঘটক আমাকে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করেন, "সবাই কি কিছু কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি ?"

তাঁরই মতো আমিও তো সেই প্রশ্নই করছি। তাঁকে লিখি—

Right and Wrongs নিয়ে আমি আযৌবন পীড়িত। গায়ের জোরে কোন বড়ো সমস্যার সমাধান হবে না, হতে পারে না। ন্যায়ের জোর চাই। গায়ের জোর থাকুক, একেবারে দুর্বল হওয়া কোনো কাজের কথা নয়। কিন্তু শুধু গায়ের জোরই থাকবে, তার উপর ন্যায়ের জোর অঙ্কুশ চালনা করবে না, এর পরিণাম আমরা বার বার জার্মানীর ইতিহাসে দেখেছি।।

ইংলণ্ডকে যে আমার অত ভালো লাগে তার কারণ ইংলণ্ডে অগণিত লোক আছে যারা ন্যায়ের জোরে বিশ্বাস করে, ন্যায়ের জোরকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দেয়, ন্যায়ের জোর সম্বন্ধে নিশ্চিত না হয়ে গায়ের জোর খাটাতে চায় না।

মুশকিল হচ্ছে চীনে বা পাকিস্তানে সে রকম লোক নেই। থাকলে তাদের কথা শোনা যায় না। আমার ধারণা ছিল ভারতে আছে। কিন্তু দেখে শুনে হতভম্ব বনে যাচ্ছি।

তা হলে ডেমোক্রেসী রাখবে কে ? ডেমোক্রেসী কি শুধু ভোট দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার ? এর পিছনে আছে মহৎ একটা তত্ত্ব। এক একটি ব্যক্তি এক একটি বিবেক। যতক্ষণ না তুমি তার বিবেকের কাছে আবেদন করতে পারছ ততক্ষণ তুমি তার সম্মতি নিয়ে রাজত্ব করার হক্‌দার নও। একদল বিবেকী ব্যক্তি যদি তোমার আবেদনে সাড়া দেন তা হলে সেই অল্পসংখ্যকই অধিকসংখ্যক। গান্ধী তো একটি ভোটেরই অধিকারী ছিলেন। তবু তিনি একাই একশ' লাখ।

আমার বড় ছেলে পুণ্যশ্লোক এখন আমেরিকায় অধ্যাপনা করে। সে লিখেছে—"নেহেরুর জীবনে এই tragic climax, গান্ধীজীর জীবনে দেশ

বিভাগ যেমন। সেবার দেশের চতুর্থাংশ গেল, এবার দেশের জায়গা সামান্যই যাবে, স্বাধীনতার চতুর্থাংশের বেশীই চলে গেছে। দুটোই ঘটল, খানিকটা, পুরোটা নয়, nationalismটা আমাদের parochialism ছাড়িয়ে যথেষ্ট উঠতে পারেনি বলে। পরকে আপন কর, না পারলে তার চরিত্র ও কীর্তি অধ্যয়ন অন্তত কর, এতে এখনকার হিন্দু ঐতিহ্যে এত অনাগ্রহ কেন বল তো? গুপ্তযুগের হিন্দুদের তো ছিল না। দারিদ্র্য দোষে?"

আমিও নেহেরুর জীবনের এই "tragic climax" সম্বন্ধে ভাবি। স্বাধীনতার চতুর্থাংশের বেশীই চলে গেছে, এটা এদেশে থেকে বোঝা যায় না। বাইরে গেলে বোঝা যায় গান্ধী-নেহেরু সৃষ্ট সে প্রেস্টিজ আর নেই। ভারত এখন একজন litigant. হতে পারে তার কেস্‌টাই ঠিক, তবু সে এখন litigant বা client. অন্যে বিচার করবে তার মামলা।

যাক, বেঁচে থাকো ও ভালো থাকো। মরতে ইচ্ছা করাটা পাগলামি। দেশের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ কর্তব্য তোমার, আমার, প্রত্যেকেরই।

এর পরে তাঁর আর একখানি চিঠি পাই। তেমনি অশান্ত মানস। উত্তরে বলি—

তোমার চিঠি পেয়ে আনন্দিত ও ব্যথিত হয়েছি। কীই বা আমি দিয়েছি, দিতে পেরেছি! ভিতরে যা রয়ে গেল তার তুলনায় বাইরে যা দেওয়া গেল তা অল্পই।

কিন্তু অন্য দিক থেকে যখন ভাবি তখন আমার কোনো আপসোস থাকে না। বিধাতা আমাকে মুক্ত হস্তে দিয়েছেন, আমার মুঠি ভরিয়ে দিয়েছেন। এত ভালোবাসা, এত স্নেহপ্রীতি, এত বন্ধুবাৎসল্য—এ সমস্ত আমার প্রত্যাশাতীত। আমার পাওনার চেয়ে অনেক বেশী।

Frustration-এর কথা তুলেছ। Frustration আমার জীবনের পদে পদে। কিন্তু তোমাকে একটা উপমা দিই। নদী যখন তীরের মতো সোজা চলতে চায় তখন দেখে সামনে চড়াই, তখন তাকে এঁকে বেঁকে চলতে হয়।

তারপর দেখে সামনে পাহাড়, তখন তাকে মোড় নিতে হয়। তারপর দেখে ভূমিকম্পে সামনের সমস্তটাই মালভূমিতে পরিণত হয়েছে, তখন সে ২০০ মাইল দূরে গিয়ে খাত বদলায়, অন্য খাতে প্রবাহিত হয়। তারপর দেখে তার সামনে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, তখন সে ফুলতে ফুলতে উঁচু হয়ে বাঁধ ডিঙিয়ে যায় বা প্রবল তোড়ে বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যায়। কিংবা slow action-এর দ্বারা বাঁধকে ফাঁসায়।

আবার এমনও হয়। কোনো দিকে কোনো প্রগতি নেই দেখলে নদী বহুভাগ হয়ে বিভিন্ন ধারায় এগিয়ে চলে। নদী পেছিয়ে গেছে কখনো শুনেছ কি? তবে হাঁ, নদী শুকিয়ে যেতে পারে। মরুভূমির বুক দিয়ে বেশীদূর যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু যেটুকু যাওয়া যায় সেটুকুও ব্যর্থ নয়। নদী মরুভূমিকেও উর্বর করে তোলে, যতক্ষণ না নিজে মিলিয়ে যায়। এটাও তার পক্ষে পরাজয় নয়। মোটকথা নদীর জীবনে frustration নেই।

নদীর উপমা দিলুম। প্রকৃতির রাজ্য থেকে যে কোনো গতিশীল শক্তির উপমা দিতে পারতুম। মানুষও তো তেজ দিয়ে গড়া। আগুন ছিল এই পৃথিবীর মাটি, যার থেকে মানুষের উদ্ভব। আগুনকে কি কেউ সবরকমে নিস্ফল করতে পারে?

ক্লৈব্যং মাস্ম গম, পার্থ। আর কিছু না পারো বই পড়ো। আমি তো এই ক'মাস কেবল পড়েছি। বেশীর ভাগই ইতিহাস। চীন সম্বন্ধে, তিব্বত সম্বন্ধে, NEFA সম্বন্ধেও প্রচুর পড়লুম। এখন উপন্যাসে মন যাচ্ছে।

একটা কথা বলি। পড়াশুনা না করলে intellectual হয় না। অধিকাংশ intellectual সেই কবে কলেজে পড়েছিলেন। তারপর সরকারী বা দরকারী বই ছাড়া আর কিছু পড়েননি। এই বিদ্যা দিয়ে জগতের অর্থ দূরের কথা সমসাময়িক ঘটনার অর্থভেদ হয় না। আমরা যে যুগে বাস করছি সে যুগকে বুঝতে হলে খবরের কাগজই যথেষ্ট নয়। বরং খবরের কাগজ মানুষকে ভুল শেখায়।

"They also serve who stand and wait", বলেছিলেন মিলটন, যিনি সারা যৌবনটাই actionকে দিয়ে poetryকে বঞ্চিত করেছিলেন। শেষ বয়সটা poetryকে দিয়ে পুষিয়ে দিলেন। অন্ধ না হলে বোধ হয় তাও ঘটত না। সুতরাং তাঁর অন্ধত্বই তাঁর পক্ষে আশীর্বাদ। Frustration নয়।

তুমিও আবার কবিতায় ফিরে যাও। কবিতা লিখলেই তোমার ক্লান্তি কেটে যাবে। আমিও কবিতায় ফিরে যেতে চাই, কিন্তু তার আগে কয়েকখানা উপন্যাস আমাকে লিখতেই হবে, সরস্বতীর কাছে অঙ্গীকার। জল আর আগুন আর বিদ্যুতের মতো শব্দ আর ছন্দ আর ধ্বনিও এক একটি নৈসর্গিক শক্তি। কবিতা লিখতে বসলে তোমার sense of power ফিরবে। রাজনীতিকরা আজ আছেন কাল নেই। কতটুকু শক্তি তাঁদের হাতে? কবিদের শক্তি আরও বেশী। তবে তার অলিখিত শর্ত কবিকে সত্যভাষী ও সৌন্দর্যরসিক হতে হবে। নইলে সে তল্পিবাহক বা প্রচারক।

ওই দু'খানি চিঠিই আমার এই প্রবন্ধপরম্পরার ভূমিকায় কাজ করবে।

এই গ্রন্থের নাম "খোলা মন ও খোলা দরজা"। ভিতরের পৃষ্ঠাগুলির শীর্ষে ভুলবশত "খোলা মন খোলা দরজা" ছাপা হয়েছে।

সূচীপত্র

খোলা মন খোলা দরজা

যোগভ্রষ্ট

তোমার চিঠির উত্তরে চিঠিই লিখছি। ভেবেছিলুম নীরব থাকব। কিন্তু যেখানে আর সবাই সরব সেখানে একজন নীরব থাকলে তারও একটা কদর্থ হবে।

মনে পড়ে গেল বিশ বছর আগের একটি ঘটনা। আমার এক প্রতিবেশীর পুত্রের যায়-যায় অবস্থা। শহরের সব কয়েকজন গণ্যমান্য ডাক্তার বাইরে বসে পরামর্শ করছেন। কেসটা যাঁর তিনিই সিদ্ধান্ত নেবার মালিক। তিনি যদি অপরের পরামর্শ নেন ভালো। তখন দায়িত্বটা তাঁর। একমাত্র তাঁর। তখন তাঁকেই তাঁর বিবেকের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। সে-সময় তিনি বলতে পারবেন না যে, অপর পাঁচজনের পরামর্শে কাজ করেছেন। দোষ তাঁর একার নয়।

আমার স্পষ্ট মনে আছে অনেকক্ষণ ধরে আলোচনা চলে। কিন্তু ডাক্তার গুপ্ত একটিও কথা বলেন না। তাঁর কেস নয় বলে কি? আমার ভাবতে খারাপ লাগছিল যে তিনি উদাসীন। রাত তখন অনেক। সিদ্ধান্ত একটা কিছু না নিলেই নয়। অথচ ডাক্তারে ডাক্তারে মতভেদ। একজন তো একেবারেই নীরব। তাঁর কেস নয় বলে কি তার দয়ামায়া নেই? আমি তো তাঁকে ভালো করেই চিনি। মানুষ হিসাবেও সমান ভালো।

শেষে ডাক্তার গুপ্ত উঠলেন। বারান্দা থেকে কয়েক ধাপ নামলেন। ডাক্তার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "এই দুর্গাদাস! উঠলে কেন? তুমি কী করতে বল?" গুপ্ত ফিরে দাঁড়ালেন। বললেন, "আমি হলে এই ওষুধটি দিয়ে দেখতুম।" এই বলে একটা ওষুধের নাম করলেন। তখন তাঁকে ধরে নিয়ে আসা হলো। আবার চলল আলোচনা। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। গাড়ী তৈরী ছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট স্বয়ং এসে পেট্রোল কুপন দিয়ে গেছলেন। লোক ছুটল ওষুধ কিনতে। ওষুধ এলো। ওষুধ দেওয়া হলো। ছেলে বাঁচল। আমরা বাঁচলুম।

তা হলে দেখছি নীরব থাকা মানে উদাসীন থাকা নয়। এর অন্য অর্থ থাকতে পারে। এই পরিস্থিতিতে কে না চিন্তিত, কে না উদ্বিগ্ন? আজ আমরা সবাই তো গৃহকর্তা। তা বলে আমরা সবাই কি ডাক্তার? এ ক্ষেত্রে ডাক্তারের সংখ্যা সারাদেশে তিনজন কি চারজন। তাঁদের মধ্যে একমাত্র

জবাহরলালের উপরেই সিদ্ধান্তের ভার। গৃহকর্তা কোন্ সাহসে তাঁকে বিদায় দিয়ে তাঁর জায়গায় আরেকজনকে বসাবেন? আরেকজন কোন্ সাহসে বসবেন? ভোজ রাজা যখন বিক্রমাদিত্যের সিংহাসনে বসতে যান তখন বত্রিশটি পুত্তলিকা তাঁকে বত্রিশটি উপাখ্যান শুনিয়ে নিরস্ত করেছিল। নইলে ভোজ রাজাই অপদস্থ হতেন। তাঁর প্রজাদেরও অমঙ্গল হতো। এ ক্ষেত্রে জবাহরলালকে তাঁর জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর কারো পরামর্শ যদি তিনি চান, যাঁর যা বক্তব্য আছে পেশ করতে পারেন। তিনি যদি সে পরামর্শ গ্রহণ করেন উত্তম। কিন্তু দায়িত্বটা তাঁরই।

নিশ্চয় লক্ষ করে থাকবে যে বিনোবাজী নীরব। অর্থাৎ যেটুকু না বললে নয় কেবল সেইটুকুই তিনি বলেছেন। দেশরক্ষা করতে হবে। তার শ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে ভূদান গ্রামদান গ্রামসংগঠন শান্তিসেনা গঠন। সেই পুরোনো কথাই নূতন অবস্থায় বলেছেন।

বিনোবাজীর শিক্ষা গান্ধীর কাছে। জবাহরলালজীর শিক্ষাও গান্ধীর কাছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন যখন শুরু করতে হলো তখন গান্ধীজী বললেন বিনোবাজী হবেন প্রথম সত্যাগ্রহী। কারণ বিনোবাজী সর্ব অবস্থায় অহিংস। তাঁর প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে অহিংস। দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী কে হবেন তা নিয়ে গান্ধীজী অনেক চিন্তা করেন। উদ্বেগজনক বিশ্বপরিস্থিতিতে ভারতভাগ্য হয়তো একদিন ভারতীয়দের হাতেই আসবে। তখন কি দেশ সম্পূর্ণ অহিংসভাবে আত্মরক্ষা করতে পারবে? গান্ধীজী যদি বেঁচে না থাকেন বিনোবাজী কি সেইভাবে দেশরক্ষা করতে পারবেন? আদর্শবাদী গান্ধীজী বাস্তববাদীও ছিলেন। তাই দ্বিতীয় সত্যাগ্রহী বলে মনোনয়ন দিলেন জবাহরলালজীকে।

তখন থেকেই দেখা যাচ্ছে দেশের জনমত দুইভাগে বিভক্ত। এক ভাগের প্রতিনিধি বিনোবা। অপর ভাগের প্রতিনিধি জবাহরলাল। মাথা-গুনতিতে কার ভাগে লোক বেশী তা জানবার উপায় নেই। কারণ কোন্ পদ্ধতিতে দেশরক্ষা করা সমীচীন এ প্রশ্নের উপর ভোট নেওয়া হয়নি। ভোটে বিনোবার জিৎ হলে তিনি কি প্রধানমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নেবেন? সশস্ত্র প্রতিরোধের পরিবর্তে নিরস্ত্র প্রতিরোধের আদেশ দেবেন? জওয়ানদের বদলে শান্তিসৈনিকদের লডাখে ও নেফায় পাঠাবেন? না। তিনি চাইলেও দেশবাসী তা চাইবে না। সে সাহস আমাদের নেই। দেশ তার জন্যে প্রস্তুত নয়। কোনো কালেই ছিল

না। গান্ধীজীই বাধ্য হলেন কাশ্মীর রক্ষার জন্যে সশস্ত্র সৈনিক পাঠানোর প্রস্তাবে সায় দিতে। শান্তিসৈনিক পাঠালে হয়তো আদর্শ রক্ষা হতো, কিন্তু কাশ্মীর রক্ষা হতো না। উদ্দেশ্য যদি হয় কাশ্মীর রক্ষা তবে তখনকার পরিস্থিতিতে একমাত্র কার্যকর উপায় ছিল সশস্ত্র বাহিনী প্রেরণ। গান্ধীজী সেটা জানতেন ও বুঝতেন। তাই দুঃখের সঙ্গে মেনে নিলেন।

আজকের পরিস্থিতিতে বিনোবাজীকেও মেনে নিতে হচ্ছে দেশরক্ষার চিরকেলে উপায়। কিন্তু ইতিহাসের কাছে তিনি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে দেশরক্ষার অহিংস উপায়ও উদ্ভাবন করতে হবে, প্রয়োগ করতে হবে। ভারতই একমাত্র ভূমি যেখানে তার সাফল্যের লেশমাত্র সম্ভাবনা আছে। আদৌ যদি না থাকত তবে তিনি প্রথম সত্যাগ্রহী বলে মনোনয়ন পেতেন না, পেলেও নিতেন না। গান্ধীজীও তাঁর চেয়ে যোগ্যপাত্র না পেলে অমন একটা পরীক্ষার কথা বিশ্ববাসীকে শোনাতেন না, শুনিয়ে হাস্যাস্পদ হতেন না। ইতিহাস গতানুগতিক পন্থায় চলত। গান্ধী টলস্টয় অরণ্যে রোদন করতেন। বিনোবাজী যদি তাঁর বিশ্বাসে দৃঢ় থাকেন তা হলে ইতিহাস তাঁকেও একটা সুযোগ দিতে পারে। ভারতের মরা হাড়ে ভেলকি আছে গান্ধী নেতৃত্বের আগে কেউ কি তা বিশ্বাস করত? আমি একবার করেছি একবার করিনি আবার করেছি আবার করিনি। মহাত্মাজীর সঙ্গে যেবার মালিকান্দায় সাক্ষাৎ করি ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ তখনো আরম্ভ হয়নি। ওদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে। দেখি তিনি গভীরভাবে চিন্তিত। অত বড় পরীক্ষা তাঁর জীবনে আসেনি। বললুম, "আপনি করে দেখান, আমি বিশ্বাস করব।"

ভারত কি একদিন করে দেখাতে পারবে? আমার যুক্তিবাদী মন বলে "খেপেছ! অহিংস দেশরক্ষা! সোনার পাথরবাটি! এ শতাব্দীতে নয়।" কিন্তু আমার মধ্যে একজন সৃষ্টিবাদী আছে। সে বলে, "প্রকৃতি নিত্য নূতন সৃষ্টি করে চলেছে। মানুষও নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে করতে সভ্য হয়েছে, সভ্যতর হয়েছে। চেষ্টা করলে সে সভ্যতম হতে পারে। হাইড্রোজেন বোমার পরে কী? হয় প্রলয়, নয় সৃষ্টি। সৃষ্টির পথই মানুষকে ধরতে হবে। যদি না সে ডাইনোসরের মতো নিশ্চিহ্ন হতে চায়। তাকে পথ দেখাবে কে? ওই গান্ধী। ওই বিনোবা। ওই আধখানা ভারত, যে আজ পদব্রজে তপস্যা করে চলেছে, যার মনে লেশমাত্র ভয় নেই, যার অন্তর বিশ্বপ্রেমে উদ্বেল।"

সারা ভারত আজ দেশরক্ষার সংকল্প নিয়েছে। এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু

দেশরক্ষার পদ্ধতি কী হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। দুটো মতই সমান সত্য। জবাহরলালকে যেমন তাঁর নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অনুসারে কাজ করতে দিতে হবে তেমনি বিনোবাকে তাঁর বিশ্বাস ও সামর্থ্য অনুসারে। কেউ কাউকে বাধা না দিলেই হলো। এই ভারত সামান্য দেশ নয়। তিন হাজার বছরের ইতিহাস পাওয়া গেছে, আরো দু'হাজার বছরের নিদর্শন খুঁজলে পাওয়া যাবে। এদেশে কত রকম পরীক্ষা নিরীক্ষাই না হয়েছে। গোমাংস যাদের ঋষিদেরও প্রিয়খাদ্য ছিল তারা এখন গোমাংসের ধার দিয়েও যায় না। তাদের একটা বড় অংশ আমিষ পর্যন্ত খায় না। আমরা এই পাঁচ হাজার বছর ঘাস কাটিনি। অহিংসায় অনেক দূর এগিয়েছি। রামায়ণ মহাভারতের বনিয়াদের উপর আমাদের জনগণ দাঁড়িয়ে আছে। দুই মহাকাব্যেরই প্রধান প্রতিপাদ্য সত্যের মহিমা, দুই নায়কই সত্যসন্ধ। কবে কোন দেশে সত্যের উপর এই পরিমাণ জোর দেওয়া হয়েছে যে, যুধিষ্ঠির যুদ্ধকালে অর্ধসত্য বলেছিলেন বলে তাঁকে সেই পাপে নরকদর্শন করতে হলো?

দেশের আধখানা মন হিংসায়, আধখানা অহিংসায়। এই হয়েছে আমাদের ট্র্যাজেডী। ষোলো আনা হিংসার প্রস্তুতি নেই, ষোলো আনা অহিংসারও প্রস্তুতি নেই। বলা বাহুল্য অহিংসার প্রস্তুতির প্রথম কথাটি অহিংসা নয়, সত্য। মহাত্মাজী বার-বার সত্যের উপর সবচেয়ে জোর দিয়েছেন। সত্যই ভগবান। হিংসা কোনো কোনো অবস্থায় সমর্থন করা যায়। অসত্য কোনো অবস্থায় নয়। দেশরক্ষার জন্যে অসত্য উচ্চারণ করতে হবে, অসত্য আচরণ করতে হবে, এমনতর দাবি যদি কেউ করে ভারতের অন্তরাত্মা পীড়িত হবে। যুদ্ধে জয়লাভ হয়তো হলো, কিন্তু তার পরে তো মহাপ্রস্থান ও নরকবাস। ও ছাড়া আর কোনো পরিণাম সম্ভব হলে ব্যাসদেব তা দেখাতেন। অথচ যুদ্ধের দাবি এমন সর্বগ্রাসী যে সত্যই হয় তার প্রথম বলি। সব দেশেই সব কালেই এটা দেখা গেছে যে হিংসার সঙ্গে থাকে অসত্য। অহিংসার সঙ্গে থাকে সত্য। যেখানে এক পক্ষ হিংসার আশ্রয় নেয়, অপর পক্ষ নেয় অহিংসার আশ্রয় সেখানে সত্যই হয় নারায়ণ, আর অসত্য হয় নারায়ণী সেনা। তবে সাধারণত যা ঘটে তা হিংসা বনাম অহিংসা নয়, হিংসা বনাম হিংসা। সেইজন্য দুই দিকেই থাকে কিছু সত্য, কিছু অসত্য।

যেখানে দুই পক্ষেই কিছু কিছু সত্য আছে সেখানেও কম বেশীর প্রশ্ন আছে। সেই কম বেশীর উপরেও যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে। ইতিহাসে

নিছক গায়ের জোর বহুক্ষেত্রে জয়ী হয়েছে, সেইজন্য নিছক গায়ের জোরের প্রেষ্টিজ এখনো প্রচুর। কিন্তু মানুষ ইতিমধ্যে এক ধাপ উপরে উঠেছে। তাই প্রত্যেকবার যুদ্ধকালে তর্ক করে কোন্ পক্ষে ন্যায়ের জোর বেশী। ন্যায় অন্যায় বিনিশ্চয়ও আধুনিক যুদ্ধের একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যারা যুদ্ধ করতে যায় তাদের মধ্যে শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। তারা জানতে চায় কোন পক্ষে কতখানি ন্যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসীদের অধিনায়ক ছিলেন মার্শাল ফশ। পরে তিনি মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক হয়েছিলেন। যুদ্ধজয়ের পর তিনি লিখেছিলেন—

"To sum up, whether we are dealing with the soldier, the high command, the nation or the Government, in each of these divisions war demands an ever-increasing share of the moral forces whose close union and wise combination are alone capable of producing victory. It is to the insufficiency of certain of these forces, or to the lack of cohesion between them, that we must look to grasp and explain the collapse, in the course of the last war, of certain Great Powers, and likewise of armies of formidable repute, which in so far as they thmselves are concerned certainly did not fall short of that repute." (Encyclopaedia Britannica 14th Edition, Vol 2, **Army : Morale in War,** page 415).

যারা যুদ্ধে লিপ্ত নয় তারাও তো দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করেছে যুধ্যমান দুই নেশনকে। তারাও জানতে চায় কার দিকে ন্যায়, কার দিকে সত্য। তাদের নৈতিক সমর্থনও যুদ্ধকালে মূল্যবান। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ইংলণ্ডের পক্ষে নামবে কি না সে নিয়ে মার্কিন জনমন দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। কিন্তু ক্রমেই জনমত জার্মানীর বিপক্ষে গেল। অন্যান্য কারণের মধ্যে এটাও একটা কারণ যে জার্মানরা মার্কিনদের ন্যায়বোধকে আঘাত করে। ইংরেজদের সঙ্গে মার্কিনদের এমন কোন চুক্তি ছিল না যে একের বিপদে অপরকে অস্ত্র ধরতে হবে। স্বার্থের বন্ধন যেমন ছিল তেমনি অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতাও ছিল। রক্তের বন্ধন তো উভয় পক্ষেরই সঙ্গে। এই যেমন একটা উদাহরণ দিলুম তেমনি আরও দিতে পারতুম। আধুনিক যুদ্ধে ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন ঘটনার গতি বদলে দিতে পারে। সুয়েজ নিয়ে কী হলো? ইংরেজ ফরাসীরা দুনিয়ার লোককে বোঝাতে

পারল না যে তাদের কেসটাই ঠিক। এমন কি স্বদেশের লোকও একবাক্যে সায় দিল না। বিশ ত্রিশ বছর আগে হলে সুয়েজ যুদ্ধ অমন ঝড় তুলত না। ইংরেজ ফরাসী ইসরায়েলীরা কেল্লা ফতে করত। গায়ের জোর তো তাদেরি বেশী। কিন্তু এই বিশ বছরে দুনিয়ার লোক গায়ের জোরকে সন্দেহ করতে শিখেছে। তাদের প্রথম প্রশ্ন হলো, কে ঠিক? কে বেঠিক?

ইতিমধ্যে ইউনাইটেড নেশনস বলে একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। সেখানে বিশ্বের অধিকাংশ নেশন উপস্থিত। কয়েকটা ঝগড়া তারা মিটিয়ে দিয়েছে। নইলে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেত। কয়েকটা মেটাতে পারেনি। তাই বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা দূর হয়নি। ভারত সেই মহৎ প্রতিষ্ঠানের সদস্য। চীন বলেও সেখানে এক সদস্য আছে। কিন্তু সেই চীনের সঙ্গে ভারতের কোনো সংস্রব নেই। সে চীন তার কয়েকটি দ্বীপে দ্বীপান্তরিত। যার সঙ্গে আমাদের কারবার সে লাল চীন বা নয়া চীন। চীনের অধিকাংশ জায়গা জমি তারই দখলে। ইউনাইটেড নেশনস তাকে স্বীকার না করলে সে চীনের জন্যে সংরক্ষিত আসনটি অধিকার করতে পারছে না। অথচ সে আসন তাকে দিলে সে ফরমোজার দখল চাইবে, তখন যদি ঝগড়া বাধে সেটা হবে চীনাদের ঘরোয়া ঝগড়া। সে ঝগড়া মেটানোর জন্যে ইউনাটেড নেশনস ছুটে যেতে পারবে না। কঙ্গোয় ছুটে গেছে, কারণ কঙ্গোর কেন্দ্রীয় সরকার তাকে ডেকেছে। চীনের কেন্দ্রীয় সরকার তো তাকে ডাকবে না। তা হলে লাল চীনকে আসন দিতে ইউনাইটেড নেশনসের কী এমন তাড়া? লাভ হতে পারত আমাদের ও আমাদেরই মতো কয়েকটি প্রতিবেশীর। কারণ আমাদের সঙ্গে সীমানা নিয়ে ঝগড়া বাধলে সেটাকে আমরা ইউনাইটেড নেশনসে তুলতে পারতুম। লাল চীন সেখানে উপস্থিত থাকলে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিরা তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্তিরক্ষা করত. আর সে যদি অবুঝ হতো, তাকে না করে আমাদের সাহায্য করত। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও লাল চীনকে আমরা তার প্রাপ্য আসন পাইয়ে দিতে পারিনি।

ঝগড়া যে বাধতে পারে এ চেতনা আমাদের অনেকেরই ছিল সেই ১৯৪৯ সাল থেকেই। কারণ ওদের মানচিত্র আর আমাদের মানচিত্র মিলিয়ে দেখলে বেশ খানিকটে জায়গা চোখে পড়ে যেটা আমাদের মতে আমাদের, কিন্তু ওদের সেকথা বললে ওরা গা করে না, ঝুলিয়ে রাখে। মানচিত্র সংশোধন করতে সময় নেই, হচ্ছে, হবে, দাঁড়াও দেখি। আগে তো আমাদের সোভরেন্টি

স্বীকার কর। আমরা যদি তিব্বতের উপর সোভরেন না হয়ে থাকি তো আমাদের স্বাক্ষরের দাম কী? স্বাক্ষরটি না পেলে তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারছ না তো একবার প্রাণ খুলে বল, ভাই চীন, তিব্বতের উপর তুমি সোভরেন। উল্লেখ করতে ভুলে গেছি যে জায়গাগুলি তিব্বতের সীমানাসংলগ্ন।

চু এন-লাই যেবার শান্তিনিকেতনে আসেন আমি তাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজে যোগ দিয়েছি ও মানুষটির উপর নজর রেখেছি। তাঁর নামের প্রকৃত উচ্চারণ আমাদের তিনি বলেন। ভোজের শেষে হঠাৎ আওয়াজ তুললেন, "হিন্দী চীনী ভাই ভাই।" আমার কান খারাপ না হয়ে থাকলে আমি শুনলুম, "বহাই বহাই।" হতে পারে বেহাই বেহাই। আমার দুই বন্ধু তান য়ুন-শান ও সুধীর খাস্তগীর বেহাই বেহাই হয়েছেন। চৈনিকদের সঙ্গে ভারতীয়দের দু হাজার বছরের উপর চেনাশোনা। রেশম এসেছে তাদের দেশ থেকে, চা চিনি এসেছে তাদের দেশ থেকে। রেশম সড়ক দিয়ে ওরাও যেমন আসত আমরাও তেমনি যেতুম। আমরা যেতুম বৌদ্ধধর্ম নিয়ে। অজন্তার চিত্রকলা নিয়ে। চীনের পথ দিয়ে সে সব দান জাপানেও পৌঁছয়। সমুদ্রপথ দিয়েও। কেউ কোনো দিন কল্পনাও করতে পারেনি যে চীনে ভারতে সংঘর্ষ বাধবে। রবীন্দ্রনাথ চীন দেশে গিয়ে বিপুল সম্মান পান। আমার কাছে তিনি চীন দেশের জ্ঞানীদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। শান্তিনিকেতনের চীন ভবন দুই দেশের মাঝখানের সেতু। চিয়াং কাই শেক কবিতীর্থে এসে বহু টাকা দান করে যান। চু এন-লাই এসে আরো টাকা দেন।

এই যে শাশ্বত চীন, যার বৌদ্ধদের কাছে ভারত হচ্ছে হোলি ল্যাণ্ড, এর সঙ্গে কি শাশ্বত ভারতের কোনো দিন বিবাদ ছিল যে আমরা অমন একটা অশুভ সম্ভাবনার জন্যে সামরিক অর্থে বা অন্য কোনো অর্থে প্রস্তুত হব? আমরা জানতুম যে সীমানা নিয়ে বিরোধ একদিন আপসে নিষ্পত্তি হবে। এ ধরনের বিবাদ বহু দেশে বহু বার হয়েছে। এমনি একটা বিবাদ ছিল পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমানা নিয়ে। জায়গাটার নাম সেইস্তান, প্রাচীন নাম শকস্থান। দু পক্ষ সালিশ মানে ইংরেজ সরকারকে। গোল্ডস্মিড কমিশন গিয়ে ১৮৭২ সালে সীমানা-রেখা টেনে দেন। কিন্তু গোলমাল তা সত্ত্বেও থামে না। কাগজে কলমে একটা লাইন টেনে দেওয়াই যথেষ্ট নয়, সরেজমিনে গিয়ে জরীপ করে পিলার পুঁতে পাকাপাকি করাও দরকার। ত্রিশ বছর পরে আবার দুই পক্ষ ইংরেজকেই সালিশ মানে। তখন ভারতের ইংরেজ সরকার ম্যাকমহোন

কমিশন পাঠান। ম্যাকমহোন ছিলেন বড়ঘরের ছেলে, স্যাণ্ডহার্স্ট থেকে পাস করা মিলিটারি অফিসার। পরে হন পলিটিক্যাল অফিসার। পারস্য ও আফগানিস্থানের সীমানা জরীপ করে তিনি দু পক্ষকেই সন্তুষ্ট করেন। এর জন্যে তাঁকে খাটতে হয়েছিল দু তিন বছর ধরে, ১৯০৩ থেকে ১৯০৫ সাল।

সেই যে ম্যাকমহোন তিনি প্রমোশন পেতে পেতে একদিন ভারতের ইংরেজ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের সেক্রেটারি হন। তখনকার দিনে আর সব বিভাগের সেক্রেটারির উপরে একজন করে একজিকিউটিভ কাউন্সিলের মেম্বর থাকতেন। কিন্তু পররাষ্ট্র বিভাগ ছিল বড়লাটের খাস দপ্তর। তাই তখনকার দিনে ফরেন সেক্রেটারি যিনি হতেন তিনি বাছা বাছা লোকদের মধ্যেও বাছা লোক। বলতে গেলে তিনিই বড়লাটের সচিব-স্থানীয়। প্রথম মহাযুদ্ধ যখন বাধে তখন লর্ড কিচেনারকে ইজিপ্ট থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায়। ইজিপ্ট হয়ে যায় ব্রিটিশ প্রোটেক্টোরেট। সেখানে একজন হাই কমিশনার নিযুক্ত করা হয়। কাকে জানো? ম্যাকমহোনকে। তিনি ভারত ছাড়ার আগে একটি কাজ করে যান। তিব্বত, চীন ও ভারত এই তিন পক্ষের প্রতিনিধি নিয়ে একটি বৈঠক করেন। মানচিত্রের উপর দুটি লাইন নির্দেশ করেন। একটি হলো ভারত ও তিব্বতের সীমানাসূচক। অপরটি তিব্বত ও চীনের সীমানাসূচক। প্রথমটিতে চীনা প্রতিনিধির তেমন আপত্তি ছিল না, দ্বিতীয়টিতে ছিল। উপরওয়ালার হুকুম না নিয়ে তিনি স্বাক্ষর করতে পারবেন না বলে চীন দেশের কেন্দ্রীয় সরকারে কাগজপত্র পাঠানো হলো। চীন সরকার মঞ্জুরি দিলেন না।

না দেওয়ার কী কী কারণ ছিল সব আমার জানা নেই। তবে একটা কারণ কিছু কিছু জানি। চীনের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক নিয়ে বহুকালের একটা বিবাদ ছিল। ভারত যেমন বলছে কাশ্মীরের প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হতে পারে না, কাশ্মীরের উপর ভারতের সোভরেন্টি, চীনও তেমনি বলত তিব্বতের প্রশ্নটা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন হতে পারে না, তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্টি। তিব্বতের উপর রাশিয়ারও নজর ছিল, ইংরেজেরও নজর ছিল। তাই নিয়ে একটা সিংহ ভালুকের লড়াই বাধতে পারত। ইংরেজ ও রুশ মিলে ১৯০৭ সালে একটা কনভেনশন করে। তাতে স্থির হয় যে, তিব্বতের উপর চীনের সোভরেন্টি। তাই যদি হয় ১৯০৭ সালের পোজিশন তবে ১৯১৪ সালে সে পোজিশন বদলে যেতে পারে না। চীন তখনো সোভরেন। তৎকালীন

চীন সরকার যদিও ইংরেজ সরকারের বন্ধু ও যুদ্ধকালীন মিত্র তবু তাঁরা সীমানার প্রশ্নটিকে অমীমাংসিতই রেখে দেন। সম্ভবত এই কারণে যে দলিলটিতে সই করলে তিব্বতকেও চীনের মতো একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলে স্বীকার করা হয়ে যায়। তা হলে সোভরেন্‌টির দাবী টেকে না। নিজের স্বাক্ষরই তার বিরুদ্ধে যায়।

ম্যাকমহোন ভারত তিব্বত চীনের বেলা হিমালয় ভূখণ্ডে সেই কাজটি করেন যে কাজটি করেছিলেন গোল্ডস্মিড পারস্য ও আফগানিস্থানের বেলা সেইস্তানে বা শকস্থানে। অর্থাৎ একটি লাইন নির্দেশ করেছিলেন। গোল্ডস্মিড লাইনের পরে ত্রিশ বছর কেটে গেল, তবু মিটমাট হলো না। তার কারণ কাগজে কলমে' একটা লাইন টেনে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। সরেজমিনে গিয়ে জরীপ করতে হয়, পিলার বসাতে হয়। তার জন্যে আলাদা একটা কমিশন দরকার। ম্যাকমহোন লাইনের বেলা সেটা কোনো দিন হয়নি, এখনো বাকি। চীন সরকার মঞ্জুরি দিলে সেটা জাতীয়তাবাদী আমলেই হয়ে চুকত। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে চীন সরকারের যথেষ্ট সৌহার্দ্য ছিল। কিন্তু কী জানি কেন ইংরেজ সরকারও গরজ দেখায়নি। ওরা এমন নির্বিকার ছিল যে মানচিত্রেও ম্যাকমহোন লাইন দেখাতে পঁচিশ বছর দেরি করেছে। ততদিনে চীন জড়িয়ে পড়েছে জাপানী যুদ্ধে।

মনে কর দুজন জমিদার নিজেদের মধ্যে একটা সীমানার প্রশ্ন অমীমাংসিত রেখে জমিদারি হস্তান্তরিত করে বা হারিয়ে দূরে সরে গেল। তাদের স্থান নিল আরো দুজন জমিদার। আগেকার জমিদারদের মাঝখানে যেটুকু সমঝোতা ছিল সেটুকু পরবর্তী জমিদারদের মধ্যে নেই। কাজিয়া তো বাধবেই। স্বাধীন ভারত বলছে, ব্রিটিশ ভারতের আমিই এখন উত্তরাধিকারী। ইংরেজরা শেষ মানচিত্রখানা আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। তাতে দেখছি এ সব জায়গা আমার। আমি দখলও করছি। তুমি যদি আমার সত্যিকারের বন্ধু হয়ে থাক তবে তুমি আমাকে আমার তালুক মুলুক নির্বিবাদে ভোগ করতে দাও। লাল চীন বলছে, এ সম্পত্তি আমি চিয়াং কাইশেকের অধিকার থেকে জয় করে নিয়েছি; তিব্বত যাকে বলছ সেটা আমাদের তিব্বত অঞ্চল। ইংরেজ তাকে হাত করেছিল, তার স্বাক্ষরের কোনো দাম নেই, কাঁচা দলিল। বেআইনী লাইন। এসো, আবার কথাবার্তা চালাই। আমাকে তুমি কিছু দাও, তোমাকে আমি কিছু দিই। আপসে নিষ্পত্তি হোক। তার পরে পাকা দলিল হবে। কমিশন বসবে। জরীপ হবে। পিলার দেওয়া হবে।

ম্যাকমহোন লাইন নিয়ে যেটুকু জানি বললুম। লডাখ সম্বন্ধে পড়াশুনা করিনি। জানিনে। তবে সেখানেও কমিশন বসেনি, জরীপ হয়নি, পিলার বসানো হয়নি। এ সব না করলে বিবাদের জড় থেকে যায়। একশো বছর বাধেনি বলে পরে বাধবে না, এটা যুক্তি নয়, এটা বিশ্বাস। ইংরেজ জানত সে কোনো দিন নড়বে না। যাবৎ চন্দ্র-সূর্য তাবৎ ইংরেজ-রাজ। তিব্বতের লামাতন্ত্র জানত সে ইতিহাসের ধার ধারে না। ধর্মগ্রন্থই তাকে চিরকালের ইজারা দিয়েছে। তেমনি চীন দেশের শাসকরাও মনে করতেন কনফিউ-সীয় সমাজব্যবস্থা যখন আড়াই হাজার বছর টিকে আছে তখন আরো আড়াই হাজার বছর টিকবে। বিপ্লবের জন্যে, পরিবর্তনের জন্যে যদি কেউ কোথাও কোনো অবকাশ না রাখে তা হলে একদিন সাম্রাজ্য যায়, গদি যায়, সব কিছু নূতন করে মীমাংসা করতে হয়। নয়তো কাজিয়া বাধে।

এই মামলাটি আমরা হস্তান্তরসূত্রে ইংরেজের কাছ থেকে পেয়েছি। আর লাল চীন পেয়েছে দ্বীপান্তরসূত্রে জাতীয়তাবাদী চীনের কাছ থেকে। ইংরেজরা যে আমাদের পক্ষ নেবে এটা স্বাভাবিক। তেমনি ফরমোজা সরকারও পিকিং সরকারের পক্ষে কথা বলছেন। মার্কিন সরকার যখন ঘোষণা করলেন যে, ম্যাকমহোন লাইন তাঁরাও স্বীকার করেন তখন চিয়াং কাইশেকের গভর্নমেণ্ট প্রতিবাদ করে জানালেন যে ম্যাকমহোন লাইন অবৈধ। বেশ বোঝা যাচ্ছে এই প্রশ্নে লাল চীন নীল চীন দুই চীনেরই এক রা। এটা ওদের পৈত্রিক দাবী। ওরা কেউ তিব্বতকে স্বাধীন বা স্বতন্ত্র বলে আমল দিতে চায় না। ওদের দৃষ্টিতে তিব্বত একটি অঞ্চল বা প্রদেশ। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায় চীন-তিব্বতের সম্পর্ক এক এক যুগে এক এক রকম। আগেই বলেছি ১৯০৭ সালের অ্যাংলো-রাশিয়ান কনভেনশনে মেনে নেওয়া হয়েছে যে, তিব্বতের উপরে চীনের সোভরেন্টি। অথচ ১৯১৪ সালে তিব্বতকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে ব্রিটিশ ভারত ও মাঞ্চু শাসন থেকে সদ্যমুক্ত প্রজাতন্ত্রী চীনের বৈঠকে। তাকে সমান আসন দেওয়া হয়েছে। এর কারণ কী? কারণ এই যে তিব্বতের উপরে যেটা ছিল সেটা চীনজাতির ছত্র নয়, মাঞ্চু সম্রাটের বা সম্রাজ্ঞীর ছত্র। চীনজাতি যেমন মাঞ্চু শাসন থেকে মুক্ত হয় তিব্বতী জাতিও তেমনি মাঞ্চু ছত্রাধীনতা থেকে মুক্ত হয়। তিব্বতীরা স্বাধীনতা ঘোষণা করেনি, কিন্তু স্বাধীন জাতির মতো ব্যবহার করেছে আর ইংরেজরাও সেটাকে প্রকারান্তরে মেনে নিয়েছে। তা বলে চীন সরকার মেনে নেননি।

আমাদের মোকাবিলা করতে হবে শুধু চীনের সঙ্গে নয়, তিব্বতের সঙ্গেও। সে বলবে, আমি ১৯১৪ সালে পক্ষভুক্ত ছিলুম, আমার স্বাক্ষর না থাকলে ভারত-চীন চুক্তি অসিদ্ধ। আগে আমাকে স্বাধীন করে দাও, তার পরে আমার স্বাক্ষর নাও। সুতরাং চীনের স্বাক্ষর যেমন দরকারী তিব্বতের স্বাক্ষরও তেমনি দরকারী। নইলে বিশ ত্রিশ বছর পরে শোনা যাবে তিব্বত স্বাধীন হয়েছে, সে বলছে, চীন-ভারত চুক্তির দ্বারা সে বাধ্য নয়, ওসব জায়গার উপর তার দাবী সে ছাড়েনি, তাকে ভালোয় ভালোয় ফিরিয়ে না দিলে সেও হাঁকবে, লড়কে লেঙ্গে। তার পিছনে কোনো এক শক্তি দাঁড়াবে। হয়তো রাশিয়া। যে মামলাটি আমরা হস্তান্তরসূত্রে লাভ করেছি সেটি ১৯১৪ সালেই মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তিন পক্ষের। অবশ্য লডাখের ব্যাপারটা আরো পুরনো। সাক্ষাৎ ভাবে ব্রিটিশ সরকারের দায়িত্ব ছিল না।

তার পর মনে রাখতে হবে যে ১৯১৪ সালে তিব্বত যখন তার স্বাক্ষর দিয়েছিল তখন সে পুর্ব সীমানায় কিছু পেয়েছিল বলেই দক্ষিণ সীমানায় কিছু ছেড়েছিল। অর্থাৎ চীনের কাছ থেকে কিছু ফেরত পেয়েছিল বা ফেরত পাবে আশা করেছিল বলেই ব্রিটিশ সরকারকে কিছু ছেড়ে দিয়েছিল বা ইংরেজরা আগে থেকে দখল করে থাকলে দখলটাকে মেনে নিয়েছিল। ভবিষ্যতে তিব্বতের স্বাক্ষর দরকার হলে সে বলবে, চীনের কাছ থেকে আমার পুর্ব সীমানার জমি আদায় করে দিলে তো স্বাক্ষর করব। নইলে আমার কী স্বার্থ? বরং আমার স্বার্থ আমার নিজের জন্যে কতক জায়গা দাবী করা। পুরনো মানচিত্র আমার পক্ষে যায়।

এটা একটা জবর মামলা। গায়ের জোরে এর নিষ্পত্তি হলে সে নিষ্পত্তি ধোপে টিকবে না। স্টালিন পোলাণ্ডের খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে রাশিয়ার শামিল করে গেছেন। পোলাণ্ডকে ধরিয়ে দিয়েছেন জার্মানীর কাটা অংশ। সেখান থেকে পোলরা ভাগিয়ে দিয়েছে জার্মানদের। এটা নিছক গায়ের জোরে সমাধান। এ ব্যবস্থা একদিন না একদিন রদ হবে। যেমন রদ হলো অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়া মিলে পোলাণ্ড ভাগাভাগি। ইতিহাসে দুই এক শতাব্দী খুব বেশী সময় নয়। তিব্বত একদিন স্বাধিকার ফিরে পাবেই। সে কি তার জাতীয় দাবী অমনি ছেড়ে দেবে? তার পুর্ব সীমান্ত ও দক্ষিণ সীমান্ত দুই সীমান্ত ঠিক করে দিয়েছিলেন ম্যাকমহোন। পরে আবার দুই সীমান্ত ঠিক করে দিতে হবে, কমিশন বসাতে হবে, জরীপ করতে হবে, পিলার পুঁততে হবে।

এ সব কবে হবে কেউ বলতে পারে না। কিন্তু হবে একদিন। হতেই হবে। ম্যাকমহোন যেখানে থেমেছিলেন সেইখান থেকেই পুনরায় আরম্ভ করতে হবে। ভারত স্বাক্ষর করেছে, তিব্বত স্বাক্ষর করেছে, চীন স্বাক্ষর করেনি। তার স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হবে। সে এখন লাল হয়েছে, তা হলেও কমিউনিজম এক্ষেত্রে একটা ইস্যু নয়। ইস্যু হচ্ছে চীনের সোভরেন্‌টির সঙ্গে খাপ খায় তিব্বতের এমন এক স্টেটাস। চীনের সোভরেন্‌টি অস্বীকার করে তিব্বতকে একই এলাকার উপর সোভরেন স্টেটাস দিতে ১৯০৭ সালে ব্রিটেনের সাহস হয়নি, রাশিয়ার সাহস হয়নি। নিদ্রিত মাঞ্চু রাজবংশকে তার সার্বভৌমত্ব থেকে বঞ্চিত করতে তিব্বতেরও সাহস হয়নি। নবজাগ্রত প্রজাতন্ত্রী চীনকে বঞ্চিত করা ম্যাকমহোন বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল না। মহাযুদ্ধ আসন্ন দেখে তিনি বহুকালের একটা পুরনো বিরোধ মিটিয়ে দিতে যত্নবান হন। বিরোধটা মুখ্যত চীনে তিব্বতে। চীন-তিব্বতের মাঝখানকার সীমান্তটা ঠিক করাই ছিল আসল কাজ। গৌণত তিব্বতে ভারতে। তিব্বত-ভারতের সীমান্ত নিয়েও দ্বিমত ছিল। তিব্বতীদের জিজ্ঞাসা কর, এখনো তাদের মত আমাদের থেকে পৃথক। ম্যাকমহোন বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য ঘটাতে চেয়েছিলেন। বহু পরিমাণে সফলও হয়েছিলেন। আবার চেষ্টা করতে হবে।

কিন্তু আবার চেষ্টা করবে কে? কী করে? ম্যাকমহোন এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু খোঁজ করলে সে-রকম যোগ্য ব্যক্তির অভাব হবে না। তার পরের ধাপটা হচ্ছে চীনকে ও তিব্বতকে ভারতের সঙ্গে মিলে বৈঠক করতে ডাকা। চীনের নামে নিমন্ত্রণ পিকিং সরকারকে পাঠালে চলবে। কিন্তু তিব্বতের নামে নিমন্ত্রণ কোন্ সরকারকে পাঠানো উচিত হবে? তিব্বত সরকার বলে এখন কেউ নেই। ছিল তিন বছর আগে। ইতিমধ্যে ছেদ পড়ে গেছে। বিদেশে বসে দালাই লামা একটা প্রবাসী তিব্বত সরকার গঠন করতে চাইলে আন্তর্জাতিক আইনের বাধা আছে। ভারত তাঁকে অ্যাসাইলাম দিয়েছে দয়াপরবশ হয়ে। রাজনীতি করতে চাইলে তাঁকে অন্যত্র যেতে হবে। তাঁর প্রবাসী তিব্বত সরকারকে লাল চীন কখনোই স্বীকার করবে না। নীল চীনও করবে না, করলে চীন দেশের সোভরেন্‌টি খর্ব হয়। লাল ও নীল চীন না করলে তাদের সঙ্গে যাদের কূটনৈতিক সম্পর্ক তারাও করবে না। ভারত যদি করে ভারতই কোণঠাসা হবে। সবাই বলবে প্রবাসী তিব্বত সরকার হচ্ছে

ভারতেরই পুত্তলিকা। সে-রকম একটা সরকার গঠিত হলে লাল চীন তৎক্ষণাৎ ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদ করবে। তা হলে নূতন ম্যাকমহোন বৈঠকে যোগ দিচ্ছে কে কে?

নিকট ভবিষ্যতে সে-রকম কোনো বৈঠকের সম্ভাবনা নেই। সুদূর ভবিষ্যতে সুদূর পরাহত। লাল চীনকে যুদ্ধে হারিয়ে দিলে নীল চীন তার স্থান নেবে। সেও তিব্বতকে স্বাধীনতা দিতে নারাজ হবে। তা হলে তাকেও যুদ্ধে হারিয়ে দিতে হয়। যার পিছনে আমেরিকা তাকে হারিয়ে দেওয়া কি ভারতের কর্ম? তাহলে তিব্বতের একমাত্র ভরসা গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহ। সশস্ত্র বিদ্রোহ কোনো কাজে লাগবে না। তিব্বতকে মিথ্যা আশা দেওয়া অন্যায়। পরের সাহায্যের আশায় সে যদি সশস্ত্র বিদ্রোহ করে তবে সে একেবারে পথে বসবে। গান্ধীবাদী গণ-সত্যাগ্রহই তার একমাত্র আশা। ভারতে সেটা সফল হতে প্রায় ত্রিশ বছর লাগল। তিব্বতে তার চেয়েও বেশী দিন লাগবে।

আপাতত ভারত-চীন-তিব্বত বৈঠকের আশা নেই। আশা আছে ভারত-চীন বৈঠকের, যদি চীনের সুমতি হয়, যদি সে ভারতের প্রস্তাব মেনে নিয়ে ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্বের লাইনে ফিরে যায়। হামলা করে চীন তার দরাদরি করার ক্ষমতা বাড়িয়ে নিয়েছে। সে কি তার সেই বাড়তি ক্ষমতা ছেড়ে দিতে রাজী হবে? সে যদি নারাজ হয় তবে ভারতই বা তার শর্তে রাজী হবে কেন? মধ্যস্থরা উদ্যোগী হয়ে কলম্বোতে পঞ্চায়েত বসিয়েছিলেন। পঞ্চায়েতের প্রয়াস সফল হলে ভারত-চীন সাক্ষাৎ আলোচনা শুরু হবে। আলোচনা একবার আরম্ভ হলে একটার পর আরেকটা প্রশ্ন উঠবেই। কথায় কথায় তিব্বত প্রসঙ্গও উঠবে। যদি দশটা প্রশ্নের মধ্যে সাতটা প্রশ্নের নিষ্পত্তি হয়ে যায় তা হলে কোনো সভ্য দেশ বাকি কয়েকটার জন্যে রক্তক্ষয় করে না, আরো কিছুকাল ধৈর্য ধরে। কঠিনতম প্রশ্নগুলিই শেষের দিকে থাকে। আবার এমনও হয় যে কঠিনতমগুলিকে আগে মিটিয়ে নিতে হয়। তা হলে বাকিগুলি অপেক্ষা করতে পারে। এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে কঠিন হলো তিব্বতের স্টেটাস। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্যকে কমনওয়েলথ নাম দিয়ে রানীকে কমনওয়েলথের সর্দার করেছে। ফলে ভারত, পাকিস্থান, সিংহল প্রভৃতি দেশগুলি স্বাধীন হয়েও স্বেচ্ছায় কমনওয়েলথের সভ্য। তাতে উভয় পক্ষেরই লাভ। চীনারা যদি তেমনি কৌশলী হতো তাহলে তিব্বতকেও সেইভাবে সন্তুষ্ট করত।

কঠিনতম না হলেও তার কাছাকাছি যায় তিব্বত থেকে সিনকিয়াং যাতায়াত করার জন্যে নবনির্মিত সড়কের প্রশ্ন। এই সড়ক লডাখ ভেদ করে গেছে। ভারতের আপত্তি স্বাভাবিক। আপত্তিটা শুধু এইজন্যে নয় যে অতখানি জমি বেদখল হয়েছে। গুরুতর কারণ আছে। ভবিষ্যতে যদি কোনো দিন রাশিয়ার সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধে তা হলে সিনকিয়াং চলে যাবে রাশিয়ার কবলে। তখন চীন যদি ঐ সড়ক দিয়ে রাশিয়াকে তাড়াতে যায় রাশিয়া বলবে, ভারত, তুমি কেন চীনকে তোমার জমির উপর দিয়ে আমাকে আঘাত করতে আসতে দিচ্ছ? আজ থেকে তুমি আমার শত্রু। কিংবা এমনও হতে পারে যে ওই সড়ক দিয়ে চীনের সমরোপকরণ যাবে প্রকাশ্যে সিনকিয়াং অঞ্চলে। সেখান থেকে গোপনে আজাদ কাশ্মীর হয়ে পাকিস্তানে। আমারই শিল আমারই নোড়া আমারই ভাঙে দাঁতের গোড়া। চীন যদি ও-সড়ক হাতে রাখতে চায় তা হলে মিটমাট বড়ই কঠিন। অথচ চীন ও-সড়ক অকারণে বানায়নি। বানিয়েছে গুরুতর কারণে। সে আশঙ্কা করে যে ফরমোজা থেকে তার উপর একদিন বহুমুখী আক্রমণ হবে। সেই ভয়ে সে তার পূর্ব উপকূল থেকে কল-কারখানা শ্রমিক ইঞ্জিনীয়ার চালান করে দিচ্ছে সিনকিয়াং ও তিব্বতে, শহরকে শহর খালি করে দিচ্ছে। বেশীর ভাগ লোকই ফিরে যাচ্ছে গ্রামের ক্ষেত-খামারে। কতককে পাঠানো হচ্ছে পাহাড় আবাদ করতে। তিব্বত আর সিনকিয়াং হলো চীনের সাইবেরিয়া। সড়কটা তার প্রাণ।

আলাপ আলোচনা ব্যর্থ হলে আগুন ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে জলে ওঠে। ঘরের কোন্ দিকের চালে লাগে সেটা সব সময়ই একটা চমক। কেউ কি জানত জাপানীরা পার্ল হারবারে হঠাৎ হানা দেবে? প্রথম মহাযুদ্ধের ইতিহাস পড়েছি। পদে পদে চমক। চীনারা বিশ্বাসঘাতকতা করল, এই সত্যটার আগে আর একটা সত্য বোধ হয় অনেকের নজরে পড়েনি। আলাপ আলোচনা চড়ায় ঠেকে বন্ধ হয়ে গেছল। আলাপ আলোচনার অচল অবস্থা হচ্ছে যুদ্ধের পূর্বাবস্থা। তখনি বোঝা উচিত ছিল যে চীনাদের হাতে আর কোন তাস নেই, এবার ওরা খেলবে আক্রমণের তাস। এবং আক্রমণটা ওরা ওদের সুবিধামতো এলাকায় করবে, আমাদের সুবিধামতো নয়। এখন তো আমরা ঠেকে শিখলুম, এর পরে আর সে ভুল করব না। যুদ্ধ চাই কি চাইনে এইটে আগে ভালো করে ভেবে নেওয়া যাক। যুদ্ধ চাইনে, এই যদি হয় মনের কথা, তবে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, বন্ধ করলে চলবে না। যুদ্ধ চাই, এই যদি হয় অন্তরবাসনা,

তবে সব রকম চমকের জন্যে তৈরি থাকতে হবে। আলাপ আলোচনায় ছেদ পড়া মাত্রই বুঝতে হবে আর-একটা চমক আসছে।

আলাপ আলোচনা যে ব্যর্থ হবেই এমন অলুক্ষণে কথা আমি মুখে ধরব না। কিন্তু দুই দেশের মেজাজ যা দেখছি তার ফলে আমার ভাবনা এখন অন্য খাতে বইছে। চীন ও ভারত এই দুই প্রাচীন ও প্রতিবেশী দেশের সত্যকার ট্র্যাজেডী হচ্ছে এইখানে যে, এরা পরস্পরকে বাঁচতে সাহায্য করছে না, মরতে সাহায্য করছে। এদের মধ্যে বাণিজ্য নেই, লোক চলাচল নেই, ভাব বিনিময় নেই, সাংস্কৃতিক আদান প্রদান বহুদিন স্তব্ধ। এরূপ ক্ষেত্রে মানুষে মানুষে ভীম পরিচয় ঘটে যুদ্ধক্ষেত্রে। ঘটায় অঘটনঘটন পটীয়সী প্রকৃতি। মারতে মারতে মরতে মরতে মানুষ পরস্পরকে চেনে। তা ছাড়া, এদের জনসংখ্যা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। সীমায় ফিরিয়ে আনার আর কোনো উপায় যদি না থাকে তবে প্রকৃতিই মন্ত্রণা দেবে উভয়ের কানে, "ওরা অসুর, তোমরা দেবতা। ওদের মারলে পাপ হবে না। ওদের মারো।"

আমি দিনরাত চিন্তা করেছি। আমার কর্তব্য কী? নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য আমার রাষ্ট্রকে সাহায্য করা। আমার স্ত্রী জওয়ানদের জন্যে পশমের দস্তানা বুনছেন, আমার মেয়েরা ফার্স্ট এড শিখছে, আমিও চাঁদা দিচ্ছি, ট্যাক্স দিচ্ছি। ডাক পড়লে সিভিল ডিফেন্সে যোগ দিতেও রাজী। কিন্তু লেখক বা শিল্পী হিসাবে আমার নিজেরও তো একটা যোগসাধনা আছে। সৃষ্টিযোগে স্রষ্টার সঙ্গে ও তাঁর সৃষ্টির সঙ্গে যোগসাধন। আমাকে যোগভ্রষ্ট করে কার কী লাভ? কতটুকু লাভ? আমি যদি আমার সাধনায় নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখার মতো অতন্দ্র থাকি কার কী ক্ষতি? কতটুকু ক্ষতি? আমিও তো একটা দিক সামলাচ্ছি। সংস্কৃতির দিক। বিশুদ্ধ সঙ্গীত, বিশুদ্ধ সৌন্দর্য, বিশুদ্ধ সত্য, বিশুদ্ধ প্রেম এসব সূত্র থেকেও প্রতিরোধশক্তি আহরণ করা যায়। যেকাজে আমি হাত দিয়েছি সেটাও একটা করবার মতো কাজ। তার জন্যে আমি জীবিকা ত্যাগ করেছি। এখন যদি তাকেও ত্যাগ করি তবে আমার জীবনের সম্বল আর কী রইল?

কবি বা শিল্পী যেন গর্ভিণী নারী। তাকে তার গর্ভ রক্ষা করতে হবে অতি যত্নে, অতি সাবধানে। সেই তার দেশরক্ষা। দেশ কি কেবল দেশের মাটি? দেশের আদর্শ, দেশের ধ্যান, দেশের স্বপ্ন, দেশের রস, দেশের রূপ এসবও দেশ। চিন্ময় ভারতকে মৃন্ময় ভারতেরই মতো রক্ষা করতে হবে। একাজ

করবে কে, যার কাজ সে যদি না করে? সবাইকে সব কাজে ডাকতে নেই। দেশমাতার চাল্লিশ কোটি সন্তান রয়েছে। প্রবণতা ও যোগ্যতা অনুসারে কাজ ভাগ করে দিলেই হয়। তা হলে কোনো কিছুর জন্যে লোকের অনটন হবে না। আমাকেও লিখতে হবে না এমন কোনো রচনা যার জন্যে আমার সৃষ্টি হয়নি, যা আমার সৃষ্টি নয়। যেটা আমি লিখছি সেটা যদি ঠিকমতো লিখতে পারি দেশ তার থেকেও প্রতিরোধশক্তি পেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলি। প্যারিসে আমার এক বন্ধু ছিলেন। বাঙালী। আমার প্রথম প্রকাশিত বই "তারুণ্য" তাঁকে উপহার দিই ১৯২৮ কি ১৯২৯ সালে। তার পর আমি দেশে ফিরে আসি। তিনি থেকে যান। অনেকবার তাঁর কথা জানতে চেয়েছি, কিন্তু কোথাও কোনো সন্ধান পাইনি। সেই নিরুদ্দেশ বন্ধুকে হঠাৎ দেখতে পাই কলকাতায় বিনয় সরকার মহাশয়ের ওখানে ১৯৪৭ সালে। আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। তিনিই আমাকে চিনলেন। আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর গৃহিণীর সঙ্গে। অস্ট্রিয়ান কাউন্টেস। মহাযুদ্ধের সময় তাঁরা ছিলেন হলাণ্ডে। সে সময় কালো মানুষ বলে তাঁকে কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে পাঠানো হয়। তাঁর স্ত্রীকে ভয় দেখানো হয় এই বলে যে, তোমার স্বামীকে তুমি ডিভোর্স কর, নইলে তার প্রাণসংশয়। স্বামীর মত নিয়ে স্ত্রী তাই করলেন। কিন্তু কাছাকাছি এক জায়গায় থাকলেন।

"সেই দুর্দিনে", বন্ধু আমাকে বললেন, "আপনার বই আমাকে মনের জোর জুগিয়েছে। আমাকে বেঁচে থাকতে সাহায্য করেছে। নাৎসীদের কবলে যে কয় বছর ছিলুম আপনার বই ছিল আমার সঙ্গী ও আপনার বাণী ছিল আমার সহায়।"

আমি অভিভূত হলুম। অত বড় পুরস্কার কেউ কোনো দিন আমাকে দেয়নি। আমিও মনে জোর পেলুম। আমার বন্ধু আমাকে বাঁচতে সাহায্য করলেন। দেশ বিভক্ত, হিন্দু মুসলমান লাখে লাখে মরছে ও পালাচ্ছে, গান্ধীজীর স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছে, প্রাণও গেল কিছুদিন বাদে। বাঁচতে কে চায়? কিসের জন্যে বাঁচবে? তবু বাঁচতে হলো আমাকে। আমার অর্জুন-বিষাদ দূর হলো। দেখলুম সত্যের শক্তি অসীম। নাৎসীর বিরুদ্ধেও সে প্রতিরোধশক্তি জোগায়। সাহিত্যকে যদি আমি রক্ষা করি সে অপরকে রক্ষা করবে।

পর্বতো বহ্নিমান্

পাহাড়ে আগুন লেগেছে শুনে মনে পড়ল, পাহাড়ে আগুন লেগেছে। আমাদের বাড়ীর সদর দরজার ঠিক সামনে। গড়পর্বতে। দিনের বেলা বোঝা যায় গরম বাতাস গায়ে লেগে। সন্ধ্যাবেলা চোখে পড়ে রাঙা আলোর লহর পাহাড়ের গলার এধার থেকে ওধারে। কী তার বাহার! সারা রাত জুড়ে রোশনাই লেগে আছে, আমরা যখন ঘুমিয়ে তখনো সে জেগে। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় তপ্ত হাওয়ায়।

আমরাই পালাতে পারিনে। তাহলে ভেবে দেখ পশুপাখী গাছপালার কথা। পশুপাখী পালাবার সময় পায় না, পালাতে গিয়ে দেখে চারদিকে আগুন। গাছপালা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জলে যায়। যে পাহাড় ছিল প্রাণের আশ্রয়ভূমি সেই হলো মরণের ফাঁদ। সেইসব প্রাণীর জন্যে আমরাও কাঁদি। কিন্তু তখনো আমি অসহায় শিশু। আমি নিজেকেই বাঁচাতে পারিনে। ওদের বাঁচাব কী করে? এমন বছর যায় না যে বছর একটা না একটা পাহাড়ে আগুন লাগে না। গড়পর্বতে নয় তো মেঘা পাহাড়ে, মেঘা পাহাড়ে নয় তো কুটুনিয়া পাহাড়ে। কোরিয়া পাহাড়ে। এগুলো অত কাছে নয় বলে গায়ে আঁচ লাগে না, কিন্তু সন্ধ্যাবেলা চেয়ে দেখি রাঙা আলোর রোশনাই লেগে আছে। নীরো হলে বেহালা বাজিয়ে সঙ্গত রাখতেন প্রকৃতির ওই পরম রমণীয়তার সঙ্গে।

প্রকৃতির? একটু বড় হয়ে জিজ্ঞাসা জাগল, আগুন কে লাগায়? প্রকৃতি না মানুষ? ওটা কি তুফান ভূমিকম্পের মতো নৈসর্গিক ব্যাপার না আমাদেরি পাড়ার 'ঘরপুড়ি'র মতো মানবিক? উত্তর পেলুম, কাঠ কাটতে বা কুড়োতে যারা যায় তারা হয়তো অনবধান হয়ে আধপোড়া বিড়ি বা পিকা বা ধুঁয়াপত্র ফেলে দিয়ে আসে। শুকনো পাতার উপরে। শুকনো পাতা হাওয়ায় আগুন ধরিয়ে বেড়ায়। কোথাকার জল কোথায় গড়ায়। একটি বোকা মানুষ এক মুহূর্তের একটা ভুলে আস্ত একটা পাহাড়ের অগণিত পশুপাখী ও গাছপালাকে বিনা নোটিশে পুড়িয়ে মারে। তার পরে মরা হরিণ মরা পাখী নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। কারো সর্বনাশ কারো পৌষমাস।

বড়দের জিজ্ঞাসা করি, আগুন কেন কেউ নেবায় না?

উত্তর পাই, ওটা রাজার পাহাড়। যার পাহাড় সেই নেবাবে। রাজা তো স্বয়ং নেবাতে যাবেন না, হুকুম দেন দেওয়ানকে। দেওয়ান হুকুম দেন ফরেস্ট অফিসারকে। ফরেস্ট অফিসার অবশ্য ঘটনাস্থলে যান, কিন্তু হুকুম দেন রেঞ্জারদের। রেঞ্জাররা ছুটোছুটি করেন, কিন্তু হুকুম দেন ফরেস্ট গার্ডদের। গার্ডরা হৈ চৈ বাধায়, কিন্তু হুকুম দেয় চৌকিদারদের। চৌকিদাররা ধরে নিয়ে আসে গাঁয়ের গরিব লোকদের। তারা রাজার জন্যে বেগার খাটতে বাধ্য। তাদের বলা হয় বেঠিয়া। একটা পয়সাও পাবে না। হরিণটা বনমোরগটা পেলেও উপরওয়ালাদের নৈবেদ্য দিতে হবে। তারা বলে, যাচ্ছি, যাব, হচ্ছে, হবে। আগে জল জোগাড় করি, বালি জোগাড় করি। আগুন যত সুলভ জল তত সুলভ নয়। অনেক মেহনত করে সারা গাঁয়ের এক মাত্র ইঁদারা থেকে জল তুলতে হয়। রাজপুরুষরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দৃশ্য দেখেন আর গালমন্দ দেন। আর মারধোর করেন, কিন্তু কাজ এগোয় না। আগুন ততক্ষণে মানুষেরও আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। সে তার খুশিমতো জায়গায় থামবে। দিন কয়েক বাদে আপনাআপনি নিববে।

ফী বছর আগুন লাগে। তা হলে আগে থেকে তারা তৈরি হয় না কেন? ফায়ার ব্রিগেড বানায় না কেন? ফায়ার ড্রিল করে না কেন? জিজ্ঞাসা করি আরো বয়স হলে। উত্তর পাই, সবই সম্ভব, অথচ কিছুই সম্ভব নয়। কারণ রাজার আয় মোটে তিন লাখ টাকা। রাজপরিবারকে রাজার হালে রাখতে খরচ হয় দেড় লাখ। অফিসারদের পুষতে এক লাখ। বাদবাকী যা থাকে তা দিয়ে রাস্তাঘাট, ইস্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি সব কিছুই টিকিয়ে রাখতে হয়। একটা জেলখানাও আছে। কিন্তু কয়েদী বেশী নেই। অতগুলো লোককে খাওয়াবে কে?

একটু একটু করে বড় হই আর একটু একটু করে বুঝি যে, আগুন নেবানো অসম্ভব নয়, সম্ভবও নয়। তা না হয় হলো, কিন্তু আগুন যে লাগবেই এমন কী কথা আছে! চেষ্টা করলে নিবারণ তো করা যায়। কেউ কেন নিবারণ করে না? এর উত্তর শুনি, পাহাড়ে যদি কেউ না যায় তা হলে আগুন লাগার কোন হেতু নেই। সব পাহাড়ে লাগে না। কিন্তু কাঠ কাটতে বা কুড়োতে যারা যাবে তারা কেউ কোনোদিন বিড়ি খাবে না, পিকা টানবে না, ধুঁয়াপত্র নেবে না এমন ফারমান জারি করাও যা, না করাও তাই। দিনমান যারা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটবে তামাক তাদের কাছে ডালভাতের মতোই দরকারী।

নিবারণ অসম্ভবও নয়, সম্ভবও নয়। আরো বড় হয়ে আরো জিজ্ঞাসা করি। এবার শুধু ঘরের বড়দের নয় বাইরের বড়দেরও। উত্তর পাই, পাহাড়টা রাজার নয় প্রজাদের। তার সংরক্ষণ প্রজাদের প্রত্যেকেরই ভাবনা। সে ভাবনা রাজপুরুষদের উপর ছেড়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। যেখানে নিবারণ সম্ভব সেখানে নিবারণ করতে হয়। যেখানে নিবারণ সম্ভব নয় সেখানে নির্বাপণ করতে হয়। যেখানে পূর্ণ নির্বাপণ সম্ভব নয়, কিন্তু আংশিক সম্ভব, সেখানে আংশিক করতে হয়। প্রাণপণ চেষ্টায় নারী ও শিশুকে বাঁচানো যায়।

সমবেদনা

প্রত্যেকবার পূজার লেখা চুকিয়ে দিয়ে আমি কিছুদিন দম নিই। এবার কিন্তু অবিশ্রাম কলম চালিয়েছি। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে কয়েকটি প্রবন্ধ না লিখলে নয়। সময়মতো প্রকাশ করাও চাই। এ যেন ট্রেন ধরার জন্যে উর্ধ্বশ্বাসে ছোটা। ফল হলো স্বাস্থ্যভঙ্গ। বাধ্য হয়ে বিশ্রামে নিতে হলো। অবশ্য নির্জলা বিশ্রাম আমার বরাতে নেই। ধাতেও নেই। তবু যথাসম্ভব লেখার কাজ এড়িয়েছি। আপনার অনুরোধের উত্তরে গল্প কেন গেল না, প্রবন্ধ কেন বিকল্প হলো না, এই তার কৈফিয়ৎ।

নীরব থাকতেই আমার ইচ্ছা। কিন্তু সম্প্রতি এমন একটি ব্যাপার ঘটে গেছে যা আমাকে নিশিদিন ভাবিয়েছে। এই ভাবনাব কোথাও একটা রেকর্ড থাকলে ভালো হয়। মনে হলো আপনাকে লেখা চিঠিখানিকে আর একটু বড় করলে আলোচনার অবকাশ মেলে। কারণ আপনিও নিশ্চয় ভাবছেন। হাঁ, পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে।

ইতিহাসে কোনোদিন দেখা যায় নি যে সামরিক আইন সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বলবৎ রয়েছে। সাড়ে তিন বছর পরেও কেউ বলতে পাছে না আরো কতকাল বহাল থাকবে। ইংরেজ আমলে সামরিক আইন আমাদের ছেলেবেলায় একবার জারি হয়েছিল মনে আছে। সেও কেবলমাত্র পাঞ্জাবে। তার মেয়াদ বোধহয় দিন পনেরো কি এক মাস। মাথার উপরে হাইকোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিল থাকতে বড়লাট বা জঙ্গীলাটের সাহস ছিল না যে সামরিক আইন জারি করে নাগরিকদের দেওয়ানী ফৌজদারি আদালতে যাবার অধিকার হরণ করেন বা খর্ব করেন। তখনকার দিনে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী ছিল না। কিন্তু লাট সাহেবরা হাইকোর্টকে জুজুর মতো ডরাতেন। প্রিভি কাউন্সিলকে যমের মতো ভয় করতেন। দেশের আভ্যন্তরিক বিষয়ে জঙ্গীলাটের হস্তক্ষেপ অচিন্ত্যনীয় ছিল। সেনাবিভাগের প্রকৃত কাজ ছিল বাইরের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করা। শাসন ও শৃঙ্খলা ছিল সেনাবিভাগের নাগালের বাইরে। গুরুতর শান্তিভঙ্গের সময় পুলিশ হার মানলেই সৈন্যদের তলব করা হতো।

এ ব্যবস্থা ইংরেজ আমলে গোড়া থেকেই প্রবর্তিত হয়। পার্লামেণ্টারি

ডেমোক্রেসীর সঙ্গে এর সম্পর্ক সেকালে ছিল না। আমাদের জীবনকালেই ইংরেজরা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর ভিত্তিপাত করে। আমাদের নেতাদেরই নির্বন্ধে ও জনগণের চাপে। আমরা নিষ্ক্রিয় থাকলে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর নামগন্ধ থাকত না। হাইকোর্ট থাকত, প্রিভি কাউন্সিল থাকত, সেখানে গিয়ে বিচার চাইবার অধিকার থাকত। স্বল্পকালের জন্যে বা বিশেষ কোনো অঞ্চলে সে অধিকার খর্ব হতে পারত, কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে সেই অধিকারটাই ছিল ব্রিটিশ প্রজার প্রজাস্বত্ব। যার জন্যে লোকে দেশীয় রাজ্য ছেড়ে চলে এসে ব্রিটিশ এলাকায় বসত করত। ইংরেজরা যদি এইটুকুও না দিত তা হলে দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে কোম্পানীর রাজ্যের বা মহারানীর রাজ্যের তফাৎ থাকত না। লোকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে আন্দোলন বাধিয়ে দিত অষ্টাদশ শতাব্দীতেই।

যে কোন শাসন ব্যবস্থার তিনটি অঙ্গ। একজিকিউটিভ। জুডিসিয়াল। লেজিস্‌লেটিভ। ইংরেজরা বড় সহজে একজিকিউটিভ ক্ষমতা ছাড়তে চায় নি। ছাড়তে বাধ্য হয় ১৯৪৭ সালে। আরো চার দশক আগে লেজিসলেটিভ ক্ষমতা ছাড়তে আরম্ভ করে। পার্লামেণ্টের অনুকরণে একটা কিছু খাড়া হয়। সেখানে বাজেট পেশ করা হয়। প্রজাপ্রতিনিধিরা সেখানে তর্ক বিতর্ক করেন। ভোট দেন। অবশ্য ভোট দিয়ে সরকারকে হারিয়ে দেওয়া চলত না। হারিয়ে দিলেও সরকার নাছোড়বান্দা। তবু জানিয়ে দেওয়া যেত যে প্রজাদের সম্মতি নেই। এইভাবে একটা অপোজিশন গড়ে ওঠে। শাসন করেন রাজপ্রতিনিধি, অপোজ করেন প্রজাপ্রতিনিধি। এটাও বড় সামান্য অধিকার নয়। এটাও আদায় করতে হয়েছে বহু জনের বহু তপস্যায়। কিন্তু জুডিসিয়াল নিয়ে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকদের মনোভাব বরাবরই অনুকূল ছিল। যেখানে স্থানীয় শাসকরা প্রতিকূল সেখানে বিলেতের পার্লামেণ্ট অনুকূল। বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে বা স্বল্পকালের জন্যে সামরিক বা আধাসামরিক আইন প্রবর্তন করার ক্ষমতা শাসকসম্প্রদায়ের ছিল, কিন্তু সব সময়ের জন্যে সারা দেশ সামরিক আইনের আমলে আসবে এ কথা রাজা প্রজা কেউ কোনো দিন ভাবতেই পারেন নি। এ ক্ষমতা দাবি করলে ইংরেজ অনেক আগেই বিদায় হতো। ইংরেজ রাজত্ব নিরঙ্কুশ পুলিস রাজত্ব বা মিলিটারি রাজত্ব ছিল না।

বহুকাল আমরা পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী বিনা বাস করেছি। পাকিস্তান থেকে ও জিনিস উঠে যাওয়া দুঃখের কথা, কিন্তু ওর অভাব আমাদের অজানা

নয়। অজানা হচ্ছে নিরঙ্কুশ মিলিটারি শাসন, সামরিক আইন, সামরিক আদালত। কোর্ট মার্শাল শুনলেই বুকটা কেঁপে ওঠে। বিচার করবেন যাঁরা তাঁরা পেশাদার সৈনিক। তাঁদের কাছে সব চেয়ে বড় কথা প্রজার অধিকার নয়, তাঁদেরি অধিকৃত ক্ষমতা। সে ক্ষমতা তাঁরা স্বেচ্ছায় ছাড়বেন না। সুতরাং হাইকোর্ট সুপ্রীমকোর্ট অসহায়। আপীল করতে হলে মিলিটারির বিরুদ্ধে মিলিটারির কাছেই করতে হয়। এ যেন বাঁ হাতের বিরুদ্ধে আপীল ডান হাতের কাছে। কার ঘাড়ে দুটো মাথা যে মিলিটারিকে শত্রু করবে! যদি জেতে তা হলে তো শত্রুতা আরো বাড়বে। এমন রাজত্বে চুরি ডাকাতি হয়তো বন্ধ, কিন্তু প্রজামাত্রেই চোরের মতো চুপি চুপি বাস করে। লাভ হয়তো অনেক দিক থেকে হয়, কিন্তু খোয়া যায় মানুষের সৎসাহস।

ঢাকার ছাত্ররা যা করেছে তা সুরার্বদীর জন্যে নয়, তা যে-কোনো একজন বন্দী নাগরিকের জন্যে। একজন নরঘাতকেরও ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হবার অধিকার আছে, একজন রাজদ্রোহীরও হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার আছে। অন্তত ছিল কিছুদিন আগেও। এসব অধিকার বাজেয়াপ্ত হলে বা তামাদি হলে কেউ নিরাপদ নয়। সুতরাং ছাত্রদের আন্দোলনটা রাজনৈতিক আন্দোলনের কোটায় পড়ে না। এ হলো যে-কোনো সভ্য দেশের মূলনীতির প্রশ্ন। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসী স্বতন্ত্র এক ইসু। পাকিস্তান হয়তো পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসীর উপযুক্ত নয়। কিন্তু যে কোনো ব্যক্তিই হেবিয়াস কর্পাসের উপযুক্ত, গ্রেপ্তারের চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে হাজির হওয়ার যোগ্য। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসীর বদলে শুনছি বেসিক ডেমোক্রেসী প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। বেশ তো। বেসিক ডেমোক্রেসীই সই। কিন্তু তার চেয়েও যা বেসিক তার পত্তন হবে কবে? সামরিক আইন রহিত হবে কবে? বলা বাহুল্য সামরিক আইনকে অর্ডিনান্স বা রেগুলেশন ইত্যাদির ছদ্মবেশ পরালেও তা সামরিক আইনই থাকে। প্রথম কথা হলো লোকের মৌল অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা। লোকে যদি দাবি করতে সাহস না পায় তবে সাহস যাদের আছে তারাই লোকের হয়ে দাবি করবে। তারা হয়তো জনাকয়েক নাবালক ছাত্র, তবু তাদের দিকেই ন্যায়। জনসাধারণের সহানুভূতি তাদেরই প্রতি। জোর করে তাদের কণ্ঠ রোধ করলে কী হবে, তাদের কণ্ঠস্বর অপ্রতিরোধ্য। পৃথিবীর মানুষ ইতিমধ্যে সে স্বর শুনে ফেলেছে। পাকিস্তানে যে সর্বাধিনায়কের স্বর ভিন্ন আর একটি স্বরও আছে এটা এতদিন কারো

জানা ছিল না। এখন জানা গেল যে সামরিক শাসনের আতঙ্ক কেটে গেছে। মানুষ আর চায় না চোরের মতো চুপি চুপি বাঁচতে। বেসিক ডেমোক্রেসীকেও মানুষের এই পরিবর্তিত মনোভাবের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। নয়তো বেসিক ডেমোক্রেসীও ধোপে টিকবে না। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর মতোই ডিকটেটরশিপকে পথ ছেড়ে দেবে। তখন ডিকটেটরশিপকে জনগণের সঙ্গে সরাসরি মোকাবিলা করতে হবে। মাঝখানে কোনো প্রকার প্রতিনিধিমণ্ডলী থাকবে না।

বেসিক ডেমোক্রেসী বস্তুটা কী তা ইতিহাসের পাঠকদের অজ্ঞাত। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্রের প্রকাশিত সারাংশ পাঠ করে আমার মনে হলো তার মধ্যে ডেমোক্রেসীর মূলসূত্রটাই নিখোঁজ। এক একটি মানুষের এক একটি ভোট—এই যদি হয় গণতন্ত্রের মূলসূত্র তা হলেও পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের ভোটার সংখ্যার চেয়ে বেশী হতে বাধ্য, কারণ জনসংখ্যা বেশী। সুতরাং পরোক্ষভাবে নির্বাচিত "বেসিক ডেমোক্রাট"দের সংখ্যাও বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু জোর করে তাদের সংখ্যা সমান রাখা হয়েছে। এর মানে পূর্ব পাকিস্তানীদের সংখ্যা বেশী হলেও মূল্য বেশী নয়। এক একটি পশ্চিম পাকিস্তানীর মূল্য একাধিক পূর্ব পাকিস্তানীর সমান। এক একটি পশ্চিম পাকিস্তানী ভোটের মূল্য একাধিক পূর্ব পাকিস্তানী ভোটের সমান। এ রকম রাজনৈতিক ভারসাম্যের অন্য নাম থাকতে পারে, কিন্তু একে ডেমোক্রেসী বলে চালানো কি ঠিক? তা হলে ইংরেজী অভিধানে ডেমোক্রেসী কথাটার অর্থ বদলে দিতে হয়। কিংবা তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়—পাকিস্তানে এই শব্দের অর্থ, এক একটি পশ্চিম পাকিস্তানী ভোটের দাম এক একটি পূর্ব পাকিস্তানী ভোটের চেয়ে বেশী। ছলে বলে কৌশলে সংখ্যাগুরুকে সমসংখ্যকে পরিণত করার নাম বেসিক ডেমোক্রেসী।

বলা বাহুল্য পূর্ব পাকিস্তানীদের চোখে এ ফাঁকি ধরা পড়ে যেতে একটা নির্বাচনই যথেষ্ট। দ্বিতীয় নির্বাচনের পূর্বেই এ শাসনতন্ত্র রদবদল করতে হবে, তাদের মতামতের যদি লেশমাত্র ওজন থাকে। কিন্তু রদবদল করলে আবার উলটো বিপত্তি। পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যালঘু হতে নারাজ হবে। পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে অচল অবস্থা ঘটার আসল কারণই তো এই যে, পশ্চিম পাকিস্তানীরা সংখ্যায় লঘু হয়েও সমান হতে চায়, শেষকালে পূর্ব পাকিস্তানীরা হাল ছেড়ে দিয়ে বলে, আচ্ছা, তাই হোক, কিন্তু যৌথ নির্বাচন

পদ্ধতি প্রবর্তন করা চাই। তাতে পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকেই রাজী, কিন্তু মুসলিম লীগ নারাজ। ভয়ানক একটা মারামারির আয়োজন চলছিল, ডিকটেটর এসে থামিয়ে দেন। এখন ডিকটেটর ভারসাম্য বজায় রাখতে গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানী ভোটকে অসমান করে দিলেন। প্রত্যেকটি নাগরিক হয়ে গেল মাথায় খাটো। মাথা হেঁট করে চলতে হবে তাকে। তবে যতদূর বুঝতে পারছি যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিই মেনে নেওয়া হলো। অর্থাৎ ধর্ম অনুসারে পৃথক তালিকা হবে না। আমার অনুমান যদি সত্য হয় তবে আয়ুব খান্ ধন্য। তিনি অসাধ্যসাধন করেছেন। পাকিস্তানের হাওয়া বদলে যাবে এর ফলে। আমি ডিকটেটরশিপ পছন্দ করিনে। কিন্তু ডিকটেটর যদি এমন একটি মহৎ কর্ম করেন যা আর কেউ করতে পারতেন না তবে আমি একশো বার তাঁর প্রশংসা করব।

পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে ছেড়ে টিকতে পারবে না। কারণ তার পরের দিনই পাঠানিস্তানের রব উঠবে। ভাঙন একবার একদিকে ধরলে আবার আরেক দিকে ধরবে। পাকিস্তানের অস্তিত্বই নির্ভর করছে পূর্ব-পশ্চিম ঐক্যের উপর। অথচ ঐক্য কখনো অবিশ্বাসের উপর দাঁড়াতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানার মনে যদি সন্দেহ জাগে যে সে অসমান বা খর্ব তা হলে সে পৃথক রাষ্ট্রের ধ্যান করবেই। যে যুগে আমরা বাস করছি সে যুগে কোনো মানুষই অসমান বা খর্ব হতে চায় না। নাগরিকত্বের মূল সূত্র হলো, কেউ কারো চেয়ে কম মূল্যবান নয়। যে কম মূল্যবান তাকে বলা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। পূর্ব পাকিস্তানী হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক আর পশ্চিম পাকিস্তানী হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক এ কখনো হতে পারে না। সুতরাং এই শাসনতন্ত্রের যদি রদবদল করা না হয় তবে পৃথক রাষ্ট্রের চিন্তা উদয় হবেই। পৃথক রাষ্ট্র হয়তো অকেজো হবে, খারাপ হবে, ধ্বসে পড়বে। কিন্তু সেই ভয়ে লোকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে রাজী হবে না। আয়ুব খান্ যদি আরেক কদম এগিয়ে গিয়ে ঘোষণা করেন যে, এক একটি মানুষ এক একটি ভোট তা হলে আমি ধন্য ধন্য করব। তার মানে সারা পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানীরাই সংখ্যাগুরু বলে স্বীকৃত হবে। পার্লামেণ্টে তাদেরি আসনসংখ্যা অধিকতর হবে। তা হলে আর তারা পৃথক রাষ্ট্রের কথা মনেও আনবে না। কিন্তু তখন হয়তো শোনা যাবে বেসিক ডেমোক্রেসীও পাকিস্তানের জন্যে নয়। তাকেও খারিজ করতে হবে। পাকিস্তানের পক্ষে নির্জলা ডিকটেটরশিপই

শ্রেয়। তখন হয়তো আয়ুবের দিন যাবে। তাঁর জায়গা নেবেন তাঁর চেয়েও জাঁদরেল এক পাঞ্জাবী সেনানায়ক।

আয়ুবের কাছ থেকে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট একটা শাসনতন্ত্র প্রত্যাশা করাই অত্যাশা। তিনি তাঁর সাধ্য হিসাব করে কাজ করেছেন। পুর্ব পাকিস্তানের অসন্তোষ যদি দূর না হয় তবে পশ্চিম পাকিস্তানের জনমতের উপরেই নির্ভর করবে ভবিষ্যৎ। সেখানকার জনমত যদি একবাক্যে বলে যে পুর্ব পাকিস্তানী ভাইদের খাতিরে শাসনতন্ত্র রদবদল করতে হবে আয়ুব খান্ অন্তরায় হবেন না। এ সমস্যার স্রষ্টা তিনি নন। এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে পাকিস্তানের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে। সেদিন কারো মাথায় আসেনি যে সমস্যার মীমাংসা না হলে পাকিস্তান তার শাসনতন্ত্র রচনা করতে পারবে না, দরকার হবে একজন ডিকটেটরের, সেই নেপোলিয়নই দেবেন তাকে তার প্রথম শাসনতন্ত্র। কিন্তু প্রথম শাসনতন্ত্রই শেষ শাসনতন্ত্র নয়। বেসিক ডেমোক্রেসীও পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর মতো বানচাল হতে পারে। তখন আবার ঘুরে ফিরে নির্জলা ডিকটেটরশিপ। তার পরে কী?

পরোক্ষ নির্বাচনের উপর আমারও এক কালে আস্থা ছিল। তাতে খরচ ঢের কম। প্রত্যক্ষ নির্বাচনে একে তো টাকার শ্রাদ্ধ, তার উপর সাম্প্রদায়িক বা অন্যবিধ উত্তেজনা। যারা টাকা বেশী খরচ করতে পারে না তারা এমন এক উত্তেজনা জাগিয়ে তোলে যার নেশায় মানুষ আপনি ভোট দিয়ে যায়। মুসলিম লীগ যে পাকিস্তানের জিগীর তুলে সস্তায় ভোট পেল সেটা প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির জন্যেই। কিন্তু আমিও ক্রমে ক্রমে পরোক্ষ নির্বাচনে আস্থা হারিয়েছি। প্রত্যক্ষ নির্বাচন প্রত্যক্ষ শিক্ষাপ্রদ। লোকে যদি ভুল করে ভোট দিয়ে থাকে, তবে ভুল বুঝতে পেরে নিজের কান মলে। দ্বিতীয় বার ভুল করে না। দ্বিতীয় বার যদি নতুন একটা ভুল করে তো তৃতীয় বার সতর্ক হয়। ভুল করতে করতে মানুষ ঠিক করতে শেখে। এই শিক্ষাটা ব্যয়সাপেক্ষ। এর থেকে বিভ্রাটও ঘটতে পারে। যেমন ঘটল দেশবিভাজন। কিন্তু মানুষকে রাজনীতি শেখানোর আর কোনো সরল উপায় নেই। অবশ্য যদি স্বীকার করেন যে রাজনীতি একটা শিক্ষণীয় বিষয়। তা যদি না হয়ে থাকে তবে সব মানুষকে ভোটার বানাতে যান কেন? নাগরিকমাত্রেরই যদি ভোট দেবার অধিকার ও দায়িত্ব থাকে তবে রাজনীতি শিক্ষারও প্রয়োজন থাকে।

তা ছাড়া প্রত্যক্ষ নির্বাচনের পক্ষে মোক্ষম যুক্তি হলো নির্বাচকের সঙ্গে

নির্বাচিতের সাক্ষাৎ যোগাযোগ। প্রার্থী স্বয়ং আমার ঘরে এসে বলেন, "আমাকে ভোট দিন। আমি আপনার প্রতিনিধি।" কে যে আমার প্রতিনিধি তা আমি জানতে পারি। তাঁর ঘরে গিয়ে বলতে পারি, "আসছে বার আপনাকে ভোট দিচ্ছিনে। আপনি কথা রাখেন নি।" পরোক্ষ নির্বাচনে এই সাক্ষাৎ যোগাযোগ ঘটে না। একটা উদাহরণ দিই। আমাদের বিধানসভায় আমরা যাঁদের ভোট দিয়ে পাঠাই তাঁরা আরেক দফা ভোট দিয়ে আরো কয়েকজনকে রাজ্যসভায় পাঠান। রাজ্যসভার এইসব সদস্য পরোক্ষভাবে আপনার আমারও প্রতিনিধি। কিন্তু এঁদের এক একজনের কাজ হাসিল হয়ে যায় বিধানসভার চল্লিশজন কি পঞ্চাশজন সভ্যকে ধরলে। সেই চল্লিশটি কি পঞ্চাশটি ভোট হাত করতে পারলে এঁরা অক্লেশে বৈতরণী পার হয়ে যান। বৃহৎ নির্বাচক মণ্ডলীর দিকে ফিরেও তাকান না। কে যে কোন্ জেলা থেকে বা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হলেন, কেউ তা জানেন না। না আমরা, না এঁরা। এই ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ বলেই রক্ষা। ব্যাপক হলে নির্বাচিতরা জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন না, জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন করতেন না, অল্প কয়েকজনকে কোনো রকমে বশ করতে পারলেই তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতো। পরোক্ষ নির্বাচন দায়িত্বহীনতার প্রশ্রয় দেয়। ফলে রাজনীতি শিক্ষা হয় না। আয়ুব খান্ রাজনীতিকদের শত হস্ত দূরে রাখতে চান বলেই এর পক্ষপাতী। কিন্তু লোকে তাদের প্রতিনিধিদের চিনতে পারবে না।

রাজনীতিকদের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁদের উপর বিরাগ জন্মানো অস্বাভাবিক নয়। পাকিস্তানের বাইরেও তো রাজনীতিকদের গদিচ্যুত করে কয়েদ করে সৈনিকরাই ক্ষমতা দখল করছেন। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী ফ্রান্সের মতো উন্নত দেশেও ঠিকমতো চালানো গেল না। সেখানেও তার একটা বিকল্প সংস্করণ প্রবর্তিত হয়েছে। দ্য গলের পরে কী হবে কেউ জানে না। বিচিত্র নয় যে সেনাপতি মণ্ডলী দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা আত্মসাৎ করবে। যেখানে অগণ্য দল, অগণ্য দলপতি সেখানে ফী বছর একটা করে গবর্নমেণ্ট গঠন করে নূতনত্বের স্বাদ পাওয়া যায়, কিন্তু পলিসির স্থায়িত্ব থাকে না, প্রশাসনও লণ্ডভণ্ড হয়। সেই জন্যে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর অলিখিত শর্ত হচ্ছে দুটি মাত্র প্রধান দল রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে। এক দল ব্যাট ধরবে, অপর দল বল করবে। দেখা যাচ্ছে সব দেশ রাজনৈতিক ক্রিকেটের উপযুক্ত নয়। আরো একটা অলিখিত শর্ত হচ্ছে দেশের লীডারশিপ নেবার মতো সর্বজনমান্য

ব্যক্তি থাকবেন। অন্ততপক্ষে তাঁর নিজের দলের সকলে তাঁকে মানবে। যেখানে এ দুটি অলিখিত শর্ত পূরণ করা সম্ভব নয়, সেখানে শুধু একটা শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করলেই পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী আপনা আপনি চলে না। পাকিস্তানে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা একান্ত দুরূহ। সেখানে বহু দল, বহু দলপতি। লীডারশিপ নেবার মতো সর্বজনমান্য ব্যক্তি হয়তো ফজলুল হক, কিন্তু তিনি এখন স্থবির। তা ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর প্রভাব নেই। সেইজন্যে আপাতত পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসী পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি তুলে লাভ নেই। ও জিনিস আবার ভেঙে পড়বে। তা হলে কি বেসিক ডেমোক্রেসীই শিরোধার্য করতে হবে? না, তাই বা কেমন করে সম্ভব? ওটা অন্তঃসারশূন্য। রাজনীতিকদের বাদ দিতে গিয়ে ওর থেকে সারবস্তুই বাদ দেওয়া হয়েছে। লেজিস্‌লেটিভ অঙ্গটা সম্পূর্ণ দুর্বল। আর জুডিসিয়াল অঙ্গটাও বিকল। ওর সর্বত্র এক্‌জিকিউটিভের জয়জয়কার। তা হলে ওকে শাসনতন্ত্র বলা হবে কেন? শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্যই হলো নিরঙ্কুশকে অঙ্কুশের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ। না, এ শাসনতন্ত্র মাথা পেতে মেনে নেওয়া যায় না।

রাজনীতিকদেরকে ঘর ঠিক করার দায় নিতে হবে। দলসংখ্যা কমাতে হবে। দলপতি সংখ্যা কমাতে হবে। লীডারশিপ নেবার মতো ব্যক্তি খুঁজে বার করতে হবে। গঠনমূলক কাজ করে জনগণের চিত্তজয় করতে হবে। পাকিস্তানের নেতারা গঠনমূলক কর্মের জন্য বিখ্যাত নন। রাজনীতির খেলা খেলতে গিয়ে মাৎ হয়েছেন। সামনে দীর্ঘ তপস্যা।

আলোকপাত

এক একটা ঘটনার মূল কোথায় জানতে হলে বিশ ত্রিশ বছর উজিয়ে যেতে হয়। নইলে যা পাওয়া যায় তা নিতান্তই একটা সাংবাদিক বা সরকারী রিপোর্ট। কী করে ঘটল তা না হয় গোচর হলো, কিন্তু কেন ঘটল তা তো বোঝা গেল না।

সম্প্রতি মালদহ, রাজশাহী প্রভৃতি জেলায় যে সব মর্মন্তুদ ঘটনা সংঘটিত হলো তার আনুপূর্বিক বিবরণ কোথাও প্রকাশিত হয়নি। সংক্ষিপ্ত সমাচার পড়েছি আর পড়ে স্তম্ভিত হয়েছি "নিউইয়র্ক টাইমসে"র সংবাদদাতা ট্রামবুলের রিপোর্ট। রাজশাহী থেকে তিনি ওট পাঠিয়েছিলেন শরণার্থীদের উক্তি শুনে। বলা বাহুল্য তিনি দোভাষীর সাহায্য নিয়েছিলেন। মালদহে এসে যাচাইও করেননি। জানিনে তিনি রাজশাহী, পাবনা প্রভৃতি জেলায় সংঘটিত ঘটনার রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন কি না। মালদহ থেকে পাঠালে হয়তো সেটা অন্যরকম হতো।

কিন্তু ততঃ কিম্! কেউ যদি ভারতের মুখে চুনকালি মাখায় তো সে চুণকালি পাকিস্থানের মুখেও লাগে। যদি পাকিস্থানের মুখে মাখায় তা হলে ভারতের মুখেও লাগে। সীমান্তের এপারে যে জাতি সীমান্তের ওপারেও সেই জাতি। বাইরের লোক চেহারা দেখে চিনতে পারে না কে ভারতীয় আর কে পাকিস্তানী। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপায়। ইংলণ্ডের পাকিস্থানীদের ব্যবহারের জন্যে জবাবদিহি করতে হয় সেখানকার ভারতীয়দের। ট্রামবুলের রিপোর্ট পড়ে আমেরিকার সাধারণ মানুষ যদি ভারতীয়দের উপর রাগ করে তো সে রাগটা পড়বে পাকিস্তানীদের ঘাড়েও। হিন্দু ও মুসলমান এত বেশি একই রকম দেখতে যে আমরাই চিনতে পারিনে, যদি পোষাক অভিন্ন হয়। আমেরিকানরা চিনবে কী করে?

নিজেদের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাত আগেও ছিল। কিন্তু তখন তার জন্যে লজ্জাবোধ ছিল। তার জন্যে দায়ী করা হতো তৃতীয় পক্ষকে। ইংরেজ সরকারকে। এখন আর সে সম্ভাবনা নেই। এখন তৃতীয় পক্ষ আসে রিপোর্ট পাঠাতে। তাতে যে পক্ষেরই বদনাম হোক না কেন আখেরে সেটা অপর পক্ষেরও বদনাম। অবিচ্ছেদ্যভাবে ভারতীয়-পাকিস্তানী জনগণেরই কলঙ্ক। রাষ্ট্র

বিচ্ছিন্ন হয়েছে বলে জনগণ তো বিচ্ছিন্ন হয়নি। হবে না। চুনকালি সকলের মুখে লাগে। হিন্দুমুসলমান নির্বিশেষে। ভারতের নাম খারাপ হলে ভারতীয় মুসলমানেরও কি নাম খারাপ হয় না? তেমনি পাকিস্তানের নাম খারাপ হলে সেখানকার হিন্দুরও?

মার্কিন সংবাদদাতা সাঁওতালদের উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য বিবরণেও সাঁওতালদের নাম পাওয়া যাচ্ছে। এপারে পালিয়ে এসেছে যারা তারা প্রধানত সাঁওতাল। তাই যদি হয়ে থাকে, এবারকার হাঙ্গামা ঠিক সাম্প্রদায়িক বা ধর্মগত নয়। ঘটনা ঘটেছে প্রথমত মালদহ-রাজশাহী সীমান্তে। এটারও একটা তাৎপর্য আছে। আমার মনে হয় আমি এমন কিছু জানি যা এর উপর আলোকপাত করবে। সেই জন্যেই লেখা।

ত্রিশ বছর আগে আমি রাজশাহী জেলার নওগাঁ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট ছিলুম। আমার মহকুমার সবচেয়ে পশ্চিমের থানা ছিল নিয়ামৎপুর। সেটা রাজশাহী জেলার উত্তর-পশ্চিমে। অবশ্য সেকালকার বিচারে। ইতিমধ্যে অনেক অদলবদল হয়েছে। মালদহের এক অংশ রাজশাহীর শামিল হয়ে গেছে। কিন্তু যখনকার কথা হচ্ছে তখন নিয়ামৎপুরের পশ্চিমে ছিল মালদহের নাচোল ও রোহনপুর থানা। মালদহের কোনো কোনো গ্রাম নিয়ামৎপুরের চৌহদ্দি ভেদ করেছিল। তখনকার দিনে রাস্তাঘাটের এমন দুর্দশা ছিল যে নওগাঁ থেকে নিয়ামৎপুরের অধিকাংশ জায়গায় যেতে হলে শীতকালের অপেক্ষায় বসে থাকতে হতো। তার পরে যাওয়া যেত হাতীর পিঠে বা পায়ে হেঁটে। হঠাৎ দরকার পড়লে যেতে হতো রেলপথে রাজশাহী ও নাচোল ঘুরে। বাকীটা গোরুর গাড়ি করে বা পায়ে হেঁটে।

এমন দুর্গম যে থানা সেখানে কে-ই বা সাধ করে যায়? মহকুমা হাকিমরা বছরে একদিন গিয়ে বন্দুকের লাইসেন্স দেখে আসতেন। কেউ কেউ নিজের অসুবিধে বাঁচাতে গিয়ে বন্দুকধারীদের বলতেন মান্দা থানায় হাজিরা দিতে। শুনলুম বিশ বছর কোনো মহকুমা হাকিম নিয়ামৎপুর থানায় সফর করেননি। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা তো আরো দূরে থাকতেন। তাঁদের আরো কষ্ট হতো সেই পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে ক্যাম্প করতে। অথচ প্রত্নতত্ত্বের দিক থেকে অমন রত্নভাণ্ডার আর নেই। হাজার বছরের পুরনো আমলের ইট দেখে মালুম হয় শহর ছিল, রাস্তা ছিল। অসংখ্য মূর্তি দেখে অনুমান হয় মন্দির ছিল। ভাঙা মসজিদের গাঁথনিও বোধ হয় গৌড়ীয় সুলতানী আমলের। মানুষের বসতি

বিরল। জঙ্গল চার দিকে। উঁচু নিচু মাটি। মাঝে মাঝে গভীর খাদ। এক কথায় ভদ্রলোকের বাসযোগ্য নয়। ডাকঘর একটি কি দুটি। টেলিগ্রাফ অফিস একটিও নেই। রেলস্টেশন অনেক দূরে। হাটবাজার দুর্লভ। ডাক্তার বদ্দি দুষ্প্রাপ্য। থানায় বদলি হওয়া একরকম শাস্তি। বন্দুক দেখতে গিয়ে নিয়ামৎপুর আবিষ্কার করে আমি মুগ্ধ হয়ে যাই। ফিরে এসে তারপরে একদিন খবর পাই সাঁওতালেরা ক্ষেপেছে। খবরটা রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কানেও পৌঁছয়। ততদিনে মহাত্মা গান্ধী রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স থেকে ফিরেছেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন নতুন করে শুরু হয়ে গেছে। এবার সরকারপক্ষ ঘোরতর প্রস্তুত। নতুন আন্দোলন দমন করার জন্যে দারুণ অর্ডিনান্স জারি হয়েছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে কল্পনাতীত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা তিনি খাটাবেন যে, তেমন বিক্ষোভ কোথায়! কী জানি কেন আন্দোলনটা ভিজে দেশলাই কাঠির মতো ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে নিবে গেল। ভালো করে জ্বললই না। ইংরেজরাও অপ্রস্তুত হলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন ভীষণ ব্যাপার হবে।

সাঁওতালরা ক্ষেপেছে শুনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ধরে নিলেন এটা নিশ্চয় আইন অমান্যকারীদের চাল। নিজেরা তো যুদ্ধে নামলেন না, সাঁওতালদের ঠেলছেন। তিনি চাইলেন সরেজমিনে গিয়ে সাঁওতালদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। আমারও তাই ইচ্ছা। দু'জনে মিলে একটা জয়েন্ট টুর ফেলা গেল। তিনি গেলেন রাজশাহী সদর থেকে। আমি গেলুম নওগাঁ সদর থেকে। আমরা একত্র হলুম মান্দা থানায়। সেখান থেকে নিয়ামৎপুর থানায় যেতে হলে পথে পড়ে হরিপুরের খাড়ি। মাইল দেড়েক রাস্তা জলে ডুবে রয়েছে। সেই জানুয়ারী কি ফেব্রুয়ারী মাসেও। অথচ জল এত গভীর নয় যে নৌকা চলবে। হাতীর পিঠেই খাড়ি পাড়ি দেওয়া গেল। তারপর তিনি হাতীর পিঠ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করে দিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অ্যাসিস্টাণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট। দুজনেই ইংরেজ। আমি তাঁদের সঙ্গে হাঁটতে গিয়ে তাল রাখতে পারিনে।

অবশেষে একজায়গায় সাঁওতালদের সঙ্গে ভেট। খবর পেয়ে তারাও এসেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল মধ্যবয়সী একটি সাঁওতাল মেয়ে। বিধবা বলেই মনে হলো। পুরুষেরা তেমন বুঝিয়ে বলতে পারে না, বাংলা তাদের ভালো করে জানা নেই। মেয়েটিই বার বার তাদের মুখের থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বলে। এমন হাত পা নেড়ে এমন উচ্চ স্বরে এমন উত্তেজনাভরে যে, ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেবের বিশ্বাস, সে তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছে। বাংলা তিনি বেশ ভালো বলতেন ও বুঝতেন, কিন্তু কেমন করে তাঁর ধারণা জন্মায় যে সাঁওতালদের কেসটা কাঁচা। যত দোষ ঐ মেয়েটার। "অমন একটি নারী যদি প্রেরণা যোগায়," তিনি পরে আমাকে বললেন, "যদি রক্তে আগুন ধরিয়ে দেয় তবে এমন অপরাধ নেই যা পুরুষমানুষে না করবে।"

সাঁওতালদের বক্তব্যটা সংক্ষেপে এইরকম। নিয়ামৎপুর অঞ্চল তো জঙ্গল হয়ে পড়ে রয়েছিল। জঙ্গল কেটে সাফ করল কারা? বুনোজানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করল কারা? জরজারিতে সাপের কামড়ে মরল কারা? জমিতে প্রথম হাল দিল কারা? আবাদ করল কারা? এই সাঁওতালদের পূর্বপুরুষরাই। দু'তিন পুরুষ ধরে তারা এখানকার জমিকে চাষের যোগ্য করে এসেছে। কিন্তু জোতদার শ্রেণীর লোকেরা তাদের ছলে বলে কৌশলে বেদখল করেছে। সাঁওতালরা খাজনা দিয়ে প্রজা হতেও রাজী। কিন্তু খাজনা ওরা চায় না। প্রজা ওরা চায় না। ওরা খাটিয়ে নেয়, ফসল গোলায় তোলে, ফসলের একটা ভাগ দিয়ে ভাগিয়ে দেয়। জমিদারের কাছে গেলে জমিদার চড়া সেলামী হাঁকে। সাঁওতালরা কোথায় অত টাকা পাবে! মুসলমানরা দেয়। তারাই জমি দখল করে নেয়।

জোতদার পক্ষের লোকও হাজির ছিল। তারা সাঁওতালদের দাবী স্বীকার করে না। তাদের দিকেই আইন আদালত সেটেলমেণ্টের জরীপ কাগজপত্র দেখায়। কাগজপত্রে সাঁওতালদের অস্তিত্ব নেই। থাকবে কী করে? ওরা আইন আদালতের ধার ধারে না। সেটেলমেণ্ট যে কী জন্তু তাও তারা জানে না। কোথায় যেতে হয়, কাকে কী দিতে হয়, এসব তো শেখেনি, শেখেনি তদ্বির তদারক করতেও। মুশকিলে পড়লে তীর ধনুক নিয়ে মার মূর্তি ধরেছে। শেষে পুলিশের ভয়ে পালিয়েছে।

সব দেখে শুনে আমার প্রত্যয় হলো যে, অভিযোগের যথেষ্ট কারণ আছে। অপর পক্ষে জোতদারও তো মোটা সেলামী দিয়েছে। এসব জটিল ব্যাপার আপোসে মেটাতে হয়। মেটাতে অনেক দিন লাগে। আমার সাহায্য চাইলে আমি তাতে রাজী। আপাতত কিছুই করবার নেই। দু'পক্ষকে বললুম শান্তি রক্ষা করতে। তারপর স্বস্থানে ফিরে গেলুম।

পরে একদিন শুনে অবাক হলুম যে, সেই সাঁওতাল মেয়েটিকে জেলা থেকে বহিষ্কারের আদেশ দিয়েছেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। দিয়েছেন অর্ডিনান্স অনুসারে।

যে অর্ডিনান্স জারি হয়েছে আইন অমান্য আন্দোলন দমন করতে। কেউ হয়তো তাঁর কানে মন্ত্র দিয়েছে যে, সাঁওতালেরা কংগ্রেসওয়ালাদের কথায় নাচছে। কিন্তু সাঁওতালদের সেই রণরঙ্গিণীকে কংগ্রেসের সঙ্গে জড়ানো সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য। সম্ভবত তিনি ভেবেছেন ও মেয়ে ফরাসীদের জোন অফ আর্ক আর তিনি ইংলণ্ডের রাজা। সাঁওতাল বিক্ষোভ সত্যি থেমে গেল।

এর পরে যা লিখছি সেটা খুব সম্ভব পাঁচ বছর পরের কথা। যখন আমি রাজশাহীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে আবার সে জেলায় যাই। একদিন এক রোমান ক্যাথলিক পাদ্রী আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। খুব অস্পষ্ট মনে পড়ছে তাঁর মুখ, তাঁর কথা। আন্দাজে লিখছি। তিনি সাঁওতালদের নিয়ে কাজ করতেন। নিয়ামৎপুরেও তাঁর যাতায়াত। সাঁওতালদের অভিযোগ তখনো মেটেনি।

তার পর কেটে গেছে পঁচিশ বছর। দেশ কেটে দু'খানা হয়েছে। জানিনে সেই সাঁওতালদের অভিযোগ এতদিনে মিটেছে কি না। যদি না মিটে থাকে তবে তার থেকে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়া বিচিত্র নয়।

বিনোবাজী : পুর্ব পাকিস্তানে

বিনোবাজীর পুর্ব পাকিস্তান পদযাত্রা কাল শুরু হয়ে গেছে। রংপুর ও দিনাজপুর জেলার ভিতর দিয়ে তিনি যাবেন। মাত্র দুই সপ্তাহের প্রোগ্রাম। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য ঘটনা, তবু অসামান্য। গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রার পর এর মতো মহৎ ঘটনা আর ঘটেনি। মাঝখানে কেটে গেছে ষোলটি বছর। ষোলটি বছর না এক-আধ শতাব্দী ?

রংপুরে আমার এক ডাক্তার বন্ধু বাস করতেন। প্রত্যেক বছর বারুণী তিথিতে তিনি আমাকে স্মরণ করতেন ও চিঠি লিখতেন। সেই তিথিতে আমার জন্ম। বছর কয়েক হলো আর চিঠি আসছে না। তিনি ইহলোকে নেই। কিন্তু যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন রংপুর ছাড়েননি। সেখানকার মুসলমানরা তাঁকে ছাড়বে না। তিনিও তাদের ছাড়বেন না। তিনি জীবিত থাকলে কত সুখী হতেন বিনোবাজীকে দেখে। আর বিনোবাজীও কি সুখী হতেন না তাঁকে দেখে !

শুধু জ্ঞানদানন্দ দাশগুপ্ত নন, তাঁর মতো আরো অনেকের নাম জানি যাঁরা পুর্ব পাকিস্তান ছাড়েননি। যদিও অতি সহজেই পারতেন। তাঁরা থেকে গেছেন মাটির টানে, মানুষের টানে। তাঁরা কোন দিন হিন্দু মুসলমানের বিরোধকে ধ্রুবসত্য মনে করেন নি। ধ্রুবসত্য হচ্ছে হিন্দু মুসলমানের মিলন। কোথায় ছিল আরব, কোথায় ছিল ইরানী, কোথায় ছিল তাতার আর তুর্ক, হাবসী আর পাঠান, মঙ্গোল তথা মুঘল ! আর কোথায় ছিল আর্য, দ্রাবিড় ইত্যাদি বহু জাতির সংমিশ্রণে গঠিত হিন্দু ! ইতিহাস এদের এমন বেমালুম মিলিয়েছে যে, বিদেশী পোশাক পরলে ও দাড়ি গোঁপ ছাঁটলে কে যে হিন্দু আর কে যে মুসলমান তা চেনা যায় না।

আমার এক বহুদর্শী পাঞ্জাবী মুসলমান বন্ধু বলতেন প্রত্যেক প্রদেশেই সেখানকার হিন্দু আর সেখানকার মুসলমান একই রকম দেখতে শুনতে। ধর্মগত বৈষম্যটা মর্মগত বা চর্মগত নয়। পাঠানরাও মুসলমান, পাঞ্জাবী মুসলমানরাও মুসলমান। তবু মুসলমানে মুসলমানে বিয়ে সাদী নেই। কিছুদিন আগে মুর্শিদাবাদ জেলার এক মুসলমান লেখক আমার সঙ্গে দেখা করে তাঁর উপন্যাসখানির পাণ্ডুলিপি পড়তে দেন। বাঙালী মুসলমান বিহারে গেলে বিহারী

মুসলমান বনে যান। লেখক এই নিয়ে পরিহাস করেছেন। এক জায়গায় লিখেছেন বাংলা ভুলে গেলে কী হবে, কাঁদেন যখন তখন বাংলাতেই কাঁদেন। একবার লেখক বিহারে এক উকিলের বাড়ী অতিথি হন। উকিলটি বিহারে থেকে বাংলা ভুলে গেছেন। উর্দুতেই কথাবার্তা বলতে হয়। কিন্তু হঠাৎ অন্তঃপুর থেকে কান্নার রোল শোনা যায়। উকিলও কেঁদে ওঠেন। কোন্ ভাষায়, জানেন? বাংলাতে।

পাকিস্তানী পলেস্তরাসত্ত্বেও বাঙালী মুসলমান বাঙালীই রয়ে গেছে। তার পোশাকী ভাষা হয়তো উর্দু। কিন্তু কান্নার ভাষা তো বাংলা। বিপদে আপদে শোকে দুঃখে বাঙালী মুসলমানদের কান্না কার বুকে বাজবে? কার অন্তর স্পর্শ করবে? সিন্ধির নয়, পাঞ্জাবীর নয়, পাঠানের নয়। যাকে ব্যাকুল করবে সে বাঙালী হিন্দু। ইতিহাস তো পনেরো বিশ বছরে শেষ হয়ে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে। কান্নার রোল কি কোনো দিন উঠবে না? যদি কোনো দিন ওঠে সেদিন বাঙালী মুসলমান বাংলাতেই কাঁদবে আর সে কান্না করাচীতে পৌঁছনোর আগে কলকাতায় পৌঁছবে। আরো আগে পৌঁছবে ঢাকাতে রাজসাহীতে চাটগাঁয় বরিশালে খুলনায় যেখানে এখনো কিছু কিছু বাঙালী রয়ে গেছে।

সত্যিকারের বন্ধু তারাই যারা রাজনীতির সুদিনের বন্ধু নয়। যারা সাধারণ জীবনযাত্রার দুর্দিনের বন্ধু। সে রকম বন্ধু ধর্মের দ্বারা চিহ্নিত নয়। দাশগুপ্ত একজন ডাক্তার। আরো বড় কথা দাশগুপ্ত একজন হৃদয়বান প্রতিবেশী। একই কথা বলা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের সম্বন্ধে। বিপদে আপদে তাদের কাছে সাহায্য পেয়েছি। ধর্ম নিয়ে তাদের ব্যবহারে তারতম্য হয়নি। আমার জন্মস্থান ওড়িশায়। আমাদের বাড়ীর পিছনের বাগানের বেড়ার ওপারেই মুসলমান। জন্মে অবধি তাদের দেখে এসেছি। আপদে বিপদে আমরাই তাদের বন্ধু, তারাই আমাদের। দুই বাড়ীর দুই কর্তাকে দেখেছি ধর্মালাপ করতে। যদিও একজন ঘোর বৈষ্ণব ও অপর জন ঘোর মুসলমান। কাফের বা যবন কথাটা কখনো মাথায় আসেনি। আমার ছেলেবেলার সব চেয়ে পুরোনো ফোটোগ্রাফ তোলা হয় যাঁর কোলে তিনি মুসলমান শিক্ষক। কাকাদের একজন বলেই তাঁকে জানতুম। তখনো হিন্দু মুসলমান ভেদজ্ঞান জন্মায়নি।

ভেদ তা বলে মায়া নয়। ভেদ একটা ছিলই। কিন্তু মানুষ বরাবর চেষ্টা করেছিল তার উর্ধ্বে উঠতে। মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের যুদ্ধ হচ্ছে।

মুসলমান নবাব তাঁর ছেলেকে রেখে যাচ্ছেন যাঁর আশ্রমে তিনি তাঁর বন্ধু হিন্দু মোহন্ত। হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর যুদ্ধেও হিন্দুর ভরসা মুসলমান মাহুত বা অশ্বারোহী। আমাদের সাত শ' বছরের ইতিহাসে কত হিন্দু রাজা মসজিদ গড়িয়ে দিয়েছেন। কত মুসলমান শাসক মন্দির গড়তে সাহায্য করেছেন। বাংলা রামায়ণ মহাভারত রচনা কাদের উৎসাহে হয়েছে? মালিক মুহম্মদ জ্যায়সী ও আমীর খসরু না হলে হিন্দী সাহিত্যের কী হতো?

ভেদের ঊর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা অনেকেই করেছেন, কিন্তু সকলে করেননি। আমাদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভেদনীতির উদাহরণও রয়েছে। একজন সুলতান কি বাদশাহ অভেদনীতি অনুসরণ করে হিন্দু মুসলমান সবাইকে সমান চোখে দেখলেন। তাঁর পরে একজন এলেন, তিনি ভুলে গেলেন যে তিনি রাজা, তিনি মনে রাখলেন যে তিনি মুসলমান। ভেদনীতির পরিণাম ফলতে সময় লাগে, তিনি হয়তো সে পরিণামের সাক্ষী হলেন না, কিন্তু পরবর্তীরা ভুগলেন। তার পরে আবার দেখা গেল একজন সুলতানকে বা সম্রাটকে অভেদনীতি অনুসরণ করতে। হিন্দু মুসলমানে সমদর্শী হতে। আমাদের ইতিহাস কেবল একটিমাত্র ইতিবৃত্ত নয়। মুসলমান বলতে কেবল ভেদনীতিপ্রবণ মুসলমান বোঝায় না। আমার সহকর্মীদের মধ্যে আমি বহু মুসলমানকে জানি যাঁরা অভেদনীতিতে বিশ্বাসী। আর এমন হিন্দুকেও দেখেছি যিনি হাড়ে হাড়ে ভেদনীতিপরায়ণ। এক হাতে তালি বাজে না। এঁরা সেই দ্বিতীয় হাত।

রাজাকে মনে রাখতে হবে যে তিনি রাজা, তিনি হিন্দু কি মুসলমান সেটা পরের কথা। পরের কথাটা আগের কথা হলে সর্বনাশ। রাজপুরুষদের অনেকেরই সেটা মনে থাকে না। কেবল পাকিস্তানে নয়, ভারতেও। সেকুলার স্টেট যখন বলি তখন এই কথাটাই বলতে চাই যে, সবার উপরে মানুষ সত্য। কার্যকালে অসত্য আচরণও কি লক্ষ করিনে? দৃষ্টান্তটা ভারতের দিক থেকে যদি আসে পাকিস্তানও একদিন সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। পাকিস্তানের যাঁরা রাজা ও রাজপুরুষ শ্রেণীর লোক তাঁরাও মনে রাখবেন যে, তাঁরা রাজা। রাজার চোখে সব প্রজাই সমান। এ যদি না হয় তবে পাকিস্তানের ইতিহাসে পরে একদল আসবেন যাঁরা অভেদনীতিতে বিশ্বাসী। তাঁদেরও দিন আসবে। সেই শুভ দিনটির জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে পাকিস্থানের হিন্দুদের ও প্রগতিশীল মুসলমানদের।

বিনোবাজীর মিশন রাজরাজড়াদের দরবারে নয়। প্রজা বা নাগরিকদের মেলায়। যেখানেই তিনি গেছেন সেখানেই তিনি শান্তির বাণী, সাম্যের বাণী,

অভয়ের বাণী শুনিয়েছেন। এবারেও তাই শোনাবেন। এর ফলে হয়তো দু' পাঁচজন মুসলমানের মনে হবে যে, তারা আগে নাগরিক, পরে মুসলমান, বা আগে মানুষ, পরে হিন্দু। সব সময় নিজেকে হিন্দু ভাবাটা অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। সব সময় নিজেকে মুসলমান ভাবাটাও স্বাস্থ্যকর নয়। অস্বাস্থ্যের ব্যাপারীরা এতে আতঙ্কিত হবেন। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের কতক লোক বিনোবার বিরুদ্ধে চিৎকার জুড়ে দিয়েছেন। এদিকেও সেরকম লোক আছেন। হিন্দুদের মধ্যে। কিন্তু তার দরুন বিনোবার পদযাত্রা একদিনও থামবে না। তিনি হাওয়ায় বুনে যাবেন বীজ। ফল ধরবে কবে ও কেমন করে তার মালিক আরেক জন।

সভ্যতার সঙ্কট : ঘরে

লেখা চেয়েছেন। কিন্তু কী লিখব? এই শুধু জানি যে আমাকে আমার নিজের সাধনায় অতন্দ্র হতে হবে। আজকের দুর্যোগে হয়তো এর কোনো ইউটিলিটি নেই। কিন্তু অসভ্যতার দিনে অন্তত কয়েক জনকে করে যেতে হবে সভ্যতার ফুল ফোটানোর কাজ। বিউটি নিয়ে থাকাটাই তাদের ডিউটি।

এ কথা বলার পর যা বলতে ইচ্ছা করছে তা বলি। আজকের দিনে কোনো দেশেই কেউ নিরাপদ নয়। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা যে নিরাপদ নয় তা তো প্রত্যক্ষ সত্য। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরাই কি নিরাপদ? গুণ্ডার হাতে ধনপ্রাণ হারানোটাই কি একমাত্র বিপদ? যদি দেখেন বাজার বসছে না, বাজারে চাল পাওয়া যাচ্ছে না, শিশুর জন্যে দুধ নেই, ব্যাঙ্ক খুলছে না, টাকা নেই, আপিস খুলছে না, মাইনে নেই, ডাক্তার ডাকা দরকার, ট্রাম বাস টেলিফোন নেই, এমন কি ডাকঘর পর্যন্ত কাজ করছে না, কলে জল আসছে না, ড্রেনে মল নিকাশ হচ্ছে না, মহামারীর বিশেষ দেরি নেই তা হলে সেটাও কি বিপদ নয়?

তার পর চীনের মনে কী আছে তা চীনের মিতে রাশিয়াও জানে না। ভারত জানবে কী করে! চীন যদি হিমালয় দিয়ে নেমে আসে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিরাট এক জনপ্রবাহ যাত্রা করবে উৎকলে ও মধ্যপ্রদেশে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা এলে তাদের নিরাপত্তা বিধান করবে কে? সৈন্যদলের কাজ কি শত্রুর হাত থেকে দেশরক্ষা না আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষা? এর মধ্যে গৌরবের কী আছে যে, কলকাতাকে প্রকৃতিস্থ করার জন্যে মিলিটারিকে ডাক দিতে হলো? একজন মহাত্মা যা করেছিলেন।

তার পর পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা কোথায়? যদি বাধে তা হলে যুদ্ধের ফুটবল কখনো গড়িয়ে যাবে ওদিকে, কখনো গড়িয়ে আসবে এদিকে। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরই অদ্যভক্ষ অবস্থা হবে। বাড়ীতে বাড়ীতে স্বদেশের সৈনিক এসে বসবে। সে যদি সাময়িকভাবে হটে যায় বিদেশের সৈনিক এসে বসবে। কে কাকে বলবে, পশ্চিমবঙ্গে চলে এসো, তাহলেই তুমি নিরাপদ?

ওপারের প্রতিশোধ এপারে নেওয়া যায় না। যাদের উপর নেওয়া যাবে তারা গুণ্ডা নয়। তারা সম্পূর্ণ নিরপরাধ। রহিম খুন করছে বলে করিমের

ফাঁসী হবে এটা রামরাজ্যের বিচার নয়। রহিম আর করিম দু'জনের ধর্ম এক বলে যদি রহিমের বদলে করিমকে সাজা দিতে হয় তবে উদোর অপরাধের জন্যে বুদোর শাস্তিটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে। বামুন মেরেছে নমঃশূদ্রকে, সুতরাং যে কোনো নমঃশূদ্র মারবে যে কোনো বামুনকে। অসমীয়া মেরেছে বাঙালীকে অতএব যে কোনো বাঙালী মারবে যে কোনো অসমীয়াকে। বলা বাহুল্য মারটা যখন দেওয়া হয় তখন আত্মরক্ষার সুযোগটুকুও দেওয়া হয় না। আদালতে খুনের আসামীরও আত্মরক্ষার সুযোগ থাকে, কিন্তু জনপথে গরিব ফেরিওয়ালার সে সুযোগ নেই। যে রাজ্যে এ জিনিস চলে সে রাজ্যে আইন কানুন টিকতে পারে না। দেশ অরাজক হয়।

আমরা ডেমোক্রটিক সোশ্যালিজম গড়তে যাচ্ছি। কিন্তু বনিয়াদটাই কাঁচা। সমাজতন্ত্র হবে যে, সমাজ কোথায়। সমাজ বলতে বোঝায় শৃঙ্খলা। যেখানে শৃঙ্খলার অভাব সেখানে সমাজেরই অভাব। মানুষ তো বেশীদিন ও ভাবে বাঁচতে পারে না, তাই মিলিটারিকে ডাকে, ডিকটেটরকে মসনদে বসায়। আমরা যদি আরো বর্বর হই ডিকটেটরশিপ আছে আমাদের বরাতে। পাকিস্তানে তো অনেক আগেই ও জিনিস হয়েছে। এখনো তার জের চলেছে গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে। ওদের ওটা সত্যিকার গণতন্ত্রই নয়।

অন্যান্য বারের মতো এবারেও শুনছি, লোকবিনিময় করা হোক। তার মানে দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নেওয়া হোক। কার হার হলো তাতে? কার জিৎ হলো? এরূপ পরাজিত মনোভাব যাদের তারা স্বাধীনতা রক্ষা করবে কী করে? তৃতীয় পক্ষ এসে আবার দেড় শ' বছর রাজত্ব করবে। আর দ্বিজাতিতত্ত্বই যদি মেনে নিলে তবে কাশ্মীর রাখতে চাও কেন? কাশ্মীর ছেড়ে দিলেই তো সব গোলমাল থেমে যায়।

আমরা সবাই জানি যে হিন্দু হিসাবে কাশ্মীরের উপরে আমাদের দাবী নেই, দাবী আমাদের ভারতীয় হিসাবে। আর ভারতীয় বলতে বোঝায় আবহমানকাল থেকে যারা ভারতে বাস করছে। মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেছে বলে তারা তাদের ভারতীয়ত্ব ত্যাগ করেনি। তাদের কতক যদি নিজেদের ভিন্ন জাতি ভাবে তবে সেই অবোধদের জন্যে সুবোধদের পাকিস্তানে পাঠানো যায় না বা তাদের জন্মভূমি কাশ্মীরকে পাকিস্তানের পাতে তুলে দেওয়া যায় না। কাশ্মীর রাখতেই হবে। মুসলমানকেও রাখতেই হবে। নইলে আমরা ভারতীয় নামের অযোগ্য হব।

প্রতিকার কী ? প্রতিকার আর যাই হোক ভারতীয় মুসলমানদের উপর প্রতিশোধ নয়। কিংবা ভারতমাতাকে তাঁর মুসলমান সন্তানদের থেকে বঞ্চিত করা নয়। পাকিস্তান সেদিন হয়েছে, কতদিন টিকবে বলা যায় না। সাময়িক একটা উৎপাতের হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় চিরকালের প্রতিবেশীকে পর করে দেওয়া যায় না। পাকিস্তানও আমাদেরি দেশ। সে যদি স্বেচ্ছায় পর হয়ে থাকে আমরা তার জন্যে দ্বার খোলা রাখব। আমরা যখন বলি সেকুলার স্টেট তখন আমরা এই কথাই বোঝাতে চাই যে আমাদের দরজা খোলা। পাকিস্তান, তুমি যদি কোনো দিন ফিরে আসতে ইচ্ছা কর তা হলে দেখবে ভারতীয় ইউনিয়নে তোমারও স্থান আছে। শুধু কাশ্মীরের নয়। তোমাকে আমরা সাধতে যাব না, কিন্তু তোমার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেব না।

ভারতবর্ষ বার বার খণ্ডিত হয়েছে। কিন্তু লোকবিনিময় কখনো হয়নি। লোকবিনিময় হলে সেই খণ্ডন চূড়ান্ত। আর তাকে জোড়া দেওয়া যায় না। কতক ধর্মান্ধ মুসলমান ভুল করে পৃথক রাষ্ট্র পত্তন করেছে বলে আমরাও ভুল করে সেই রাষ্ট্রকে আফগানিস্থান বা ইরানের মতো সর্বতোভাবে মুসলিম হতে দেব না। এখনো সেখানে এক কোটির মতো হিন্দু রয়েছে। সেইজন্যে তার চারিত্র্য আফগানিস্থান বা ইরানের মতো অমিশ্র নয়! ভারতের মতো বিমিশ্র। সংস্কৃতি কি ধর্মের চেয়ে কম সত্য ? ভাষা কি ধর্মের চেয়ে কম সত্য ? একদিন এসব সত্যও কথা কইবে। ধর্ম একাই এতদিন কথা কয়ে এসেছে। অন্যেরা সুযোগ পায়নি। তারাও সুযোগ পাবে। পেতে আরম্ভ করেছে। বাংলাভাষার জন্যে বাঙালী মুসলমান জান দিয়েছে। বাংলা এখন পাকিস্তানের দুটি রাষ্ট্রভাষার একটি। উর্দুর সঙ্গে তার সমান মর্যাদা। ডাকটিকিটে বাংলা দেখতে চান তো পাকিস্তানের ডাকটিকিট দেখুন। ভারতে আমাদের ভাষা এখনো ন্যাশনাল হতে পারল না, রয়ে গেল আঞ্চলিক।

অর্থ কি ধর্মের চেয়ে কম সত্য! অর্থনীতিও একদিন কথা কইবে। পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্থানের সঙ্গে বাণিজ্য করে লাভবান হবে না, হবে ভারতের সঙ্গে বর্মার সঙ্গে বাণিজ্য করে। সেই সূত্রে কাছে আসবে। কমন মার্কেট করবে। পশ্চিম পাকিস্তান বাধা দিতে গেলে বাধা মানবে না। তার পর ভূগোলও একদিন কথা কইবে। ভূগোলের সঙ্গে চতুরী খাটে না। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের দেড় হাজার মাইল ব্যবধান। প্রধানত এই কারণেই বেশীদিন এক

রাষ্ট্রের শরিক হওয়া চলবে না। পৃথক হতেই হবে। মানুষের ইতিহাসে ষোল সতেরো বছর কিছুই নয়। আমরা ধৈর্য ধরব। প্রতিকার কি আজ এখনি না হলে নয়?

পাণ্ডববর্জিত দেশ

ভাবছি বইকি। না ভেবে উপায় আছে? হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রপাত। বাংলাদেশের দুই প্রান্তে সাম্প্রদায়িক প্রাণহানি। লুটতরাজ। গৃহদাহ। লক্ষ লক্ষ টাকার বই ও লক্ষ লক্ষ মণ ধান অগ্নিসাৎ। সেই সঙ্গে সংস্কৃতি ও সভ্যতা ধূলিসাৎ। যথারীতি লোকবিনিময়ের উদ্যোগ। পূর্ববঙ্গ ত্যাগের জন্যে আকুলিবিকুলি। জনস্রোত।

কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ, কিন্তু কাশ্মীরের মাটিতে হচ্ছে না। হচ্ছে বাংলাদেশের শহরে শহরে গ্রামে গ্রামে, বন্দরে বন্দরে। অন্তরে অন্তরে। এর ফলে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান কতটুকু নিকটতর হলো জানিনে, কিন্তু বাঙালী হিন্দু-মুসলমানের জীবন আরো দুর্বহ হলো। জাতি হিসাবে আমরা আরো দুর্বল, আরো দীনহীন, আরো পরনির্ভর হলুম। যা নিয়ে আমাদের গর্ব—সাহিত্য ও শিল্প—তার আধারটাই আমরা নিজেরাই ধ্বংস করে দিলুম।

সরকার যথাসাধ্য ক্ষতিপূরণ করবেন। কিন্তু কিসের ক্ষতিপূররণ? এমন ক্ষতি আছে যার পূরণ নেই। হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে বিশ্বাস করে একরাষ্ট্রে থাকতে পারবে কি? তার জন্যে লাগবে শুধু পুলিশের লাঠি নয়, মিলিটারির সঙীন। এক পাড়ায় বাস করার সাহস ক'জনের হবে! এ যেন নদীর তীরে বাস ভাবনা বারো মাস। বিশ্বাস বা আস্থা হচ্ছে অত্যন্ত ভঙ্গুর একটি পাত্র। ফুটো হলে বা ফেটে গেলে সহজে জোড়া লাগে না।

মানুষের হৃদয়ও তেমনি ভঙ্গুর। কেমন করে মানুষ ভালোবাসবে মানুষকে, যদি সে পরকে আপন ভেবে আপনার লোককে পর করে দেয়? সাত শ' বছর যে তোমার সুখদুঃখের সাথী, হয়তো আরো সাত শ' বছর সাথী হতে পারত, তাকেই তুমি পর করে দিলে রাওলপিণ্ডির বা করাচীর ইঙ্গিতে। তোমার দুর্দিন কি কোনোদিন আসবে না? সেদিন কে তোমার প্রকৃত বন্ধু হবে? বাঙালী হিন্দু না পশ্চিমা মুসলমান?

তেমনি বাঙালী হিন্দুরও প্রকৃত বন্ধু বাঙালী মুসলমান। কী করে আমি এদের বোঝাব যে ইতিহাস ষোল-সতেরো বছরে শেষ হয়ে যায় না। শতাব্দীর পর শতাব্দী রয়েছে সামনে। হিন্দুও থাকবে. মুসলমানও থাকবে। একটাই জাতি, একই নিয়তি। সাময়িকভাবে বিচ্ছেদ ঘটতে পারে, তার পরিণাম

হাড়ে হাড়ে অনুভব করে বিচ্ছেদেও একদিন অনিচ্ছা আসবে। বই পড়ে শেখে ক'জন! অধিকাংশ লোক শেখে হাতে-কলমে। আগুনে হাত দিয়েই শেখে যে আগুনে হাত দিতে নেই।

অন্তত কয়েকজন থাকবেন যাঁরা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের হিন্দু ও মুসলমানের প্রকৃত শুভাকাঙ্ক্ষী। তাঁরা হাজার আঘাত পেলেও ভবিষ্যতের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন না। বর্তমান থেকেই ভবিষ্যতের উদ্ভব। সুতরাং বর্তমানের উপরেও এক চোখ রাখতে হবে বইকি। তা বলে তারা একচোখো হবেন না। রাজনীতিকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি বর্তমানের প্রতি মনোযোগী হয়েও ভবিষ্যতের ধ্যান নিমগ্ন। তেমনি সাংবাদিকদের মধ্যে তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি বর্তমানের প্রতি সতর্ক, অথচ ভবিষ্যতের স্বপ্নে বিভোর। সাহিত্যিকদেরও তেমনি বর্তমান আর ভবিষ্যৎ দুই দিকে নজর রাখতে হবে।

এ কখনো সত্য পারে না যে পূর্ববঙ্গের সকলেই উন্মত্ত বা সকলেই হিন্দুদ্বেষী। এই তো কয়েকজন প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করে গেলেন যে তাঁরাই পূর্ববঙ্গের হৃদয়। সে হৃদয় হিন্দুকেও ভালোবাসে, হিন্দুকেও বাঁচাতে চায়। বিজ্ঞাপনটা কিন্তু পাষণ্ডরাই একচেটে করল। পশ্চিমবঙ্গেও তাই। আমি বন্দনা করি পূর্ব ও পশ্চিমের দরাজ হৃদয়কে। বন্দনা করি আমীর হোসেন চৌধুরীকে, মিশ্রীলালকে, আরো কয়েকজন অনামা শহীদকে। আমি বন্দনা করি সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয়কে। উৎপল দত্তকে। তাঁদেরি মতো মানবপ্রেমিকদের।

এ যদি সত্য হয়ে থাকে যে বাংলাদেশ এক ও অবিভাজ্য তাহলে একদিন না একদিন সেই সত্যের জয় হবে। আমরা হয়তো দেখে যেতে পারব না সে দৃশ্য। তবু তার ধ্যান করব। সেই যে আমাদের চিরকালের বাংলাদেশ তাতে হিন্দুও থাকবে, মুসলমানও থাকবে, খ্রীস্টান বৌদ্ধরাও বাদ যাবে না। তাই যদি হয় তবে আজকের এই ছিন্নমস্তা দেবীকে আপনার রক্ত আপনি পান করতে দেখে উদ্‌ভ্রান্ত হব না। এটা সত্যরূপ নয়।

তবে এটাও ঠিক যে দেশটা ক্রমে পাণ্ডববর্জিত হয়ে উঠছে। যেমন পূর্ববঙ্গ তেমনি পশ্চিমবঙ্গ। বাঙালীকেই বাঙালীর হাত ধরে তুলতে হবে। মুসলমানকে হিন্দুর হাত। হিন্দুকে মুসলমানের হাত। এপারের সাহিত্যিকরা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সেটি এই ধরনের কাজ। তেমনি ওপারের সম্পাদকরা যে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন সেটিও। দুই প্রান্তের লেখকদের দিয়ে কি মিলিতভাবে কিছু করা যায় না? নিশ্চয়ই করা যায়, কিন্তু করতে গেলে পূর্ব পাকিস্তান

সরকার বাধা দেবেন। এক সঙ্গে মিলে মিশে কিছু করা তাঁদের মূলনীতিবিরুদ্ধ। অমন করলে দুই 'জাতি' এক হয়ে যাবে। এদিকেও বাধা পাওয়া যাবে সরকারের কাছ থেকে নয়। বিক্ষুব্ধ জনমতের কাছ থেকে। পূর্ব পাকিস্তান যে অন্যায় করেছে তার বেলা কী হবে?

এই পরিস্থিতি যদি বেশীদিন গড়ায় তাহলে এদিকে অন্যায়বোধ তীব্রতর হবে। আর ওদিকে যারা অসহায় বোধ করছে তাদের অসহায়তাবোধ হবে গভীরতর। আমরা লেখকরা এর কী করতে পারি? আমরা এমন কোনো মন্ত্র জানিনে যা দিয়ে অন্যায়ের হাতে হাতে প্রতিকার হয়। আর অসহায় অসহায়াদের উদ্ধার হয়। আমাদের হাতে যা আছে তার নাম তলোয়ার নয়, তার নাম কলম। শোনা যায় কলম নাকি তলোয়ারের চেয়ে প্রবল। হতে পারে, কিন্তু এই অবস্থায় নয়। আর তলোয়ারও কি এ ক্ষেত্রে কাজে লাগবে? যুদ্ধঘোষণা করলে সৈনিকরা চলে যাবে সীমান্ত রক্ষা করতে। শহর রক্ষা করার ভার পড়বে পুলিশের উপর। গ্রাম রক্ষার ভার চৌকিদারের উপর। এরা কি সংখ্যালঘুদের ধনে প্রাণে বাঁচাতে পারবে? পূর্ব বা পশ্চিম বঙ্গের কোনোখানেই যথেষ্ট পুলিশ বা চৌকিদার নেই।

সংখ্যালঘুদের একমাত্র ভরসা সংখ্যাগুরুদের শুভবুদ্ধি। যেমন এখানে তেমনি ওখানে। বাঙালী হিন্দু-মুসলমান যদি পরস্পরকে মেরে সাবাড় করতে চায় তবে কে বাঁচাবে? যদি সীমানা পার করে দিতে চায় তবে কে ঠেকাবে? শান্তির সময়েও দেখা গেল পুলিশ পেরে উঠছে না, মিলিটারি এসে না থামালে এপারে বা ওপারে কোনো পারেই থামত না। যুদ্ধকালে কে থামাবে? আমরা গান্ধীজীর কাছ থেকে শিখিনি। কেমন করে মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবানের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করতে হয় তা জানিনে। শান্তিসেনা যদি বা গঠন করা গেল তাকে ঠিক সময়টিতে ঠিক জায়গাটিতে পাওয়া গেল না। এত বড় একটা দায় দু'চারজন আদর্শবাদীর স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের উপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। রাজনীতিকদের এ দায় নিতে এগিয়ে আসা উচিত, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁরা আসেন না।

সুতরাং যা হবার তা হবেই। মানুষ মরবে, ঘর পুড়বে, সম্পত্তি লুট হবে। আমার ধারণা ছিল এটা শুধু গুণ্ডাদেরই কাজ। কিন্তু ইতিমধ্যে নানা সূত্রে জানতে পেরেছি ভদ্রলোকের ছেলেরা, এমন কি বড়রাও এতে লিপ্ত। এ জাতিকে বাঁচাবে কে? গুণ্ডাকে কেমন করে দমন করতে হয়, সেটা জানা।

কিন্তু এই শ্রেণীর অপরাধীদের শাসন করার কৌশল অজানা। আমরা লেখকরা দমন বা শাসন কর্মে অক্ষম। উদ্ধার কর্মে অসমর্থ। আমরা বড়জোর লিখতে পারি, লিখে অপ্রিয় হতে পারি। তাই বা ক'জন হতে রাজী? লেখকদের হাতে অন্য কাজ। সৃষ্টির কাজও তো কাউকে না কাউকে করতে হবে। শিল্পী যেন গর্ভিণী নারী। তাকে গর্ভ রক্ষা করতে হবে। যেখানে ঘোরতর অন্যায় সেখানে সে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকলে তারও বিবেকে বাধে, কিন্তু সে যদি তার গর্ভ রক্ষা না করে সেটাও কি কম ভাবনার কথা!

নক্ষত্রের আলো

প্রথমে শ্রীনগরে, তার পরে খুলনায়, তার পরে কলকাতায় ও তার পরে ঢাকায় যেসব ঘটনা ঝড়ের বেগে ঘটে গেল তাদের পূর্ণাঙ্গ চিত্র এখনো আমি পাই নি। নানা জনের মুখে যা শুনেছি আর চিঠিতে যা পড়েছি তার সঙ্গে খবরের কাগজের বিবরণ ও রেডিওর সমাচার জুড়ে মোটামুটি একটা নক্‌শা এঁকে নিচ্ছি। আপনি তাতে আরো এক পোঁচ কালি বুলিয়ে দিলেন। এ কালি কোনো রকম চুণকামেই মুছতে পারে না।

দাঙ্গা যারা করেছে তারা গবর্ণমেণ্টের মুখ চেয়ে করে নি। দাঙ্গা যারা থামাতে গেছে তারাও গবর্ণমেণ্টের মুখ চেয়ে যায় নি। যে যার অশুভবুদ্ধি বা শুভবুদ্ধির প্রেরণায় চালিত হয়েছে। অসহায় বোধ করেছে কেবল তারাই যাদের ধারণা নিজেদের একটা গবর্ণমেণ্ট হয়েছে বলে সে গবর্ণমেণ্ট সর্বশক্তিমত্তার সনদ পেয়েছে। স্বরাজ মানে সর্বশক্তিমত্তা নয়। বার্লিন শহরের মাঝখানে একটা দেয়াল দেওয়া হয়েছে। নদীর মাঝখানেও একটা কাল্পনিক দেয়াল দিয়ে নৌকায় চড়ে পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সীমান্তরক্ষী। চোখের সুমুখে যা ঘটে যাচ্ছে তা অসহায় হয়ে দেখছেন এ-পক্ষের বা ও-পক্ষের গবর্ণমেণ্ট। তারপর যথারীতি প্রতিবাদ। তার যথারীতি উত্তর প্রত্যুত্তর। ইতিমধ্যে নদী দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। চোখের জলও কি শুকিয়ে যায় নি ?

আগেকার দিনে আমরা যাকে হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলে জানতুম এ জিনিস সে জিনিস নয়। এখন দু'দিকে দু'টো স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হয়েছে। পাকিস্তান ছোট বলে কম স্বাধীন বা সার্বভৌম নয়। তার মনে সমস্তক্ষণ সন্দেহ ভারত হয়তো তাকে কম স্বাধীন বা সার্বভৌম মনে করে। ভারত সরকার এটা জানেন বলেই তার সঙ্গে সাবধান হয়ে ব্যবহার করেন। কিন্তু ভারতীয় জননায়কদের ব্যবহার সব ক্ষেত্রে সাবধান নয়। তাঁদের অনেকের বিশ্বাস যে পাকিস্তান যখন ছোট তখন তার উপর চাপ দেওয়া সম্ভব ও সঙ্গত। ভারত সরকার চাপ দিতে পারতেন, দিচ্ছেন না তার কারণ তাঁদের তোষণনীতি বা মুসলিম প্রীতি। ওদিকে পাকিস্তানী জননায়কদের অনেকের ধারণা ভারত যখন বড় তখন পাকিস্তানের উপর চাপ দেবার প্রলোভন

সংবরণ করতে পারবে না। তাকে সংযত করতে হলে চাই আরো মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র। আরো জবরদস্ত মিত্র। মার্কিন জোগাবে অস্ত্রশস্ত্র। চীন হবে মিত্র।

এই যে চাপ দিয়ে কাজ করিয়ে নেবার বা একে পাল্টা চাপ দিয়ে প্রতিহত করার প্রস্তাব এর কোনো শেষ নেই। সেইজন্যে গান্ধীজী প্রথমত চেয়েছিলেন একটাই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেটাও যখন সম্ভব হলো না তখন দ্বিতীয়ত চাইলেন দুই রাষ্ট্রের একটাই সৈন্যদল, কিংবা দুই সৈন্যদলের একটাই কমাণ্ড। সেটাও যখন সম্ভব হলো না তখন তৃতীয়ত চাইলেন যে ভারত-পাকিস্তান যে যার সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করবে ও পাকিস্তানের জন্যে অপেক্ষা না করে ভারত তার আপন কর্তব্য অবিচলিতভাবে করে যাবে। ভারত সরকারকে যে নীতি নির্দেশ করা হলো সেটা অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলো কি না দেখে তিনি নোয়াখালীতে ফিরে যাবেন ও সেখানকার কর্তৃপক্ষকে দিয়ে অনুরূপ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়ে নেবেন এই ছিল তাঁর সংকল্প। বেঁচে থাকলে তিনি নোয়াখালীতেই 'করতেন কিংবা মরতেন'। করতে পারলে আজকের এই সমস্যার উদয় হতো না। মরলেও কিছু সুফল ফলত। পাকিস্তানের বিবেকীদের মনে একটা দাগ থেকে যেত। যেখানে বিবেক কাজ করছে না সেখানেও বিবেক সাড়া দিত।

গান্ধীজী যে নীতি নির্দেশ করেছিলেন তার চেয়ে ভালো কিংবা কার্যকর নীতি আমার জানা নেই। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করে আমিও সেই একই নীতিতে উপনীত হই। এদিকে ভারত সরকার ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের সরকারকে দিয়ে সংখ্যালঘুদের ধন প্রাণ ও মান রক্ষা করবেন, পাকিস্তানের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। ওদিকে গান্ধীজীর মতো কয়েকজন সত্যাগ্রহী নোয়াখালীতে তথা পূর্ববঙ্গের জেলাতে জেলাতে 'করবেন কিংবা মরবেন'। বুকে হাত দিয়ে বলবার সময় এসেছে, সত্যি কি ভারতের প্রত্যেকটি জায়গায় গান্ধী নির্দিষ্ট নীতি পালন করা হয়েছে এতদিন? না মাঝে মাঝে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে? আর নোয়াখালীতে ও পূর্ব বঙ্গের অন্যান্য জেলায় গান্ধীজীর মতো সত্যাগ্রহীরা কি অনবরত কাজ করে যাচ্ছেন? মাঝে মাঝে প্রাণ বিপন্ন করেছেন কি?

পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে কয়েকজন এই সম্প্রতি হিন্দুদের বাঁচাতে গিয়ে স্বধর্মীর হাতে মৃত্যু বরণ করেছেন। একজনের নাম জানতে পেরেছি।

জনাব আমীর হোসেন চৌধুরী। সুপরিচিত লেখক ও সমাজসেবী। ঢাকার নবাবপুরে দিনে দুপুরে পশ্চিমা মুসলমান দাঙ্গাবাজের হাতে নিহত হন। ইনি অমর। শান্তি মিছিল বার করতে গিয়ে আরো কয়েকজনও অমর হয়েছেন। সবাই মুসলমান। এঁরাই প্রকৃত ধার্মিক। এঁরাই ইসলামকে কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচালেন। এদিকে হিন্দুত্বকেও কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা করেছেন মিশ্রীলালের মত ধার্মিক তথা অমর। এই অন্ধকার মেঘলা রাত্রে আমরা পথ দেখতে পাচ্ছি এখানে ওখানে জলতে থাকা এরকম সাত আটটি তারার আলোয়। এঁরাই সবচেয়ে সংখ্যালঘু। এঁরা অভয় দিয়ে গেলেন যে, সংখ্যালঘুদেরও সহায় আছে, তারা একেবারে অসহায় নয়।

পূর্ববঙ্গে আমি অনেক দিন কাজ করেছি। পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরেছি। এমন গ্রাম আছে যেখানে রাস্তাঘাট নেই পুলিশ সহজে পৌছতে পারবে না। তা ছাড়া একটা থানায় ক'জনই বা কনস্টেবল! হাজার ঘর মুসলমানের মাঝখানে পাঁচ সাত ঘর হিন্দু বাস করছে কার উপর ভরসা করে? পুলিশের উপর না প্রতিবেশীর উপর? হিন্দুর বিপদে আপদে হিন্দুর চেয়ে মুসলমানই সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। তেমনি মুসলমানের আপদে বিপদে হিন্দু। এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িক চুক্তি নেই। এটা মানুষের ধর্ম। তাছাড়া লৌকিক হিন্দুধর্মের সঙ্গে লৌকিক মুসলমান ধর্মের ঘরোয়া একটা রফা বহু শতক ধরে চলে এসেছে। নিরক্ষর হিন্দু মুসলমান এটা মানে। লেখাপড়া শিখলেই পুঁথিপত্র এসে সব গোলমাল করে দেয়। কিংবা মোল্লা এসে ভেদ রিপু জাগিয়ে যায়। ধর্মের সঙ্গে যদি রাজনীতি যোগ দেয় তবে আর রক্ষা নেই।

রাজনীতি ঢুকল নির্বাচনের সূত্র ধরে। মুসলমানের আলাদা একটা নির্বাচকমণ্ডলী। তার থেকে যিনি নির্বাচিত হবেন তিনি যদি বলে বেড়ান ইসলামের মহাবিপদ তা হলে মুসলমানের মনে ভেদরিপু জাগবেই। কতক মুসলমান তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগকে ভোট দেয় না। কৃষক প্রজা পার্টিকে দেয়। তখন পাকিস্তানের নামে ভোট চাওয়া হলো। নিজেদের নবাব বাদশারা ফিরে আসবেন, শুধু একটা ভোটের অপেক্ষা। ভোট না দেবে কোন্ মুসলমান? তার পরের ধাপটি ডাইরেক্ট অ্যাকশন। সাধারণ দাঙ্গা নয়। এক প্রকার যুদ্ধ। যুদ্ধের দ্বারা যেটা স্থির হবার কথা সেটা ডাইরেক্ট অ্যাকশনের ফলে স্থির হলো। এক বছর যেতে না যেতেই দেশ ভাগ হয়ে গেল, প্রদেশ ভাগ হয়ে গেল।

ঐতিহাসিক ১৫ই আগস্টের দিন সাতেক আগে আমি পূর্ববঙ্গ থেকে বদলি হয়ে আসি। তখনো আমি সেখানকার হিন্দুদের মনে সন্ত্রাস দেখিনি। পাঞ্জাবের সঙ্গে বাংলার তুলনাই হয় না। তবে একথাও আমি শুনে আসি যে কলকাতায় যদি মুসলমানদের উপর আক্রমণ হয় তবে পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর আক্রমণ অবশ্যম্ভাবী। কলকাতার হিন্দুরা নাকি ১৫ই আগস্টের দিন ভেবেছে যে সারা বছরের শোধ নেবে। মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতাদের আপ্রাণ প্রয়াস সার্থক হলো। সেদিন যা ঘটল তা বিজয়ার কোলাকুলি। কলকাতায় শান্তি, সুতরাং পূর্ববঙ্গেও শান্তি। শান্তিজল ছিটিয়ে দিলেন যিনি তিনি গৃহবিবাদের উপর যবনিকা টেনে দিলেন। সেদিন গান্ধীজীও চান নি, কোনো পক্ষের কোনো নেতাই চান নি যে, সব হিন্দু এপারে চলে আসে ও সব মুসলমান ওপারে চলে যায়। তাই যদি হত তবে তার উপযোগী লগ্ন ছিল ১৫ই আগস্ট। সেদিন যদি কলকাতায় হিন্দুরা উন্মত্ত হয়ে দলবদ্ধভাবে হানা দিত তা হলে পুলিশের এত জোর ছিল না যে বাধা দেবে, মুসলমানদেরও এত জোর ছিল না যে রুখবে। হাজার হাজার মুসলমান কাটা পড়ত, যারা বাঁচত তারা পালাত, যারা পালাত তারা নাচাত, সঙ্গে সঙ্গে ওপারেও শুরু হয়ে যেত হিন্দু নিধন ও বিতাড়ন। এক মাসের মধ্যেই এক কোটি লোক এসে পঞ্চাশ লাখ লোকের ঘরবাড়ি মসজিদ দখল করে বসত। কোথায় মিলিটারী যে বাংলার হিন্দু-মুসলমানকে সে সঙ্কটে ত্রাণ করত! তার বদলে ছিলেন এক মহাত্মা। তিনি একাই এক ডিভিজন সৈন্য। মাউণ্টব্যাটেন বলেন, 'ওয়ান-ম্যান বাউণ্ডারি ফোর্স।'

সেই যুগসন্ধি চিরকালের মতো উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। সরকারের উদ্যোগে প্ল্যান করে লোকবিনিময় হয় না। হতে পারে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে কতক লোককে সীমান্ত পার করে দেওয়া। ওদিক থেকে আসবে এক দল। এদিক থেকে যাবে আরেক দল। কিন্তু তার ফলে কোনো স্থায়ী সমাধান হবে না। দু'দিকেই থেকে যাবে অধিকাংশ সংখ্যালঘু। মাঝখান থেকে পঙ্গু হবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠন। মানুষ তো রাক্ষস হয়ে যাবেই, শহরে ও গ্রামে প্রবর্তিত হবে জঙ্গল আইন। আর হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে এমন এক জাতিবৈর সৃষ্টি হবে, যার জের চলবে পুরুষানুক্রমে। প্রতি দশ বিশ বছর অন্তর দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধবে, দফায় দফায় লোকবিনিময় হবে। পাঞ্জাবের যা হবার তা এক দফাতেই হয়ে চুকেছে। বাংলার যা হবার তা সাত দফাতেও সারা হবে না।

কিন্তু কেন? সত্যি কি এর কোনো দরকার আছে? দেশভাগ হয়েছে বলে কি লোকবিনিময়ও ঘটা উচিত? অনেকের মনে এখনো এই যুক্তি কাজ করছে। মুসলমানরা কেন এ রাষ্ট্রে বাস করবে? এটা তো ওদের স্থান নয়। এ মনোভাব এখনো সক্রিয়। বলা বাহুল্য এঁরা শিক্ষিত সজ্জন। এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে গেলেই এঁরা প্রশ্ন করেন, তা হলে দেশ ভাগ হলো কেন? ইতিমধ্যেই এঁরা ভুলে গেছেন যে, দেশ ভাগ না হলে পশ্চিমবঙ্গে-কংগ্রেস রাজত্বে বাস করতে হতো না। হতো নিখিল বঙ্গে মুসলিম লীগ রাজত্বে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কতবার রাজায় রাজায় দেশ ভাগ হয়েছে। কই, লোকবিনিময় তো হয় নি? এই প্রথম বার আমরা দেখতে পেলুম পাঞ্জাবে ও সিন্ধুপ্রদেশে সে রকম একটা অনর্থ ঘটে গেল। সেটা রাজায় রাজায় একমত হয়ে লোকবিনিময় নয়। সেটা আপনা আপনি ঘটে যাওয়া একটা ব্যাপার। তাতে করে প্রমাণ হলো না যে ভারতে মুসলমানের স্থান নেই। তাই যদি হবে তো কাশ্মীরের উপরে আমাদের কিসের দাবী? ভারতের সংবিধান হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান ভেদ স্বীকার করে না। সমাজে এসব থাকতে পারে, রাষ্ট্রে এসব নেই। সংবিধান রচনার চোদ্দ বছর বাদে হঠাৎ একটা কাণ্ড ঘটেছে বলে কি আমরা সংবিধানের নির্দেশ উপেক্ষা করব?

মুসলমানকে বিদায় করা চলতে পারে না, এটা এখন স্বতঃসিদ্ধ। তা হলে লোকবিনিময় কথাটার কোনো অর্থ হয় না। যাবে না একজনও, আসবে এক কোটির মতো লোক। এতগুলি পাকিস্তানী ন্যাশনালকে তাদের রাষ্ট্র আসতে দেবে কি না সন্দেহ। একবার একটা রাষ্ট্রের নাগরিক হবার পর সহজে নিষ্কৃতি নেই। ভারতীয়দের অনেকে ইংলণ্ডের নাগরিক হয়েছেন। ভবিষ্যতে যদি আবার যুদ্ধ বাধে তো কনস্ক্রিপশন থেকে অব্যাহতি পাবার আশায় তাঁরাও হয়তো চাইবেন ভারতে পালিয়ে আসতে। সে সময় ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট কি রাজী হবেন তাঁদের ছাড়তে? পাকিস্তানের সঙ্গে আগে থেকে বন্দোবস্ত হয়েছে যে বিশেষ বিশেষ স্থলে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিতে ভারত সরকার ও পাকিস্তান সরকারের এক্তিয়ার থাকবে। সেটা কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্যে নয়। একটা রাষ্ট্রের অর্থনীতি নষ্ট করে দেবার জন্যেও নয়। তার উপক্রম দেখলে পাকিস্তান নিশ্চয় প্রতিবাদ করবে। কতক লোক যেমন করে হোক চলে আসবেই। কেউ তাদের আটকাতে পারবে না। আটকাতে হলে আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে। সেটা পাকিস্তান সরকারের কর্তব্য।

ঘটনাপরম্পরার আরম্ভ পূর্ববঙ্গে নয়, কাশ্মীরে। বিনা অপরাধে শাস্তি পেলো পূর্ববঙ্গের হিন্দু। পাকিস্তান সরকার যদি হিন্দুর আস্থা হারান তা হলে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করে সরকারকে সরানোর ক্ষমতা সংখ্যালঘুর নেই। কিন্তু হিন্দুদের অনাস্থা ক্রমে মুসলমান প্রতিবেশীদের মধ্যেও সঞ্চারিত হবে। কর্তাদের আসন টলবে। এটা যদি তাঁরা বুঝে থাকেন তাঁরাই আস্থাভাজন হতে যত্নবান হবেন।

অনেকদিন আগে লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় একটা বিজ্ঞাপন দেখতুম। 'জামাকাপড় পরে সবাই তৈরি, কিন্তু যাবার নেই কোথাও।' ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে খেলাধূলা করার জায়গা নেই ধারে কাছে। পাকিস্তানী লড়নেওয়ালাদের দশা কতকটা লণ্ডনের খেলনেওয়ালাদের মতো। সর্বাঙ্গে হাতিয়ার। মুখে রণহুঙ্কার। চোখে কাশ্মীরের ভূস্বর্গের মৃগতৃষ্ণা। কিন্তু রাওলপিণ্ডি থেকে শ্রীনগর দূর অস্ত। খেলার মাঠে পা বাড়াবার জো নেই। ভারত বলে দিয়েছে কাশ্মীর আক্রমণ মানে ভারত আক্রমণ। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানও আক্রান্ত হবে।

জনসাধারণকে যদি দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যুদ্ধের জন্যে তাতিয়ে তোলা হয় তা হলে একদিন তাদের কতক বেপরোয়া হয়ে সামনে যাকে পায় তারই উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যুদ্ধের স্বাদ দাঙ্গায় মেটায়। এ হলো স্নায়ুযুদ্ধের পরিণাম। মানুষকে যদি যুদ্ধের জন্যে উত্তেজিত করে যুদ্ধ না দেওয়া হয় তবে সে তার সেই উত্তেজনা নিয়ে করবে কী? ভিতরকার গরম বাইরে বেরোতে না পেলে মানুষ যে ছটফট করে বুক ফেটে মারা যাবে। পাকিস্তানের মতো দেশে বিপ্লব হয় না। হয় দাঙ্গা। দাঙ্গার অবকাশ মাঝে মাঝে পশ্চিম পাকিস্তানেও মেলে। বছর দশেক আগে আহমদিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানদের উপর দিয়ে ঝড় বয়ে যায়। বড়লাট গুলাম মহম্মদ প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে বরখাস্ত করেন। কিছুদিন আগেও শিয়াদের উপর হামলা হয় শুনেছি। ঠিক মনে পড়ছে না সব কথা। পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু থাকলে আর মুসলমান মারতে হতো না। পূর্বপাকিস্তান যখন হিন্দুশূন্য হবে তখন মোহাম্মদীরা হানাফিদের মেরে হাতের সুখ পাবে। ইসলামী রাষ্ট্রের ইহাই নিয়ম।

তবে ইতিহাস এখন বিংশ শতকের তৃতীয় পাদে পৌঁছেছে। ইসলামী দেশগুলোও লাল হয়ে যাচ্ছে। চীনের কুমীরকে যাঁরা খাল কেটে ঘরে ডেকে আনছেন তাঁদের কি খেয়াল নেই যে একদিন তাদের প্রিয় দাঙ্গাবাজরাও লাল হয়ে যাবে? সেদিনকার দাঙ্গার নাম হবে বিপ্লব, রূপ হবে বৈপ্লবিক।

সেদিন হয়তো এমন দৃশ্যও দেখা যাবে যে দমদমের বিমান বন্দরে অবতীর্ণ হয়েছেন ঢাকার পলাতক মুহম্মদ তুঘলক সম্প্রদায়। মানুষ শিকারে যাঁদের আনন্দ। আর একদল রেফিউজীকে আশ্রয় দিয়ে বাঁচাতে হবে।

পাকিস্তান কবে ভাঙবে, জানিনে। কিন্তু বাঙালী জাতি যে চোখের সামনে ভেঙে যাচ্ছে। গ্রামছাড়া শহরছাড়া রাজ্যছাড়া হয়ে যারা দিগ্‌বিদিক ছুটছে তারা হিন্দু কি মুসলমান সেটার চেয়ে বড় কথা তারা বাঙালী। ইসলামের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর থেকে সাতশ' বছর কেটে গেছে, বাঙালী চিরটাকাল তার ভিটেমাটি কামড়ে পড়ে আছে। যাদের জীবিকার জন্যে দূর দেশে যেতে হয়েছে তারাও বছরে একবার পুজোর সময় ঘরে ফিরেছে। এমন ঘরমুখো জাতি আর নেই। সেই জাতিরই কপালে ছিল এই দুঃখ। কিন্তু কেন? কোথায় এর মধ্যে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা? এটা কি ধর্মযুদ্ধের শতাব্দী? ক্রুসেড বা জেহাদ কি দুনিয়ার আর কোনো দেশে আজকের দিনে ঘটেছে?

না। এর পিছনে ঐতিহাসিক অনিবার্যতা নেই। সেটা হয়তো ছিল লক্ষ্মণসেনের আমলে। সেকালেও বাঙালী জাতি ভেঙে যায় নি। তার সমাজবিন্যাস, তার জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয় নি। কতক বাঙালী ধর্মান্তর গ্রহণ করেছে, কিন্তু ভাষা বা সংস্কৃতি বর্জন করে নি। ধীরে ধীরে ধর্মান্তরিতদের সংখ্যা ও অনুপাত বেড়েছে, কিন্তু বাঙালীর বাসভূমি ও বাংলার আবহাওয়া বদলায় নি। সুলতানী আমলে যা ঘটল না, নবাবী আমলে যা ঘটল না, ইংরেজ আমলে যা ঘটল না তাই ঘটে চলেছে পাকিস্তানী আমলে। দাঙ্গা যে সব সময় ওপারেই শুরু হয়েছে তা নয়। কোনো কোনো বার এপারেও আগে বেধেছে। পশ্চিমবঙ্গে না হোক উত্তর প্রদেশে বা মধ্যপ্রদেশে। সেসব অঞ্চলে সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে অনর্থের বীজ বুনে যাচ্ছে তার ফসল কাটার সময় ডাক পড়েছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। উত্তর প্রদেশে গোহত্যা আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তার উত্তর দিতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। পূর্ববঙ্গের ঘটনাগুলোর জন্যে হিন্দীওয়ালারও দায়ী। স্বাধীনতার পর থেকে উত্তর প্রদেশে উর্দুর উপর যে জুলুমটা চলেছে সেটার জবাবও দিতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। আসাম থেকে অনধিকার প্রবেশের জন্যে যেসব মুসলমানকে পূর্বপাকিস্তানে ফেরৎ পাঠানো হচ্ছে তাদের জন্যেও জবাবদিহি করতে হচ্ছে পূর্ববঙ্গের হিন্দুকে। এর পিছনে যা আছে তার নাম ঐতিহাসিক অনিবার্যতা

নয়, গায়ের ঝাল ঝাড়া। ঐ করতে গিয়ে গাঁ উজাড়, শহর উজাড়, চাষবাস ব্যবসা-বাণিজ্য বানচাল।

কবে শিক্ষা হবে, জানিনে। শিক্ষাটা এই যে হিন্দুর ক্ষতিতে মুসলমানেরও ক্ষতি। তেমনি মুসলমানের ক্ষতিতে হিন্দুরও ক্ষতি। এবার সে ক্ষতি চরমে উঠেছে দেখে আশা হয় এ অধ্যায়টা শেষ হয়ে আসছে। কিন্তু বার বার আশাভঙ্গের পর বাজী রেখে বলতে পারছিনে যে এই শেষ। তবে এটা আমি জোর করে বলতে পারি যে একের সর্বনাশে অপরের সর্বনাশ। পূর্ববঙ্গের এক কোটি হিন্দু যদি চলে আসে পূর্ববঙ্গে দুর্ভিক্ষ হবে আর পশ্চিমবঙ্গে চালের মণ হবে এক শ' টাকা। প্রাণে বাঁচবে ক'জন! হিন্দুরা মরিয়া হয়ে হিন্দুর ঘরেই হানা দেবে, মুসলমানের ঘরে আর কতটুকুই বা পাবে! ওপারেও দেখা যাবে একই দৃশ্য। মুসলমান লুট করছে মুসলমানের দোকান, মুসলমানের গোলা। সেবারকার মন্বন্তরের মতো রাস্তার ধারে খাবারের দোকান আস্ত রেখে মরবে না কেউ। পুলিশের বন্দুকে ক'টা গুলী আছে যে লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষুকে মারবে!

রম্যা রলাঁর উক্তি মনে পড়েছে। 'পথে প্রবাসে'র থেকে তুলে দিচ্ছি।

প্রতীতির সহিত বললেন, "নেশনরা যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক নেশনের ক্ষতিতে সব নেশনের ক্ষতি যুদ্ধ ততদিন থাকবেই। কাতর স্বরে বললেন, মানুষের ইতিহাসে দেখছি যুদ্ধের অবসান হলো না। তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, আলো জ্বালান, আলো জ্বালান, দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলুন। যুদ্ধের প্রতিষেধ—শিক্ষা।"

দাঙ্গাও এক জাতের যুদ্ধ। হিন্দু মুসলমান যতদিন না ঠেকে শিখছে যে এক সম্প্রদায়ের ক্ষতিতে সব সম্প্রদায়ের ক্ষতি, দাঙ্গা ততদিন থাকবেই। ভারত পাকিস্তানের ইতিহাসে দেখছি দাঙ্গার অবসান হলো না। তবু অসীম ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রাখলে আশার আমেজ থাকে। আলো জ্বালাতে হবে। আলো জ্বালাতে হবে। দিকে দিকে আলো জ্বালিয়ে তুলতে হবে। যেমন করে জ্বালিয়ে গেছেন আমীর হোসেন চৌধুরী, মিশ্রীলাল ও আরো কয়েকজন তেমনি করে। তা যদি না পারি তো রম্যা রলাঁ যেভাবে জ্বালাতে বলেছিলেন সেই ভাবে। দাঙ্গার প্রতিষেধ—শিক্ষা।

মানুষ মৃগয়া

স্টেটসম্যান পত্রিকায় আপনি যে বিবৃতিটি পড়েছেন সেটি সর্বোদয় কর্মীদের বিবৃতি। তাঁদের কয়েকজন হচ্ছেন আমার আত্মীয়তুল্য বন্ধু। তাঁদের অনুরোধ এড়াতে না পেরে হংসো মধ্যে বকো যথা আমিও স্বাক্ষর করেছি। অন্য কারণও ছিল। তাঁদের ও আমার বিবেকে আগুন ধরিয়েছে ওড়িশায় ও বিহারে অনুষ্ঠিত পৈশাচিক ঘটনাবলী। আমারও তো ওড়িশায় জন্ম ও বিহারে পড়াশুনা।

হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা আমাদের জীবনে এই নতুন নয়। কিন্তু এখন যা দেখছি তা অন্য জিনিস। এটার প্রকৃত নাম দাঙ্গা নয়, মানুষ মৃগয়া। ম্যান হাণ্ট। কতকগুলি নিরস্ত্র সংখ্যালঘু নাগরিক কারো কোনো ক্ষতি করল না, অথচ কোথায় কী হয়েছে বলে তাদের দশগুণ কি বিশগুণ সংখ্যাগুরু প্রতিবেশী তাদের চারদিক থেকে ঘেরাও করে কোণঠাসা করে আনল ও ধনে প্রাণে মারল। এ দৃশ্য যদি কেবল পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকত তা হলে আমরা ডাক্তার সেজে রোগীকে সারাতে চেষ্টা করতুম। কিন্তু ভারতেও এ দৃশ্য প্রসারিত হয়েছে। আমরাও রোগী। কে কার রোগ সারাবে?

আপনার প্রবন্ধ পড়বার সময় মনে হচ্ছিল ১৯৩০ সালের জার্মানীতে বাস করছি। হিটলার যে পরিস্থিতিতে ডাক্তার সেজে এলো। হিটলারের ডাক্তারির পরিণাম তো দেখা গেল। কে তার পুনরাবৃত্তি চায়? জার্মানীর মতো এখানেও ফাসিস্ট বনাম কমিউনিস্ট শক্তি কাজ করছে। মাঝখানে থেকে সাম্য রক্ষা করছে সোশ্যাল ডেমোক্রাট শক্তি। আমরা যদি সোশ্যাল ডেমক্রাটদের মূল্য না বুঝি, তারা যদি ঘটনার উপর কণ্ট্রোল হারিয়ে ফেলে, তা হলে আমাদেরও ভাগ্যে আছে ফাসিস্টদের পাল্লায় পড়া। তার পরে কমিউনিস্টদের সঙ্গে ফাসিস্টদের সংঘর্ষ। তার পরে কতক অঞ্চল কমিউ-নিস্টদের হাতে যাওয়া। হয়তো পূর্ববঙ্গ ও আসাম লাল হয়ে যাবে। সোশ্যাল ডেমোক্রাসী দুর্বল হলে দ্বিতীয় পার্টিশন অবশ্যম্ভাবী।

আমরা এ পরিস্থিতিতে কী করতে পারি? সাহিত্যিক হিসাবে আমি আমার সৃষ্টির কাজ সময় থাকতে শেষ করতে চাই। সময় এত কম আর সৃষ্টি এত শ্রমসাধ্য যে এমনিতেই আমি কাতর। তার উপর আর কোনো বোঝা চাপালে উট মুখ থুবড়ে পড়বে। আমি আমার সীমাসম্বন্ধে সজ্ঞান। জনাব

আমীর হোসেন চৌধুরীর মতো আমি প্রাণ দিতে পারব না। কিন্তু কেউ যদি প্রাণ দেন তবে আমি তাঁর জয়গান করব। পূর্ববঙ্গে ত্রিশ জনের উপর মুসলমান ও পশ্চিমবঙ্গে অন্তত একজন হিন্দু প্রাণ দিয়েছেন, নিজেদের প্রাণ দিয়ে এঁরা শত শত মানুষকে প্রাণ দিয়েছেন। সাহিত্যিক যদি এত বড় মহত্বের সাক্ষ্য দিয়ে না যান তা হলে এঁদের কী! সাহিত্যিকেরই ক্ষুদ্রতা।

এই রকম অনেক কাজ আছে যা আমরা সাহিত্যসৃষ্টির কাজে ফাঁকি না দিয়ে করতে পারি। আপনি কোন্‌টা করবেন সেটা নির্ভর করবে আপনার প্রকৃতির উপর, রুচির উপর। সকলের জন্যে একই কর্ম নয়। পাঁচজনে মিলে চিন্তা করাও একটা করবার মতো কাজ। তাই বা ক'জন করছেন! বেশীর ভাগ দেশবাসী যেখানে যা পড়ছেন বা যা শুনছেন তাই বিশ্বাস করে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ। এঁদের ভার ঈশ্বরের উপরে ছেড়ে দিয়ে পাঁচজনে বসে চিন্তা করা যাক। মণ্ডলী করুন। মাঝে মাঝে একত্র হোন। নানা দিক থেকে ভাববার আছে। কিন্তু তার আগে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। খবরের কাগজে যাই বেরোয় তাই তথ্য নয়। তথ্যের জন্যে যদি ক্ষুধা না থাকে তবে চিন্তা কিসের দ্বারা পুষ্ট হবে? কতকগুলো অসত্য ও অর্ধসত্যের দ্বারা চিন্তার পুষ্টি হয় না। পশ্চিমবঙ্গে কেবল যে চালের বা মাছের আকাল তাই নয়, প্রকৃত তথ্যেরও আকাল। আমাদের ইন্‌টেলেকচুয়ালদের সত্যের উপর গ্রিপ নেই। তাঁদের লেখা লক্ষ্য ভেদ করে না। ফস্‌কে যায়।

সকলের সব ত্রুটি আপনি একা মেটাতে পারবেন না। কার কোথায় গলদ ঘটল সেটা নিয়ে আকাশ ফাটালেও গলদ সারবে না। যারা জেগে ঘুমায় তাদের ঘুম ভাঙানো অসম্ভব। অন্ধকারের সঙ্গে ডন কুইকসোটের মতো লড়াই করতে না গিয়ে ছোট একটি মোমবাতি জ্বালানোই ভালো। সেটাও একপ্রকার যুদ্ধ। যদিও তার মধ্যে যুদ্ধের নামগন্ধ নেই। যদি কেউ প্রেমের কবিতা লেখেন তবে তাঁর সেই প্রেমের কবিতাও প্রকারান্তরে অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই। তাতেও অন্ধকার এক পা হটে যায়। ইন্‌টেলেকচুয়ালদের সম্মুখ সমরে নামতেই হবে এমন কোনো মাথার দিব্যি নেই। তাঁরা যদি একভাবে না একভাবে মধ্যযুগের প্রভাব খর্ব করেন তা হলে সেটাও একপ্রকার যুদ্ধজয়। মধ্যযুগ এদেশ থেকে বিদায় নিতে বড় বেশী বিলম্ব করছে। এইসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতার উদ্বর্তন। আলো জ্বালানোই এদের মৃত্যুবাণ।

দুষ্ট বৃত্ত

স্টেটসম্যান পত্রিকায় ইংরেজীতে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ প্রমুখ 'সমাজকর্মী'দের যে বিবৃতিটি পড়েছেন সেটি সর্বোদয়কর্মীদের রচনা। আমাকে স্বাক্ষর দিতে অনুরোধ করা হয়। অপরের রচনায় আমি কখনো স্বাক্ষর দিইনে। যদি না আমার সঙ্গে পরামর্শ করে রচিত হয়ে থাকে। কিন্তু এবারকার পরিস্থিতিতে আমার এই রীতির দু'বার ব্যতিক্রম ঘটল। জানুয়ারি মাসে পশ্চিমবঙ্গের লেখক শিল্পী অভিনেতাদের যে সমবেত আবেদন ওই স্টেটসম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার গোড়াতেই আমার নাম দেখে আমি চমকে উঠি। পরে জানা গেল যে আমার বন্ধুরা আমার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু দাঙ্গার মাঝখানে যোগাযোগ দুঃসাধ্য ছিল। তাঁদের সঙ্গে আমি একমত ছিলুম, সুতরাং তাঁদের কাজ সমর্থন করেছি।

এক্ষেত্রেও আমি সর্বোদয়কর্মীদের সঙ্গে একমত। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আমার আত্মীয়তুল্য বন্ধু নবকৃষ্ণ ও মালতী চৌধুরী। এঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। এঁদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত করুণ। এঁদের করুণা, এঁদের সত্যনিষ্ঠা, এঁদের শুভবুদ্ধি এঁদের স্থির থাকতে দেয়নি। এঁরা ও এঁদের সহকর্মীরা কর্তব্যের অনুরোধে যে বিবৃতি দিয়েছেন তার প্রত্যেকটি কথা আমার পছন্দসই না হলেও মোটের উপর সেটি সমর্থনযোগ্য। ওড়িশায় ও বিহারে যা ঘটেছে তা দু'চারটে খুচরো খুনজখম নয়। তার ব্যাপকতা, তার বীভৎসতা, তার নৃশংসতা প্রায় পাকিস্তানের কাছাকাছি যায়।

এই দুষ্ট বৃত্ত যদি কোথাও এক জায়গায় না থামে, কেউ যদি এর ছেদ না ঘটায় তবে ভারতীয় বলে আমাদের গর্ব করবার কিছু থাকবে না। লজ্জায় আমাদের মাথা কাটা যাবে। আমাদের ছেলেমেয়েদের আমরা কোন্ উত্তরাধিকার দিয়ে যাব? আমাদের ওরা শ্রদ্ধা করবে কেন? ভাবীকাল ছি ছি করবে। সেই ধিক্কারের হাত থেকে বাঁচতে হলে বর্তমান মুহূর্তেই অবহিত হতে হবে। সর্বোদয় কর্মীরা বলেছেন সত্যকে জানতে, তার সম্মুখীন হতে, তার জন্যে অনুতাপ করতে। তাকে অস্বীকার করে বা ধামাচাপা দিয়ে পরিত্রাণ নেই। তাকে পাকিস্তানের অন্যায়ের দোহাই দিয়ে চুনকাম করেও নিস্তার নেই। ভয়ঙ্কর তার পরিণাম।

আমার বিচারে তাঁরা যদি চুপ করে থাকতেন তা হলে সেইটেই হতো অভারতীয় ও অমানবিক। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে চুপ করে থাকতেন না। কথাও বলতেন, কথার সঙ্গে মিলিয়ে কাজও করতেন। তার কমে তিনি শান্ত হতেন না। তাঁর কাছে বাইরের অশান্তি কিছু নয়। ভিতরের অশান্তিই আসল। দুটো একটা খুচরো খুনজখম নয়, পাইকারী হারে প্রত্যেকটি অপরাধ পাকিস্তানের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে করা হচ্ছে দেখলে তিনি অন্তরের অশান্তিতে অস্থির হয়ে বলতেন, মা ধরণী, দ্বিধা হও।

বিশ বাইশ বছর আগে আমার মনে দৃঢ় ধারণা জন্মায় যে ইংরেজদের চলে যাওয়ার পর একদিন না একদিন গৃহযুদ্ধ বাধবে। জানতুম না যে আমাদের নেতারা হঠাৎ দেশভাগে রাজী হয়ে গিয়ে গৃহযুদ্ধ এড়াবেন। কিন্তু গৃহযুদ্ধের ভবী অত সহজে ভোলে না। তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়, কিন্তু চিরকালের মতো নয়। সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটে গেল সেসবও একপ্রকার গৃহযুদ্ধ। এক রাউণ্ড গৃহযুদ্ধ। সৈনিকে সৈনিকে হলে বীরোচিত হতো, তা না হয়ে যা হয়েছে তা বর্বরোচিত। এর মধ্যে এইটুকুই গৌরবের যে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রিশ জনের উপর মুসলমান তাঁদের অসহায় প্রতিবেশীদের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে স্বধর্মীর হাতে নিহত হয়েছেন। এদিকেও অন্তত একজন হিন্দু প্রাণ দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছেন। এঁরাই এই যুদ্ধের বীর। এঁদের সঙ্গে এপারের এক বেলজিয়ান পাদ্রীর উল্লেখ করতে হয়। খ্রীস্টের মতো ইনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। আরো দুটি একটি খ্রীস্টান ধার্মিকের খোঁজ পাওয়া যায়নি ওপারে।

গৃহযুদ্ধ যে এইবারেই শেষ হয়ে গেল তা নয়। কাশ্মীরে আবার গোলযোগ বাধলে পূর্ব পাকিস্তানেও আবার দাঙ্গা বাধতে পারে। তার প্রতিক্রিয়ায় ভারতের কোনো কোনো রাজ্যেও আবার হাঙ্গামা বাধতে পারে। তখন আবার আমাদের বিবেকের পরীক্ষা হবে। এই দুষ্ট বৃত্ত থেকে উদ্ধার কোথায়? সেই পরিমাণ অহিংসা যে নেই। সর্বোদয়কর্মীরাও হালে পানী পাচ্ছেন না। আমি কোন্ ছার! যখন গৃহযুদ্ধের দুঃস্বপ্ন দেখেছিলুম তখন সেটা ছিল সৈনিকে সৈনিকে। জানতুম না যে সৈনিকদের লড়তে না পাঠিয়ে গুণ্ডাদের দেওয়া হবে নারী ও শিশুর সঙ্গে লড়তে। বলপরীক্ষা যদি অনিবার্য হয় তবে সৈনিকে সৈনিকে হোক। গুণ্ডায় গুণ্ডায় হোক। কিন্তু এ ভাবে কেন!

বিষাদসিন্ধু

কিছুদিন আগে পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে, পাকিস্তান তার সংখ্যালঘুদের তাড়িয়ে দিতে চায়, পূর্বপাকিস্তানকেও পশ্চিমপাকিস্তানের মতো হিন্দুশূন্য করতে চায়। ঠিক এই জিনিসটি আমাদের লোকবিনিময়বাদীদেরও অন্তরের প্রার্থনা। পূর্ববঙ্গ হিন্দুশূন্য হলেই এঁরা নিঃশঙ্ক হন। পশ্চিমবঙ্গ মুসলিমশূন্য হলে তো সোনায় সোহাগা। ষোল বছর ধরে এঁদের সঙ্গে তর্ক করতে করতে আমি ক্লান্ত। এই সেদিনও লোকবিনিময়ের বিরুদ্ধে লিখেছি। কিন্তু এই ক'দিনের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া দূরে থাক আটকে রাখা হচ্ছে। যেখানে দশ লাখ হিন্দুর চলে আসার কথা সেখানে এক লাখও আসতে পারে কি না সন্দেহ। পালাচ্ছে খ্রীস্টানরা। আসামের দিকে। তাদের পথেও কাঁটা দেওয়া হবে। পাকিস্তান লোকবিনিময় চায় না। সে সর্বতোভাবে দ্বার রোধ করবে।

এমনি একটা ব্যাপার ঘটেছিল জার্মানীতে। পূর্ব জার্মানী ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে। পূর্ব বার্লিন ও পশ্চিম বার্লিনের মধ্যে। দেশ ভাগ ও নগর ভাগ হয়ে যাবার পর দেখা গেল, মানুষ ক্রমাগত পূর্ব থেকে পশ্চিমে ছুটেছে। কেউ চায় নিরাপত্তা, কেউ চায় স্বাধীনতা, কেউ চায় আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলন, কেউ চায় অধিক স্বাচ্ছন্দ্য। লোকে লোকারণ্য হলো পশ্চিম জার্মানী ও পশ্চিম বার্লিন। শেষে পূর্ব জার্মানীর টনক নড়ল। সে সব দরজা বন্ধ করে দিল। বার্লিন শহরের দরজা অত সহজে বন্ধ করা যায় না। একদিন তাও হলো। আঁকাবাঁকা প্রাচীর উঠল বার্লিনের মাঝখান দিয়ে। নদীতে প্রাচীর দেওয়া যায় না। প্রাচীরের স্থান নিয়েছে নৌকার সার। পাহারা দিচ্ছে সশস্ত্র সিপাহী। পার হতে গেছ কি মরেছ। সেটা এমন একটা দৃশ্য যে চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। আমরাও সেই অভিমুখে চলেছি। লোকবিনিময় বন্ধ না হলে পাকিস্তান সরকারও প্রাচীর তুলবে, জলপথে পাহারা বসাবে। ওধার থেকে একটি মশাও আসতে পারবে না, এধার থেকে একটি মাছিও যেতে পারবে না। অবশ্য পাশপোর্ট ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকবে।

মনটা অশান্ত হয় যখন ওপারের হিন্দু ও খ্রীস্টানদের দশা অনুমান করি।

আমরা না পারি সেখানে যেতে, না পারি সেখান থেকে কাউকে বার করে নিয়ে আসতে, শুধু রকমারি ফরমায়েস করতে পারি নিজেদের সরকারের কাছে। যেন এই সরকার সর্বশক্তিমান। ভেবে দেখিনি যে পূর্ব জার্মানীর পিছনে যেমন সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব পাকিস্তানের পিছনে তেমনি সেন্টো, সীয়াটো, চীন। পাকিস্তান নামক একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে দেবার সময় বোঝা উচিত ছিল যে, পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। আর সংখ্যালঘু সমস্যাটা যে-কোন রাষ্ট্রেরই ঘরোয়া সমস্যা। শুধু পাকিস্থানের নয়। সংখ্যালঘুকে যদি ওরা তড়িয়ে দেয় তবে তাদের আশ্রয় দেবার দায় আমাদের, সুতরাং তা নিয়ে নালিশ করার অধিকারও আমাদের। কিন্তু যদি চারিদিকে দেয়াল তুলে বন্দী করে রাখে তা হলে আমরা হস্তক্ষেপ করতে যাই কোন্ অধিকারে? আন্তর্জাতিক আইন কি এক রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের জন্যে অপর রাষ্ট্রের দায়িত্ব সমর্থন করে? ভারত যদি দায়িত্ব দাবী করে পাকিস্তান আরো দায়িত্বহীনের মতো ব্যবহার করবে। এ দায়িত্ব এক ও অবিভাজ্য। দুই বা দ্বিভাজ্য নয়। ভারত দায়ী হলে পাকিস্তান দায়ী নয়। পাকিস্তান দায়ী হলে ভারত দায়ী নয়। ওরা যে পাকিস্তানী নাগরিক এটাই মুখ্য। ওরা যে হিন্দু বা খ্রীস্টান এটা গৌণ।

হিটলারী আমলের কথা আশা করি ভুলে যাননি। জার্মানীতে লাখ-ছয়েক ইহুদী ছিল। তারা সেখানকার সংখ্যালঘু জার্মান নাগরিক। তাদের জন্যে দায়িত্ব কার? জার্মানীর না ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকার? এসব দেশের ইহুদীরা এমন হৈ চৈ বাধিয়ে দিল যে মনে হলো ওটা জার্মানীর ঘরোয়া ব্যাপার নয়, ওতে বাইরের হস্তক্ষেপ চলে। হিটলারেরও রাগ বেড়ে যায়, ঘরের ইহুদীরা অপরাধ করছে বলে নয়, বাইরের ইহুদীরা অপরাপর রাষ্ট্রকে হস্তক্ষেপ করতে প্রবর্তনা দিচ্ছে বলে। মহাত্মা গান্ধী সেসময় ইহুদীদের সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন। ইহুদীরা অহিংস প্রতিরোধ করে জেলে যেত, প্রাণে মরত, কিন্তু জার্মানদের হৃদয় গলত, অন্তঃপরিবর্তন হতো। অধিকাংশ জার্মান তাদের পক্ষে দাঁড়ালে সেটা হতো নতুন একটা জিনিস। সেটাকে বাইরের হস্তক্ষেপ মনে করে আগুন হওয়া চলত না। যে দায়িত্বটা সৎ জার্মানদের, যেটা জার্মান রাষ্ট্রের, সেটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে বাইরের ইহুদী ও তাদের মিত্ররা পারলেন কি হিটলারের হাত থেকে জার্মানীর ইহুদীদের বাঁচাতে?

আরো ভয়ের কথা আমাদের এদিকেই একদল ফাসিস্ট দেখা দিয়েছে।

এরা যদি পারে তো এখানকার গণেশকেই ওলটাবে। আর নয়তো গণেশকে সাক্ষীগোপাল করে সংখ্যালঘুদের উপর সুদে আসলে শোধ তুলবে। সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান বলতে এরা বোঝে দাবাখেলায় দু'পক্ষের বোড়েগুলো মেরে নিকাশ করা। এই আসুরিক সমাধানের পিছনেও এক প্রকার লজিক আছে। এরা মাথাওয়ালা লোক। গুণ্ডা কিম্বা পাগল নয়। উত্তেজনাপ্রবণ ছেলেছোকরাও নয়। আমরা যদি এদের নিরস্ত করতে না পারি তবে এক অনর্থের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আরেক অনর্থ ঘটবে। অনর্থের প্রতিযোগিতায় যেই জিতুক না কেন, মোট হতাহতের সংখ্যা বাঙালী জাতিকে ভারতে ও পাকিস্তানে দুর্বলতম করে রাখবে।

"মোদের গরব মোদের আশা আ মরি বাংলা ভাষা।" আমার একমাত্র ভরসা এখন বাংলাভাষার ঐক্য, সুতরাং বঙ্গভাষীর ঐক্য। বাঙালী হিন্দু মুসলমান সর্বপ্রথমে বাঙালী তারপরে হিন্দু বা মুসলমান। এই সত্য আজ যদি আত্মপ্রকাশ না করে তবে কবে করবে? সময় কোথায়? দেশ ভাগের পর থেকে আমার ভাঙা হৃদয়কে আমি এই বলে সান্ত্বনা দিয়ে এসেছি যে, বাঙালী যদি একজাতি হয়ে থাকে তবে সে সত্য একদিন সূর্যের আলোর মতো ফুটে বেরোবে, পার্টিশন তাকে আড়াল করতে পারবে না। দেশ ভাগ হয়েছে, বেশ। কিন্তু জাতি তো ভাগ হয়ে যায়নি। জনগণ তো ভাগ হয়ে যায়নি। দেশ ভাগ হয়তো একদিন রদ করতে পারা যাবে, কিন্তু জাতি যদি ভাগ হয়ে থাকে, জনগণ যদি ভাগ হয়ে থাকে, তবে আর রদ-বদল নেই। তৃতীয় পক্ষ সে কাজ করে দিয়ে যায়নি, আমরাই বা কেন করতে যাই? তা হলে মিথ্যে এতকাল বলে এসেছি যে হিন্দু মুসলমানের বিবাদ তৃতীয় পক্ষের সৃষ্টি।

না, সবটা দোষ নন্দঘোষের নয়। ব্রিটিশ সরকারের নয়। আমাদেরও দোষ ছিল। কিন্তু সেসব কথার চর্বিত চর্বণ করে আজ আর সময় নষ্ট করব না। আগেই তো বলেছি, সময় কোথায়? ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক এখন যতদূর সম্ভব তিক্ত। ভারত বা পাকিস্তান যদি বুদ্ধির দোষে বা অধৈর্য হয়ে একটা ভুল চাল চালে তা হলে পরে চাল ফিরিয়ে নিতে পারবে না। সর্বনাশ হয়ে যাবে। পাকিস্তান আমাদের প্ররোচনা দিলেও আমরা তাকে প্ররোচনা দেব না। "কাশ্মীর" "কাশ্মীর" করে সে এখন হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। কখন কাকে কামড়ায় তার ঠিক নেই। তার মনের বাসনা এই যে কোনো এক তৃতীয় পক্ষ এসে কাশ্মীরটা তাকে পাইয়ে দেয়। তৃতীয় পক্ষকে আর

আমাদের বিশ্বাস নেই। তা হলে এ অচল অবস্থার অবসান হবে কী করে? যুদ্ধবিগ্রহে? না সংখ্যালঘু নিধনে? কোনটাই আমাদের কাম্য নয়। আক্রান্ত না হলে আমরা যুদ্ধে নামব না। প্ররোচিত হলেও আমরা সংখ্যালঘুর অনিষ্ট করব না।

তা হলে এ অচল অবস্থার অবসান হবে কী করে? হবে কী করে? কাতর হয়ে প্রশ্ন করি ইতিহাসবিধাতাকে। উত্তর পাই, হবে একভাবে না একভাবে। পাকিস্তান যদি ভারতের সঙ্গে সারসরি কথা বলতে রাজী হয় তা হলে দু'পক্ষের যাবতীয় বিরোধ আলাপ আলোচনা ও আদান-প্রদানের দ্বারা নিষ্পত্তি হবে। তা যদি না হয় তবে গণতন্ত্রের দাবীতে পূর্ব-পাকিস্তান পৃথক হয়ে যাবে ও ভারতের সঙ্গে পৃথকভাবে নিষ্পত্তি করবে। নিষ্পত্তির জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান অপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান পারে না। তার আর্থিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। প্রাচীর তুললে তার নিজের ক্ষতি হবে। তার স্বার্থ ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা।

উপরে আমি ধরে নিয়েছি যে পৃথক না হলে গণতন্ত্র হবার নয়। পূর্ব-পাকিস্তানীদের বিশ্বাস, ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে গণতন্ত্র খাপ খেতে পারে। জিন্নাসাহেবেরও সে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল গোঁজামিল চলে না। গণতন্ত্র শুধু ভোটাধিকার বা প্রত্যক্ষ নির্বাচন নয়। তার পেছনে আছে এক জীবনদর্শন। মানবিকবাদ। হিন্দুত্ব বা ইসলাম বা খ্রীস্টধর্ম নিয়ে যদি মানুষ সন্তুষ্ট থাকত তা হলে মানব বিবর্তন সেইখানে শেষ হয়ে যেত। সেই শেষ নয়। তাই মানবিকবাদের উদয় হয়। মানবিকবাদ মানব থেকে আরম্ভ করে, ঈশ্বর থেকে আরম্ভ করে না। পাকিস্তানের সংবিধান যা করেছে। আয়ুব খান্ তার কতখানি রেখেছেন, জানিনে। কিন্তু তার গোড়া যদি সেই রকমই থাকে তবে তার গোড়াশুদ্ধ তুলে ফেলতে হবে। নইলে গণতন্ত্র গজাবে না। আবার গজাবে প্রচ্ছন্ন স্বৈরতন্ত্র। পূর্বপাকিস্তানের গণতন্ত্রীরা ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করবেন যে, ইসলামী রাষ্ট্রের ভিতরে সত্যিকার গণতন্ত্র সম্ভব নয়। সেকুলার রাষ্ট্রই তাঁদের প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধান রচনার সুযোগ দিতে পারে। এর জন্যে চাই সংগ্রাম। সে সংগ্রাম অহিংস হতে পারে।

গণতন্ত্র যেদিন জীবন-মরণের প্রশ্ন হবে, পূর্ববঙ্গ সেদিন ইসলামী রাষ্ট্রের মোহ কাটিয়ে গণতন্ত্র লাভ করবে। নয়তো গণতন্ত্র তার কপালে নেই। তাকে ওই "বেসিক ডেমোক্রেসী" নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সে সন্তোষ মরণ

সমান। আমার মনে হয় না যে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক চেতনা বেশীদিন ও-জিনিস সহ্য করবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া এক কথা, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়া আরেক কথা। পশ্চিমবঙ্গ ইতিমধ্যে ভারতীয় ইউনিয়নের অঙ্গরাজ্য হয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়নের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে তার লেশমাত্র ইচ্ছা নেই। সে গণতন্ত্র লাভ করেছে। সেদিক থেকে সে ভাগ্যবান। ভারত সরকারের উপর অসন্তোষ থাকতে পারে, কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের উপর অসন্তোষ নেই। ওর চেয়ে সন্তোষজনক সংবিধান কারো কল্পনায় নেই। তাই পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান ছাড়লেও পশ্চিমবঙ্গ ভারত ছাড়বে না। পূর্ববঙ্গ যদি পাকিস্তান ছেড়ে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে চায় তা হলে অবশ্য একই ইউনিয়নের দুই অঙ্গরাজ্য হিসাবে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ আবার এক হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমি তার সম্ভাবনা দেখিনে।

উপরে আমি বলেছি যে বাঙালী হিন্দু মুসলমান সর্বপ্রথমে বাঙালী। এটা সত্য, কিন্তু এর চেয়ে আরো বড় সত্য ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেবার পর থেকে আমরা যারা যোগ দিয়েছি তারা সর্ব প্রথমে ভারতীয়। ষোল বছর আগে যদি গান্ধী, শরৎচন্দ্র বসু ও সুহরাবর্দির পরামর্শে বাংলাদেশ অবিভক্ত থেকে তৃতীয় এক রাষ্ট্র গঠন করত তা হলে আমরা সকলেই সর্বপ্রথমে বাঙালী বলে পরিচয় দিতুম। এখন আমরা যারা ভারতীয় ইউনিয়নের সামিল হয়েছি তারা সর্বপ্রথমে ভারতীয় বলে পরিচয় দিই। পূর্ববঙ্গের মুসলমান কি কোন দিন এ ভাবে পরিচয় দিতে প্রস্তুত হবে? আমি তার সম্ভাবনা দেখিনে। তবে তার জন্যে দ্বার খোলা রইল।

ষোল বছর আগে সব বাঙালীর মন ছিল ঐককেন্দ্রিক। সেই কেন্দ্রটির নাম কলকাতা। ইতিমধ্যে বাঙালী জাতির মন দ্বিকেন্দ্রিক হয়ে গেছে। দ্বিতীয় কেন্দ্রটির নাম ঢাকা। অধিকাংশ বঙ্গভাষী এখন ঢাকাকেন্দ্রিক। অল্পাংশ এখনো কলকাতাকেন্দ্রিক। ঢাকা যে কেবল পূর্ব বাংলার রাজধানী তাই নয়, সে এখন পাকিস্তানের দ্বিতীয় রাজধানী। অনেকে আশা করেছেন সে একদিন প্রথম রাজধানী হবে। যুক্তবঙ্গ কি কোনদিন ঢাকাকেন্দ্রিক হবে? অধিকাংশ বঙ্গভাষী কি কোনদিন কলকাতাকেন্দ্রিক হবে? এই ষোল বছরে একটা কেন্দ্রদ্বৈধ ঘটে গেছে। সেটার মূলে কি কেবল ধর্ম? আঞ্চলিকতা নয়? জার্মান জাতি যে ভিয়েনাকেন্দ্রিক থেকে বার্লিনকেন্দ্রিক তথা ভিয়েনাকেন্দ্রিক

হলো তার কারণ কি কেবল ক্যাথলিক বনাম প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মমত? জাতির জীবনে ধর্ম ব্যতীত আরো একটা শক্তিও সক্রিয়। তাকে বলতে পারি আঞ্চলিকতা। পূর্ববঙ্গ বরাবরই একটু পৃথক। কলকাতা তার স্বাভাবিক কেন্দ্র নয়। কলকাতার গৌরব বেড়ে যায় সে যখন সারা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়। এখন তার সে গৌরব অস্ত গেছে। এখন বরং ঢাকা হয়ে উঠেছে সারা পাকিস্তানের রাজধানী। তার গৌরব এখন উদয়ের পথে।

আমরা কলকাতায় বসে ঐক্যবদ্ধ বাঙালী জাতির নিয়তি নির্দেশ করব, আর সকলে সে নির্দেশ মেনে নেবে, এ কি কখনও সম্ভব? আমার তো মনে হয় না যে, কলকাতার নেতৃত্ব অধিকাংশ বাঙালী আর কোনো দিন স্বীকার করবে। দিল্লী সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। পূর্ব বাংলার মন দিল্লীর থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। তবে সরে গিয়ে করাচীতে বা রাওয়ালপিণ্ডিতে আশ্রয় পেয়েছে বলা চলে না। সে ওই ঢাকাতেই আশ্রয় রচনা করতে চায়। পাকিস্তান যদি লক্ষণ দেখে ঢাকাতেই তার রাজধানী স্থানান্তরিত করে তা হলে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব বাংলার দাবী আর উঠবে না। তবে অমন কিছু নিকট ভবিষ্যতে সম্ভবপর নয়। কারণ পাকিস্তানের সামরিক কেন্দ্র রাওয়ালপিণ্ডি। সেটা কাশ্মীরের নাকের কাছে। সেখানে বা তার সংলগ্ন ইসলামাবাদে বসে এক চোখ সৈন্যদলের উপরে ও আরেক চোখ কাশ্মীরের উপর রাখাই আয়ুব খানের বিশেষ কাজ। যেমন ইংরেজ বড়লাট ও জঙ্গীলাটের বিশেষ কাজ ছিল সিমলায় বসে আফগানিস্তান ও রাশিয়ার উপর নজর রাখা।

আমরা কলকাতাকেন্দ্রিক পশ্চিমবঙ্গে বাস করে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে একটা ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছি। ঢাকা-কেন্দ্রিক পূর্বপাকিস্তানে সেই ধারাবাহিকতা ছিন্ন হয়েছে। অথচ নতুন কোনো ধারাবাহিকতা ধরাছোঁয়া দিচ্ছে না। মানুষের মন এমনিতেই দিশেহারা। ইসলামকে অবলম্বন করে যা হয়েছে তা তো গণতন্ত্রের অন্তর্ধান। লোকে যদি গণতন্ত্রকে অবলম্বন করে একটা স্থিতি পায় তা হলে তার থেকে উদ্ভব হবে নূতন শৃঙ্খলার। নয়তো নিরুপায় হয়ে একদিন কমিউনিস্ট হয়ে যাবে। তখন আর হিটলারী আমল নয়, স্টালিনী আমল।

আমার এই পত্র-প্রবন্ধে পূর্ববঙ্গকে জার্মানীর সঙ্গে ও সেখানকার শাসনকে নাৎসী শাসনের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তুলনা বোধহয় ঠিক হয়নি।

হিন্দুরাও ইহুদী নয়। আয়ুব খানও হিটলার নন। আর ওই যে সব দরজা বন্ধ করে দেওয়া ওটাও সাময়িক একটা ব্যাপার। ওটা না করলে ওপার থেকে লাখে লাখে শরণার্থী পালিয়ে আসত। তার ফলে ওপারের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হতো, মুসলমানের পক্ষে তো হতোই। তা ছাড়া লক্ষ লক্ষ লোক চলে এলে লক্ষ লক্ষ লোকের চলে যাবার জন্যেও চাপ দেওয়া হতো। ভারত বা পশ্চিমবঙ্গ সরকার দিতেন না। দিত বেসরকারী জনমত।

প্রাচীর উঠবে না। নাট্সী শাসন জোর পাবে না। তাকে সংশোধন করার চেষ্টা ভিতর থেকেই হবে। ওখানকার সংবাদপত্রগুলি সেই চেষ্টার সাক্ষী। তাদের আমি সাধুবাদ দিই। সফল তারা হবেই। আর ছাত্ররা? তারা জিতবেই। সব শ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই মনুষ্যত্বের জয় হবে। আমীর হোসেন চৌধুরী প্রভৃতির আত্মদান ব্যর্থ হবে না।

পদভোট

ইউরোপ থেকে ন্যাশনালিজম নামক তত্ত্ব উনবিংশ শতাব্দীতে আমদানী হয়। হিন্দুরাই সর্ব প্রথমে ইংরেজী শিক্ষা পেয়ে বলতে আরম্ভ করেন, "আমরা হিন্দুরা একটি নেশন।" পরে শোনা গেল ইংরেজী শিক্ষা লাভ করে মুসলমানরাও বলছেন, "আমরা মুসলমানরা একটি নেশন।" আরো পরে বোঝা গেল যে ধর্ম অনুসারে বা সম্প্রদায় অনুসারে নেশন হয় না, নেশন হয় দেশ অনুসারে। দেশ যখন একটাই তখন হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই ভারতীয়। ভারতীয়রা একটা নেশন। ইংরেজরাও এটা মেনে নেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজদের চোখে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ঠেকে। বলতে গেলে কোনো কোনো ইংরেজই তার উদ্যোক্তা।

মুসলমানরা একটা সম্প্রদায় না একটা নেশন এই তর্কের উত্তরে সার সৈয়দ আহমদ বলেন, "হিন্দু ও মুসলমান ভারতমাতার দুটি চক্ষু। তারা এক একটি নেশন নয়।" অথচ সার সৈয়দ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান অনুচিত মনে করেন। মুসলমানদের যেটা প্রাপ্য সেটা তাঁরা ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করে পাবেন না। পাবেন ইংরেজের সঙ্গে সহযোগিতা করে। অবশ্য কংগ্রেসও গোড়ার দিকে ঝগড়া করতে চায়নি। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় যে ইংরেজরা তার পক্ষে ছিলেন তাঁরাই তার উপর ক্রমে বিরূপ হন। কংগ্রেসের দাবীগুলোকে খাটো করার আর কোন উপায় না পেয়ে তাঁরা বলতে আরম্ভ করেন, "কংগ্রেসই ভারতবর্ষের একমাত্র মুখপাত্র নয়। কই, কংগ্রেসে মুসলমান কোথায়?"

কংগ্রেসে মুসলমান অল্পই ছিলেন। সার সৈয়দের পরামর্শে তাঁরা স্বতন্ত্রপন্থী। দেশ তাঁদের কাছে বড় কথা নয়। সম্প্রদায়ই বড় কথা। তাঁদের অনেকের বক্তব্য হলো, "দেশ স্বাধীন হলে তো হিন্দুরাই সর্বেসর্বা হবে। ওরা কি আমাদের বখরা দেবে? আমরা তখন যে তিমিরে সেই তিমিরে। খামখা ইংরেজের সঙ্গে ঝগড়া করতে যাই কেন? তার চেয়ে ইংরেজের কাছ থেকে আমাদের বখরা বুঝে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। হিন্দুরা যদি লড়তে চায় লড়ুক। আমরা দর্শক মাত্র। কিন্তু ওরা যদি কিছু আদায় করে আমরাও ভাগ বসাব।"

পরে মুসলিম লীগ বলে স্বতন্ত্র একটা প্রতিষ্ঠান গঠিত হলে ইংরেজরা সেটাকে কংগ্রেসের সমান মর্যাদা দেন ও তাকে দিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবী হাজির করিয়ে সে দাবী মঞ্জুর করেন। ইংরেজের উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসের শিবির থেকে সরিয়ে নেওয়া। তা হলে আর কংগ্রেস বলতে পারবে না যে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সব ভারতবাসীর সে প্রতিনিধি। কংগ্রেস যদি স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি অগ্রাহ্য করত তা হলে সত্যি সত্যি মুসলিমশূন্য হতো। সেটা সে করেনি। তার ফলে কতক মুসলমান কংগ্রেসেই রয়ে গেলেন। তাঁদের চেষ্টায় মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসের একটা সমঝোতা হয়। এই স্থির হয় যে মুসলিম লীগ শুধু মুসলিম সম্প্রদায়ের ব্যাপারে কথা বলবে আর কংগ্রেস কথা বলবে ভারতবর্ষের ব্যাপারে। একই ব্যক্তি উভয় দলের সদস্য হতে পারবেন। যেমন জিন্না সাহেব। সমঝোতার প্রধান উদ্যোক্তা তিনি। তখনকার দিনে তিনি অগ্রগণ্য ইণ্ডিয়ান ন্যাশনালিস্ট। অথচ মুসলিম লীগেরও একজন রথী।

এর পরে কংগ্রেসের গান্ধীনেতৃত্ব শুরু হলে মুসলমানরা দলে দলে কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হন। ইংরেজের তা দেখে চক্ষুস্থির। কী করে মুসলমানদের কংগ্রেসের শিবির থেকে সরিয়ে নেওয়া যায়? এর উত্তর কমিউনাল এওয়ার্ড। কংগ্রেস যদি ওটাকে সরাসরি খারিজ করত তা হলে মুসলমানশূন্য হতো। কংগ্রেসের পলিসি হলো "না গ্রহণ, না বর্জন"। দেখা গেল স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি সত্ত্বেও বহু প্রদেশে কংগ্রেসী মুসলমানরা লীগপন্থী মুসলমানদের হারিয়ে দিয়েছেন ও কংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছেন। ইংরেজের চাল ব্যর্থ হলো। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের সেই যে শত্রুতা শুরু হলো তা মোটেই মিটল না। জিন্না সাহেব ইতিমধ্যে কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন। তিনিই হয়ে দাঁড়ালেন প্রধান শত্রু। গোড়ায় তাঁর অভিপ্রায় ছিল আর একবার কংগ্রেস লীগ সমঝোতা ঘটাবেন। কিন্তু এবার তাঁর শর্ত হলো লীগকেই মুসলিমদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে মেনে নিতে হবে। তার মানে লীগই সব ক'টা মুসলিম আসন পাবে, কংগ্রেস একটাও পাবে না। কংগ্রেসী মুসলিমরা বাধ্য হয়ে কংগ্রেস থেকে সরে যাবেন। তখন কংগ্রেস হবে মুসলিমশূন্য হিন্দু প্রতিষ্ঠান। তখন আর সে বলতে পারবে না যে সে ধর্মনির্বিশেষে ভারতের জনগণের প্রতিনিধি। প্রকারান্তরে ইংরেজের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। জিন্নার শর্ত মেনে নেওয়া মানে ইংরেজকে তার খেলায় জিতিয়ে

দেওয়া। কংগ্রেস কখনো এতে রাজী হতে পারে না। ফলে মুসলিম লীগের সঙ্গে পূর্ব সম্পর্ক ছিন্ন হলো। মুসলিম লীগ বহু মুসলমানকে কংগ্রেস থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে গেল।

এর পরের নির্বাচনে মুসলিম লীগের জিগীর হলো, পাকিস্তান চাই। মুসলমানরা এক নেশন, হিন্দুরা এক নেশন, মুসলমানদের জন্যে পাকিস্তান, হিন্দুদের জন্যে হিন্দুস্থান, দুই জাতি, দুই দেশ, দুই রাষ্ট্র, দুই কেন্দ্রীয় সরকার। এটা এমন এক বাদশাহী প্রলোভন যে মুসলমান ভোটদাতারা লীগ প্রার্থীকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিতিয়ে দিল। কংগ্রেসের পক্ষে যাঁরা রইলেন তাঁরা মুষ্টিমেয়। তাঁদের হাতে তখনো উত্তরপশ্চিম সীমান্ত সরকার।

কংগ্রেসের সন্তান জিন্না কংগ্রেসকে নির্মুসলমান না করে ছাড়বেন না। পরশুরাম যেমন সমাজকে নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। সমঝোতার সব সম্ভাবনা যখন তিরোহিত হলো তখন শত্রুতাটা আর নির্বাচনক্ষেত্রে বা আইনসভায় নিবদ্ধ রইল না। দেখা গেল মাঠে ময়দানে রাস্তায় ঘাটে হাটে বাজারে রেলগাড়ীতে মানুষ মানুষকে খুন করছে, জখম করছে, ধর্ষণ করছে, ঘরে ঢুকে লুট করছে, ঘরে আগুন দিচ্ছে। ধরে নিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। এ এক আজব লড়াই। মাথার উপরে লীগ সরকার বা কংগ্রেস সরকার। আরো উপরে ইংরেজ। তা সত্ত্বেও কেউ নিরাপদ নয়।

কংগ্রেস যদি নির্মুসলমান হতে রাজী হতো তা হলে লীগের সঙ্গে সমঝোতা হয়তো বা সম্ভব হতো। তখন কোয়ালিশন হতো। পার্টিশন দরকার হতো না। কিন্তু তা হলে আর কংগ্রেস বলতে পারত না যে সে ভারতবর্ষ নামক দেশের ধর্মনির্বিশেষে প্রতিনিধি। কংগ্রেসের কাছে এটা নিঃশ্বাসবায়ুর মতো। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিত্ব হারালে তার সংগ্রামটাই ব্যর্থ হতো। আর মুসলিম লীগ যদি হয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একমাত্র প্রতিনিধি তা হলে কংগ্রেসও হয়ে দাঁড়ায় একটা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। ভারতীয়রা তা হলে একটা জাতি নয়, কতকগুলো সম্প্রদায়ের সমষ্টি। ইতিমধ্যে মুসলিম লীগ ধুয়ো ধরেছিল যে মুসলমানেরা একাই একটা নেশন। শুধু তাই নয়, হিন্দুরাও একটা নেশন। ভারতবর্ষ দু'ভাগ করে মুসলিম নেশনকে পাকিস্তান ও হিন্দু নেশনকে হিন্দুস্থান দিতে হবে। মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা করলে দুই-নেশনতত্ত্ব মেনে নিতে হতো।

কংগ্রেসের সংগ্রামটা ইংরেজ সরকারের সঙ্গে। মুসলিম লীগের সঙ্গে নয়। মুসলিম লীগের সংগ্রামটা কংগ্রেসের সঙ্গে। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে নয়। কিন্তু ঘটনার গতি যেদিকে যাচ্ছিল সেদিকে যেতে দিলে দেখা যেত ইংরেজের সঙ্গে কেউ সংগ্রাম করছে না, ইংরেজ সাক্ষীগোপাল। সংগ্রাম চলেছে কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের এবং সেটা দিন দিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের। ওটাকে চলতে দিলে একটিও মুসলমান কংগ্রেসে থাকত না আর মুসলমানেরা সবাই লীগের পক্ষ নিত। কংগ্রেস হতো হিন্দু নেশনের মুখপাত্র। লীগ হতো মুসলিম নেশনের মুখপাত্র। সেই অবস্থায় পৌঁছানোর আগেই কংগ্রেস পার্টিশন মেনে নেয়। কিন্তু হিন্দু নেশনের মুখপাত্র হিসাবে নয়। পার্টিশন হচ্ছে দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। তার একটির নাম হিন্দুস্থান নয়, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন, যাতে পাকিস্তানও একদিন যোগ দিতে পারে। সেটা সেকুলার স্টেট, সুতরাং কে হিন্দু কে মুসলমান তা সে গণনার মধ্যে আনে না। মুসলিমপ্রধান কাশ্মীরও তার অঙ্গীভূত হতে পারে। খ্রীস্টানপ্রধান নাগাল্যাণ্ডও। ইণ্ডিয়ান যারা সবাই সেখানে স্বাগত। হিন্দু বলে কারো কোন বিশেষ দাবী নেই। হিন্দু রাষ্ট্র হলে নেপালকেও কোলে টানত। মুসলিম নেশন যেমন কাশ্মীর দাবী করছে হিন্দু নেশন তেমনি নেপাল দাবী করত। ভারতীয় নেশন হিন্দু নেশন নয়। সব হিন্দুর এখানে স্থান নেই। যারা মাইগ্রেট করে চলে আসবে তাদের কথা আলাদা।

ভারতীয় ইউনিয়ন হচ্ছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্প্রসারণ। কংগ্রেসে যতদিন সব ধর্মের লোক থাকবে ভারতেও ততদিন সব সম্প্রদায়ের লোক থাকবে। কাউকেই তাড়িয়ে দেওয়া, সরিয়ে দেওয়া, ফিরিয়ে দেওয়া চলবে না, যদি না সে আইনের বিচারে ভারতে বাস করার অযোগ্য হয়। আইন নিজের হাতে নিয়ে কেউ যে কাউকে ভারতের মাটি থেকে উচ্ছেদ করবে এটা একটা দণ্ডনীয় অপরাধ। হাজার হাজার লোক যদি এই অপরাধে অপরাধী হয়, অথচ তাদের অপরাধের জন্যে দণ্ডিত না হয় তা হলে বুঝতে হবে যে ভারতীয় ইউনিয়নের দণ্ডশক্তি দুর্বল। রাজদণ্ড দুর্বল হলে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে।

অপর পক্ষে পাকিস্তান হচ্ছে মুসলিম লীগের সম্প্রসারণ। মুসলিম লীগে মুসলিম ভিন্ন আর কারো স্থান নেই। সুতরাং পাকিস্তানে মুসলিম ভিন্ন আর কেউ প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হতে পারে না। মুসলিম নেশন বা ইসলামিক

স্টেট কোনোটাই হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টানদের জন্যে নয়। অথচ কলমের এক খোঁচায় দু'কোটির উপর মানুষকে এলিয়েন (alien) বলে ঘোষণা করা যায় না। জিন্না সাহেব দয়া করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় পতাকায় তাদের জন্যে একাংশ শ্বেতবর্ণে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু যে রাষ্ট্র সোজাসুজি দুই-নেশনতত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত সে রাষ্ট্রে বাস করা যেন পরের মর্জির উপর নির্ভর করে পরের জমি চাষ করা। পশ্চিম পাকিস্তানের হিন্দু শিখরা ভিটেমাটির মায়া কাটিয়ে একযোগে ও এককালে বিদায় নেয়। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা কিন্তু কোনো দিনই এ বিষয়ে একমত ছিল না। এখনো নয়। তাই পূর্ব পাকিস্তান থেকে এই সতেরো বছরে যত লোক এসেছে তার দু'গুণ লোক সেখানে রয়ে গেছে।

চলে আসা বা থেকে যাওয়া কোনোটাই কোনোকালে অস্বাভাবিক ছিল না। চিরকালই পূর্ব বাংলার লোক পশ্চিম বাংলায় এসেছে, পশ্চিম বাংলার লোক পূর্ব বাংলায় গেছে। কিন্তু দেশ ভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে দেখা যাচ্ছে স্বাভাবিক চলাচল বন্ধ, তার বদলে ঘটে যাচ্ছে একপ্রকার লোক বিনিময়। হাঁ, বিনিময়, কারণ এদিক থেকেও কতক লোক শরণার্থী হয়ে ওদিকে যাচ্ছে। তাদের কথা খবরের কাগজে লেখে না। সেইজন্য আমরা ধরে নিই যে ট্র্যাফিকটা ওয়ান-ওয়ে।

এতদিন এসব আমাদের গা-সওয়া হয়ে গেছল, কিন্তু এবারকার ব্যাপার অন্যরূপ। এবার মনে হচ্ছে যারা চলে আসছে তারা পা দিয়ে ভোট দিয়ে আসছে। এটা একপ্রকার পদভোট। তারা যেন বলে আসছে যে, পাকিস্তান যদি শুধু মুসলমানদের হোমল্যাণ্ড হয়ে থাকে তবে অন্যান্যরা সেখানে প্রক্ষিপ্ত। অন্যান্যরা মানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান। এবার এটা আর হিন্দু মুসলিম সমস্যা নয়। পাকিস্তান অতি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়মাত্রেই অবাঞ্ছিত। যেহেতু পাকিস্তান হচ্ছে মুসলিম নেশন তথা ইসলামিক স্টেট। এই পদভোট শুধু নিরাপত্তার জন্যে নয়। এবার একটা হেস্ত নেস্ত চাই। শেষবারের মতো জানা চাই পাকিস্তান কি মুসলিম নেশনের হোমল্যাণ্ড না মিশ্র নেশনের মাতৃভূমি? পাকিস্তান যদি মিশ্র নেশনের মাতৃভূমি হয় তবে ইসলামিক স্টেট হয় কী করে? তবে কি মুসলমানরাই আসল নেশন, আর সকলে জিম্মি? পাকিস্তান যদি ধর্ম অনুসারে নেশন হতে চায় তা হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে অন্য ধর্মের লোক

সমস্তক্ষণ পালাই পালাই করবে ও কোথাও একটা কিছু ঘটলে অমনি দৌড় দেবে। হয় দেশ অনুসারে নেশন হতে হবে, নয় সংখ্যালঘুদের আশা ছাড়তে হবে।

এই দুর্যোগ পাকিস্তানী মুসলমানদের মনঃস্থির করতে সাহায্য করবে। ইসলামিক স্টেট যেকালের ও যেদেশের আদর্শ সেকালে ও সেদেশে জিম্মি বলা হতো সুধু ইহুদী ও খ্রীস্টানদের, মূর্তিপূজকরা জিম্মি হওয়ারও অযোগ্য। তাদের জন্যে ব্যবস্থা ধর্মান্তরীকরণ কিংবা বিতাড়ন কিংবা সরাসরি কোতল। ভারতের মাটিতে মুসলমান সুলতানরাও বিশুদ্ধ ইসলামী রাষ্ট্র প্রবর্তন করতে সাহস পাননি। পাকিস্তানীদের স্পর্ধা দেখে অবাক হতে হয়। এঁদের মতিগতি দেখে মনে হয় না যে ইতিহাস থেকে এঁরা কিছু শিখেছেন। ঘড়ির কাঁটাকে তের শ' বছর পেছিয়ে দেওয়া যায় না। দেশটাকেও আরব্য উপন্যাসের ম্যাজিক কার্পেটে করে আরব সাগর পার করিয়ে আরব দেশে নিয়ে যাওয়া যায় না। এই উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্যে নিজস্ব একটা স্থান চাই বলে সাত শ' বছরের ঐতিহাসিক বিবর্তনকে চোখ বুজে অস্বীকার করা যায় না। বিবর্তনসূত্রে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান একখানি শাড়ীর নানা রঙের সুতোর মতো বোনা হয়ে গেছে। শাড়ীখানিকে কেটে দু'খানি করা যায়, কিন্তু একরঙা করতে গেলে শাড়ীর শাড়ীত্ব থাকে না। পাকিস্তান শুধু মুসলমানের দেশ নয়, সকলের দেশ। পাকিস্তান শুধু মুসলমানদের নেশন নয়। সকলের নেশন। পাকিস্তান ইসমালিক স্টেট হলে মুসলমান ভিন্ন আর-কেউ সেখানে টিকতে পারবে না। আর-সকলের থাকাটাই যদি কাম্য হয় তবে সেকুলার স্টেট পত্তন করতে হবে।

পাকিস্তানীরা তাদের দুর্মতির জন্যে গণতন্ত্র হারিয়েছে। পাকিস্তান এখন গণতন্ত্রের গোরস্থান। সেই গোরস্থান যাঁরা মানবিকতার চেরাগ জ্বালিয়ে রেখেছেন, যাঁরা তার জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের উপরেই নির্ভর করছে পাকিস্তানের ঐতিহাসিক বিবর্তন। সে বিবর্তন ভারতের মতো পাকিস্তানেও প্রতিষ্ঠা করবে সেকুলার স্টেট। সেকুলার স্টেট ডিঙিয়ে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী সফল হয় না। তাই জিন্নার মতো পরম অভিজ্ঞ পার্লামেণ্টারিয়ানের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। গণতন্ত্রকে যাঁরা পুনরুজ্জীবিত করতে চান তাঁদের প্রথম কাজ হবে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রীস্টান নির্বিশেষে সব রকম লোকের জন্যে, সব রকম লোকের দ্বারা, সব রকম লোকের পার্টি

গঠন। পরে পার্লামেণ্ট গঠন। আরো পরে গবর্ণমেণ্ট গঠন। বলা বাহুল্য তার উপযুক্ত সংবিধান রচন। দেশ বিভক্ত করেও যারা ক্ষান্ত হয়নি, জনগণকেও বিভক্ত রাখতে চায় ও তাদের একভাগের স্বার্থে অন্যান্য ভাগের উপর বাদশাহী করতে চায় তারা গণতন্ত্রীই নয়, তাদের সুবিধার জন্যে গণতন্ত্রের পুনরুজ্জীবন গণতন্ত্রকে আবার কবরে পাঠাবার প্রস্তাব। বাদশাহীই যদি হবে তো আয়ুবশাহী নয় কেন? জনগণ এক ও অবিভাজ্য। এ শিক্ষা পাকিস্তানে বাকী আছে।

পাকিস্তানের মূঢ় ধারণা যে এ জগতে ভারত ভিন্ন তার আর কোনো শত্রু নেই আর হিন্দু যদিবা পাকিস্তানে থাকবে তবু পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করবে না। পাকিস্তানের পরীক্ষার দিন কি আসবে না? নিশ্চয় আসবে। একচক্ষু হরিণকে আঘাত করবে ভারত ভিন্ন অপর এক শক্তি। সেদিন পাকিস্তানী হিন্দুর দুর্বলতা পাকিস্তানেরও দুর্বলতা। ওপারের হিন্দুকে বা এপারের মুসলমানকে মেরে ভয় দেখিয়ে ডিমরালাইজ করা মানে নিজ নিজ নেশনকেই ডিমরালাইজ করা। পাকিস্তান বেশী দূর দেখতে পায় না। অদূরদর্শী জননায়কদের হটিয়ে দিয়ে তার মসনদে বসেছেন অদূরদর্শী সেনানায়ক। তা বলে গান্ধী নেহেরুর দেশ কি দেখতে পাচ্ছে না যে আন্তর্জাতিক বলপরীক্ষার দিন মাজা ভাঙা মুসলমান তার হয়ে লড়তে পারবে না, ফেরারী মুসলমানকে ডাক দিলে ফিরে পাওয়া যাবে না? লড়াই কি শুধু রণক্ষেত্রে হয়? লড়াই হয় ধানক্ষেতে, যেখানে খাদ্য উৎপাদন হয়। লড়াই হয় তাঁতঘরে আর ওয়ার্কশপে আর কারখানায়, যেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী উৎপন্ন হয়। মুসলমান না থাকলে লড়াই জোর পাবে না আর সে যদি ভগ্নমনোবল হয় তবে তো লড়াই কমজোরী হয়। ভারতের মুসলমানকে সমান অধিকার দিয়ে ভারতে রাখতে হবে। যাকে রাখ সেই রাখে। ভারতের মুসলমানকে আজ অভয় দিতে হবে। তার ধন মান প্রাণ রক্ষা করতে হবে।

নববর্ষের কামনা

যেসব দাবী দেশভাগের আগে সমর্থন বা সহানুভূতির যোগ্য ছিল সেসব দাবী এখন দেশভাগের সতেরো বছর পরে তামাদি হয়ে গেছে। সেসব দাবী তুলে কারো কোনো লাভ নেই। অকারণে স্বপ্ন দেখা। যারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন তাঁদের আমি পূর্বেই সাবধান করে দিয়েছিলুম যে ওতে সংখ্যালঘু মুসলমানের সমস্যা মিটবে না। পাকিস্তান সংখ্যাগুরু মুসলমানের পক্ষে ভালো কি না সে বিষয়েও আমার সংশয় ছিল ও আছে। কিন্তু সব মুসলমানের পক্ষে যে ভালো নয় তা তো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ভালো যদি হতো তবে সব মুসলমানই সেখানে গিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করত। ভারতে সংখ্যালঘু মুসলমানই থাকত না। সুতরাং তাদের কোনো সমস্যাই থাকত না। সেই সব পুরাতন দাবী এতকাল পরে আবার উঠত না।

দেশভাগের আগের অবস্থায় ফিরে যেতে পারলে এসব দাবী নিশ্চয় বিবেচনা করা যেত। হিন্দু মুসলমানে এক সঙ্গে বসে ফয়সালাও করা যেত। আমি তো বরাবর সেই আশাই পোষণ করেছিলুম। সংখ্যালঘু মুসলমানকে বঞ্চিত করে সংখ্যাগুরু হিন্দু সব কিছু ভোগ করবে এর নাম স্বরাজ নয়। এর নাম স্বরাজ হলে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, খান্ আবদুল গফ্ফর খান্ প্রভৃতি ধর্মনিষ্ঠ মুসলমান কখনো কংগ্রেসে যোগ দিতেন না। আর গান্ধীজীর মতো ধর্মনিষ্ঠ হিন্দু কখনো এরকম স্বরাজের জন্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন না। প্রথম থেকেই সকলে জানতেন যে দেশ অখণ্ড থাকবে ও অখণ্ড দেশের ভিত্তিতে তৃতীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে দেশের লোক পরস্পরের দাবী মিটিয়ে দিয়ে পরস্পরকে চিরকালের জন্যে কাছে টেনে নেবে।

সে স্বপ্ন ১৯৪৭ সালে ভেঙে গেছে। সে ভাঙনের জের এখনো মেটেনি। এখনো পশ্চিম পাকিস্তানের এক কোটির মতো হিন্দু শিখ তাদের পাঁচ হাজার বছরের পুরাতন বাসভূমি থেকে উৎপাটিত। কেউ তাদের একবার একটু সহানুভূতির সঙ্গে ডেকে বলছে না যে, যা হবার তা হয়ে গেছে, তোমরা ফিরে এসো, আবার একসঙ্গে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে মিশে বাস করা যাবে। তেমনি পূর্ব পাকিস্তানের পঞ্চাশ লক্ষের মতো হিন্দু বৌদ্ধ খ্রীস্টান তাদের আদিকালের বাসভূমি থেকে বিতাড়িত। বেসরকারী সহানুভূতির অভাব নেই, এটা আশার

কথা। কিন্তু সরকারী আশ্বাসে আস্থা থাকলে এত বেশী লোক পালিয়ে আসত না। তাদের আশঙ্কা আবার দাঙ্গা বাধবে। একই কারণে এদিক থেকেও বহু মুসলমান ওদিকে চলে গেছে। তারা তাদের পূর্বপুরুষের বাসভূমি থেকে উৎপাটিত বা বিতাড়িত। তাদেরও মোট সংখ্যা সমগ্র পাকিস্তানের হিসাবে এক আধ কোটি হবে। এর পরেও এক দল সাম্প্রদায়িক হিন্দু জেদ ধরেছে যে পুরোপুরি লোক বিনিময় চাই। তা হলে নাকি পাকিস্তানের হিন্দুরা বরাবরের মতো নিরাপদ হবে। এদিকের মুসলমানরাও ওদিকে গিয়ে চিরকালের মতো নিরাপদ হবে। আর কোন সমস্যাও থাকবে না, দাবীদাও-য়াও থাকবে না। মাথা নেই আর মাথাব্যথা।

ভারত যদি সেকুলার স্টেট না হতো, কংগ্রেসে যদি মুসলমান খ্রীস্টান প্রভৃতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক না থাকতেন, শাসনভার যদি কংগ্রেসের হাতে না থাকত তা হলে লোকবিনিময় এতদিনে চরমে উঠে থাকত। কংগ্রেসের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেলে, সাম্প্রদায়িক দলগুলির হাতে শাসনভার পড়লে সেকুলার স্টেট উঠে গিয়ে হিন্দুরাষ্ট্র প্রবর্তিত হলে লোকবিনিময় অবশ্যম্ভাবী। গান্ধী নেহরু নেই, এখন যাঁরা আছেন তাঁরাও বুড়ো হয়ে একে একে বিদায় নেবেন। তাঁদের পরে কী হবে তা কি একবার কেউ ভেবে দেখেছেন? পাকিস্তানের হিন্দুরা যদি সেখানে টিকতে না পারে তাদের চলে আসায় সঙ্গে সঙ্গে এখানকার মুসলমানদেরও চলে যাওয়ার হিড়িক পড়ে যাবে। কংগ্রেসের অবর্তমানে ঠেকাবে কে? সেকুলার স্টেটের অভাবে দায়িত্ব নেবে কে?

আমার ধারণা ছিল হিন্দু মুসলমানের বিরোধ গোটা কতক চাকরি বাকরি নিয়ে, গোহত্যা ও মসজিদের সামনে বাজনা নিয়ে। একসঙ্গে বসলে উভয়ের গ্রহণযোগ্য একটা মীমাংসা অবশ্যই পাওয়া যাবে। কিন্তু ঝগড়া এখন যেখানে গিয়ে পৌঁছেছে সেখানে ফয়সালা অত সহজ নয়। মুসলমান বা হিন্দু সমষ্টিকে দেয়াল তুলে দু'ভাগ করা যায় না। যেমন গঙ্গা বা ব্রহ্মপুত্রকে বাঁধ দিয়ে দু'ভাগ করা যায় না। লোক বিনিময় সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অন্যায়। আরো লোক বিনিময় না করে বরং বিপরীতটাই করতে হবে। সবাইকে ডাক দিয়ে বলতে হবে, ভাই, ভুলে যাও, ক্ষমা কর, ফিরে এস। আবার আমরা মিলে মিশে বাস করব। তোমরা যদি না থাক আমরা একা কখনো সুখী হতে পারব না। তোমাদের মঙ্গলেই আমাদের মঙ্গল।

হিন্দুর মঙ্গল আর মুসলমানের মঙ্গল বলে দুটো আলাদা মঙ্গল নেই।

একের অমঙ্গলে অপরের মঙ্গল নয়। ভাগ বাঁটোয়ারা করতে করতে আমরা মূল সত্যটা ভুলে যাচ্ছি যে মঙ্গল আমাদের এক ও অবিভাজ্য। দাঙ্গাহাঙ্গামা করতে করতে বর্বর হয়ে যাচ্ছি, রাক্ষস হয়ে যাচ্ছি, সত্যিকার বীরত্বের ও সাধুত্বের অযোগ্য হয়ে উঠছি। গোটা কতক অস্ত্র বেশী হলেই বল বাড়ে না। বল বাড়ে সব নাগরিক পরস্পরকে বিশ্বাস করলে, পরস্পরের হাত ধরলে। দেশ দু'ভাগ হয়েছে। সেটা রদ করবার দরকার নেই। কিন্তু যাদের বাড়ী ঘর পাকিস্তানে পড়েছে তারা যেন সংখ্যালঘু বলে সর্বহারা না হয়। তেমনি যাদের বাড়ী ঘর ভারতে পড়েছে তারা যেন সংখ্যালঘু বলে সর্বস্বান্ত না হয়। দাঙ্গাহাঙ্গামার অধ্যায় বরাবরের মতো শেষ হোক। চোখের জল মুছিয়ে দেবার অধ্যায় শুরু হোক। রক্তের দাগ ধুয়ে ফেলা হোক। দাবী আদায়ের এসব পন্থা বর্জন করা হোক। ভারত পাকিস্তানের নেতাদের গোল টেবিল বৈঠক বসুক। গোলযোগ আপোসে মিটুক। নববর্ষে এই আমার কামনা।

স্ববিরোধ

সাম্প্রদায়িক সমস্যা এক এক দেশে এক এক ভাবে মিটেছে। ইংলণ্ড রাতারাতি ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টাণ্ট বনে যায়। ক্যাথলিক সংখ্যালঘুদের সম্পূর্ণরূপে দমন করে। ফ্রান্স ক্যাথলিক থেকে প্রোটেস্টাণ্ট বনতে বনতে বনে না, প্রোটেস্টাণ্টদের নির্মমভাব বধ কিংবা বিতাড়ন করে। জার্মানী ত্রিশ বছর সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে জড়িত থেকে তার থেকে মুক্ত হয় এই শর্তে যে কতকগুলো রাজ্য ক্যাথলিকদের দখলে থাকবে, কতকগুলো থাকবে প্রোটেস্টাণ্টদের দখলে। আর উভয়ের মাথার উপরে থাকবেন সম্রাট, তিনি ক্যাথলিক, কিন্তু তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। নেদারল্যাণ্ডস্ তো সোজাসুজি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। প্রোটেস্টাণ্টদের হলাণ্ড, ক্যাথলিকদের বেলজিয়াম।

দেখছি আমরাও বেলজিয়াম হলাণ্ডের মতো দুই রাষ্ট্রের নাগরিক হয়েছি। যারা এপারে সংখ্যাগুরু তারা ওপারে সংখ্যালঘু। তেমনি যারা ওপারে সংখ্যাগুরু তারা এপারে সংখ্যালঘু। কিন্তু হলাণ্ড-বেলজিয়ামের সঙ্গে মস্ত বড়ো একটা প্রভেদ আছে। রাষ্ট্রের চরিত্র হিন্দুরাষ্ট্র নয়। এটা হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান বৌদ্ধ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের আপনার রাষ্ট্র। এখানে কারো সংখ্যা বেশী, কারো সংখ্যা কম। কিন্তু অধিকার তা বলে বেশী কম নয়। সকলেই সমান অধিকারী। হিন্দুরা ইচ্ছা করলেই এটাকে হিন্দুস্থান বানাতে পারত, এর সংবিধানে হিন্দুদেরই অগ্রাধিকার দিত, আর সকলে পড়ে থাকত দ্বিতীয় শ্রেণীতে। সেটা করা হয়নি। না করার কারণ ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম যারা করেছিল তারা হিন্দু হিসাবে করেনি, করেছিল ভারতীয় হিসাবে সম্প্রদায়-নির্বিশেষে৷ সংগ্রামের শেষে তারা তাদের সংগ্রামী ঐক্যের ঐতিহ্যকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে চায়নি, দেশ যদিও দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। ভারতীয় ইউনিয়ন আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটসের মতো সেকুলার স্টেট।

অপর পক্ষে পাকিস্তান একটি ইসলামিক স্টেট। ইসলামী আদর্শ ত্যাগ করলে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মাঝখানে কোনো যোগসূত্র থাকে না। সুতরাং সেখানকার রাজনীতি ধর্মগত বিভেদকে জীইয়ে রেখেছে ও রাখবে। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে কাশ্মীর হাতে পেলেই পাকিস্তান তার ধর্মমূলক রাজনীতি ভুলে গিয়ে সেকুলার রাজনীতি অবলম্বন করবে তবে তিনি ঐ

যোগসূত্রটিকে রক্ষা করবেন কী উপায়ে? এইখানেই স্ববিরোধ। পাকিস্তান যদি সেকুলার হয় তবে আর একসূত্রে গ্রথিত থাকে না। সেকুলার যদি না হয় তবে কাশ্মীর হাতে পেলে সে কাশ্মীরের সেকুলার ঐতিহ্য নাশ করবে, সেখানে ধর্মমূলক রাজনীতি প্রবর্তন করবে। সেখানকার হিন্দু শিখ দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হবে কিংবা পলায়নের দ্বারা আত্মরক্ষা করবে।

পাকিস্তানের ঐক্য পাকিস্তানীদের কাছে নিশ্চয়ই খুব প্রিয়। যেমন ভারতের ঐক্য ভারতীয়দের কাছে। পাকিস্তানের ঐক্য খণ্ডিত হোক এটা আমাদেরও কাম্য নয়। কারণ ভারতবর্ষের বলকানীকরণ কারো পক্ষে কল্যাণকর নয়। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলে নানা দেশের চক্রান্তবাজদের খর্পরে পড়বে। যেমন কাশ্মীর স্বাধীন হলে নানা দেশের চক্রান্তবাজদের খর্পরে পড়ত। ভারত পাকিস্তান এই দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রই যথেষ্ট। আর সংখ্যা বাড়িয়ে কাজ নেই। অথচ পাকিস্তান যদি সেকুলার রাজনীতি অবলম্বন না করে তবে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তার সম্পর্কের উন্নতি সুদূরপরাহত। কেউ যদি মনে করে থাকেন যে সেকুলার ভারত ও ইসলামী পাকিস্তান মনের সুখে বাস করবে ও বাস করতে দেবে তবে তিনি পরে নিরাশ হবেন। লক্ষ লক্ষ হিন্দু শিখ কখনো তাদের পূর্বপুরুষের ভিটামাটি ও সম্পত্তির মায়া কাটাতে পারবে না। তেমনি লক্ষ লক্ষ মুসলমান। শরণার্থী সমস্যার স্থায়ী সমাধান যার যার নিজের জায়গায় প্রত্যাবর্তন ও সসম্মানে পুনর্বাসন। আর সব সমাধান সাময়িক। ইতিহাসে সতেরো আঠারো বছর কিছুই নয়। একদিন না একদিন শরণার্থীদের স্বস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবেই। কিন্তু ধর্মমূলক রাজনীতি থাকতে তা অসম্ভব। তা হলে কি বুঝতে হবে যে ধর্মমূলক রাজনীতি যাবে, পাকিস্তান সেকুলার স্টেট হবে, পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে ভারতের সঙ্গে কনফেডারেশন গঠন করবে?

কাশ্মীর প্রসঙ্গে

অন্যের তৈরি বিবৃতিতে স্বাক্ষর যোগ করা আমার রীতি নয়। বন্ধুদের অনুরোধে সেদিন রাউরকেলা ও জামশেদপুরের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি উপলক্ষে যে বিবৃতিটিতে স্বাক্ষর যোগ করি তার উদ্যোক্তারা সকলেই সর্বোদয় কর্মী। তার থেকে এরকম একটা ধারণা জন্মাতে পারে যে আমিও তাঁদের একজন। তাতে এমন কিছু এসে যেত না, কিন্তু পরে দেখা গেল কাশ্মীর নিয়ে সর্বোদয়কর্মীদের কয়েকজন বিশেষ একপ্রকার সমাধানের উদ্যোগ করছেন ও শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁদেরকেও ছাড়িয়ে গেছেন। এর থেকে যদি কেউ মনে করেন যে আমিও তাঁদের সঙ্গে একমত তা হলে আমার উপর অবিচার করবেন।

গণতন্ত্রে কেউ কারো হাত পা বেঁধে রাখতে পারে না। স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার যে কোনো ব্যক্তির আছে। জয়প্রকাশ যা ভালো মনে করেন তা করতে গেলে তাঁকে বাধা দেওয়া উচিত নয়। সকলে সব বিষয়ে একমত হতে বাধ্য এটা ডিকটেটরশিপের দাবী। গণতন্ত্র নানা বিচিত্র মতামতের বিরোধ ও সমন্বয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। রায়ের পক্ষে অধিকাংশ লোক বলে প্রত্যেকে তার ব্যক্তিসত্তা বিসর্জন দেবে এর নাম গণতন্ত্র নয়। এটাও এক রকম আজ্ঞাতন্ত্র।

জয়প্রকাশের অন্তরের ইচ্ছা পাকিস্তানের সঙ্গে একটা সম্মানজনক মিট-মাট। মিটমাটের প্রধান অন্তরায় তাঁর মতে কাশ্মীর। পাকিস্তানীরাও এই কথা বলেন। অর্থাৎ আগে কাশ্মীর, তার পরে অন্য কথা।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, এ নিয়ে তর্ক করতে করতে দশ বিশ বছর কেটে যায়। তবু কেউ কারো পোজিশন ছাড়ে না। রাশিয়া বলছে, আগে বার্লিন। আমেরিকা বলছে, না। বছরের পর বছর গড়িয়ে যাচ্ছে। মিটমাট হচ্ছে না। যে কোনো দিন মহাযুদ্ধ বেধে যেতে পারত। এখনো বাধেনি। তেমনি লাল চীন বলছে, আগে ফরমোজা, আমেরিকা বলছে, না। বছরের পর বছর বয়ে যাচ্ছে। মিটমাটের নামগন্ধ নেই। যে কোনো দিন মহাযুদ্ধ বেধে যেতে পারে।

আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে, এ নিয়ে তর্কের হেতু

নিশ্চয় আছে। রাশিয়া বা লাল চীন বা আমেরিকা কেউ অনর্থক তর্ক করছে না। অকারণে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকছে না। তবে এটাও ঠিক যে যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে কেউ অধীর নয়। লাল চীনও না। এটা ধৈর্যের খেলা।

ভারত ও পাকিস্তান বলে দুটো 'জাতি' যখন সৃষ্টি হয়েছে তখন কাশ্মীর নিয়ে কলহটা আন্তর্জতিক পর্যায়ের ব্যাপার। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতির যা কেতা তাই খাটবে। কোন্‌টা আগে, কোন্‌টা পরে এ নিয়ে তর্ক অনন্তকাল চলবে। যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত থাকারও অন্ত নেই। তা বলে যুদ্ধের জন্যে অধীর হলেও চলবে না। পাকিস্তান যদি যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে চায় নিতে পারে। এটাও ধৈর্যের খেলা।

তা হলে কাশ্মীর সমস্যার মিটমাটের জন্যে এই ব্যাকুলতা কেন? এটা কি জয়প্রকাশের মতো আদর্শবাদীদের হৃদয়দৌর্বল্য? না, এর পিছনে মার্কিনী চাল আছে? এটা কি ভারতের স্বার্থে নয়, বিদেশীদের স্বার্থে?

ব্যাপারটা অত সরল নয়। কারণ ব্যাপারটা বিশুদ্ধ আন্তর্জাতিক নয়। পাকিস্তানীরা আইনের দৃষ্টিতে 'এলিয়েন' হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিতে আমাদেরি ভাই। আমরাও তাদের। তাই যদি না হতো তবে গান্ধীজী কেন জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত 'একজাতি তত্ত্বে' বিশ্বাস করতেন ও বিশ্বাস অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে প্রাণ দিতেন? 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' একটা মিথ্যা। ইতিহাসের বিবর্তন ওকে কবে অতিক্রম করেছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওর পুনরাবর্তন একটা পরিহাস। একটা করুণ পরিহাস। একদিন না একদিন পাকিস্তানীদের অন্তরের পরিবর্তন হবে। ওরাও মানবে যে ওরা আর আমরা দুই জাতি নই এক জাতি। রাষ্ট্র আলাদা হতে পারে, কিন্তু হিন্দু মুসলমান খ্রীস্টান শিখ নির্বিশেষে সব ভারতীয় যেমন একজাতি, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান বৌদ্ধ নির্বিশেষে সব পাকিস্তানী তেমনি একজাতি। তাই যদি হয় তবে সব ভারতীয় ও সব পাকিস্তানী মিলে একজাতি।

এইটেই বৃহত্তর ও চিরস্থায়ী সত্য। এই সত্যের অনুরোধে সমস্তক্ষণ মিটমাটের চেষ্টা করতে হবে। গান্ধীজী বেঁচে থাকলে ব্যক্তিগত দায়িত্বে পাকিস্তানে যেতেন ও মিটমাটের জন্যে আপ্রাণ করতেন। তাঁর সেই অসমাপ্ত কাজ যদি আর কেউ মাথায় তুলে নেন তবে তাঁকে সন্দেহ করাটাই অন্যায়। বড়জোর এইটুকু বলতে পারা যায় যে সম্মানজনক মিটমাট আমরাও চাই, কিন্তু কাশ্মীরই প্রধান বা প্রথম অন্তরায় নয়। কাশ্মীর আগে নয়। দুই পক্ষের নেতারা

বৈঠকে বসুন, তৃতীয় পক্ষকে বাদ দিন, কাশ্মীর প্রভৃতি যাবতীয় বিরোধের ফয়সালা একই সঙ্গে করুন, সন্ধিপত্র একটাই হোক। বরাবরের মতো। কুকুরের ল্যাজ একটু একটু করে কাটার মতো আজ কাশ্মীর, পাচ বছর পরে আসাম, দশ বছর পরে করিডর, পনেরো বছর পরে স্বতন্ত্র নির্বাচন, এ রকম যেন না হয়। নয়তো কাশ্মীর নিয়ে এখন যা হচ্ছে আসাম নিয়ে পরে তা হবে, সেখানেও দাঁড়ি টানা যাবে না।

সবক'টা বিরোধের এককালীন নিষ্পত্তি যদি কোন দিন হয় তবে ১৫ই আগস্টের মতো সেও হবে চিরকাল মনে রাখবার মতো সুদিন। সেদিন আমরা সবাই মিলে কোলাকুলি করব। অতীতের ভ্রাতৃহত্যা ভুলে যাব ও ক্ষমা করব। দুটো রাষ্ট্র যেমন আছে তেমনি থাকবে, কিন্তু দুটো হাত যেমন মিলে মিশে কাজ করে তেমনি পরস্পরের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবে। সেদিন-কার সেই পরিবর্তিত পটভূমিকায় কাশ্মীর হবে না বিদেশীদের চক্রান্তের কেন্দ্র বা ঘাঁটি। সেখানকার সংবিধান হবে ধর্মনিরপেক্ষ বা সেকুলার। সেখানকার হিন্দু ও শিখদের অধিকার কোনো অংশে খর্ব হবে না। সেখানে যাতায়াত করা ও বাণিজ্য করা ভারতীয়মাত্রেরই পক্ষে স্বাভাবিক হবে। সেখানকার প্রতিরক্ষার উপর ভারতেরও কর্তৃত্ব থাকবে। বলা বাহুল্য কাশ্মীর বলতে গিলগিট প্রভৃতি পাকিস্তান অধিকৃত অঞ্চলও বোঝাবে।

মোটকথা, অবিভক্ত কাশ্মীরে পাকিস্তানীরা যেসব অধিকার পাবে ভারতীয়রাও সেইসব অধিকার পাবে। ভারতীয়রা যেসব অধিকার পাবে পাকিস্তানীরাও সেইসব অধিকার পাবে। সম্প্রদায় অনুসারে কাউকেই কোনো বিশেষ অধিকার দেওয়া হবে না। স্বতন্ত্র নির্বাচন বা নির্দিষ্টসংখ্যক চাকরি কোনো সম্প্রদায়কে ভোগ করতে দেওয়া হবে না। তবে কাশ্মীরের যারা স্থায়ী অধিবাসী তারা হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তাদের জন্যে যদি কিছু সংরক্ষণ করতে হয় তো সেটা নিয়ে কেউ কোন আপত্তি করবে না।

কাশ্মীর অবিকল পশ্চিমবঙ্গের বা মহারাষ্ট্রের মতো একটি 'রাজ্য' হবে এটা বাড়াবাড়ি। প্যারামাউন্ট পাওয়ার ভারত ত্যাগ করার সময় এই স্থির হয়েছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি ইচ্ছামতো ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেবে। যোগ দেবার অর্থ সেসময় ছিল তিন চারটি বড়ো বড়ো বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারকে ছেড়ে দিয়ে বাকী সব নিজের জন্যে রাখা। এই ব্যবস্থা অনুসারে ভারতভুক্ত দেশীয় রাজ্য হতো পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন।

পরবর্তীকালে অন্যান্য দেশীয় রাজ্যকে ব্রিটিশ শাসিত প্রদেশের সঙ্গে সমান করে দিয়ে সবাইকে 'স্টেট' আখ্যা দেওয়া হয়েছে বলে কাশ্মীরকেও তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে 'স্টেট' বলে বর্ণিত একটি বর্ণচোরা প্রদেশে পরিণত করা উচিত নয়। শেখ আবদুল্লার ভুলভ্রান্তি যাই ঘটে থাকুক তাঁর ব্যথা এইখানে যে কাশ্মীরকে তার প্রাপ্য ক্ষমতার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। মৈশুরকেও। মৈশুরের তাতে আপত্তি না থাকতে পারে, কাশ্মীরের আপত্তি আছে। অন্তত তাঁর মতো অনেকের আপত্তি আছে। এটা হিন্দু বনাম মুসলিম নয়। এটা কেন্দ্র বনাম দেশীয় রাজ্য। মৈশুরে যদি কংগ্রেস না হয়ে কমিউনিস্ট পার্টি প্রবল হতো সেখানেও এ প্রকার আপত্তি উঠত।

কোন্‌টা সত্যি সত্যি সাম্প্রদায়িক, কোন্‌টা আঞ্চলিক বা প্রান্তিক এ বিষয়ে পরিচ্ছন্ন চিন্তার অভাব। শেখ আবদুল্লা মুসলমান ও তাঁর অনুগামীরা প্রায় সবাই মুসলমান বলে তাঁর কেসটা কেঁচে যায় না। তিনি পাকিস্তানকে চটাতে চান না বলে তাঁর কেসটা পাকিস্তানের কেস হয়ে যায় না। কাশ্মীর পাকি-স্তানের সামিল হওয়া তাঁর পক্ষে বিভীষিকা। ভারত কাশ্মীরকে এখন পর্যন্ত প্রদেশে পরিণত করেনি। করলেও তার ক্ষমতা পূর্বপাকিস্তানের চেয়ে বেশী থাকবে। কিন্তু পাকিস্তান যদি একবার কাশ্মীর হাতে পায় তবে তাকে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মতো একটি কমিশনার শাসিত বিভাগে পর্যবসিত করবে। এখনো হাতে পায়নি বলে মিঠি মিঠি বুলি শোনাচ্ছে। তাতে আর যেই ভুলুক শেখ আবদুল্লা ভুলবেন না। পাকিস্তান যা চায় আর শেখ সাহেব যা চান তা একই জিনিস তো নয়ই, তা দুই স্বতন্ত্র ও পরস্পরবিরোধী বস্তু।

শেখ আবদুল্লাকে সন্তুষ্ট করবে তাঁর আদি ক্ষমতা। যে ক্ষমতা তাঁর ছিল ভারতভুক্তির অব্যবহিত পরে। কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ক্ষমতা। যে ক্ষমতা তাঁর ছিল পদচ্যুতির কিছুকাল পূর্বে। আয়ুব খানকে কাশ্মীর পাইয়ে দিয়ে তাঁর সে ক্ষমতা তিনি ফিরে পাবেন না। পরন্তু তাঁর দশা হবে খান আবদুল গফর খানের মতো। আয়ুব খানকে কাশ্মীর পাইয়ে দেওয়া মানে আপনাকে বঞ্চিত করা। কাশ্মীরী মুসলমানদেরই বা তাতে লাভ এমন কী হলো? গণতন্ত্রের অনেকখানি তারা ভোগ করছে। সেটা তো তারা হারাবে। আয়ুব কি তাদের গণতন্ত্রের দাবী মেটাবেন? আয়ুব অন্যান্য মুসলমানদের যে সংবিধান দিয়েছেন কাশ্মীরী মুসলমানদেরও সে সংবিধান দেবেন। তাতে পূর্বপাকিস্তানীরাই সন্তুষ্ট নয়। কাশ্মীরীরা হবে কী করে?

হিন্দুর জায়গায় পাঞ্জাবী মুসলমান গিয়ে বসবে। তাতে যদি সাধ মেটে তো আশ্চর্য হতে হবে।

সম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া আমাদের মূলনীতি নয়। মূলনীতি লঙ্ঘন করে যে মিটমাট তা ধোপে টিকবে না। মিটমাটের চেষ্টা চলছে, চলুক। বার বার ব্যর্থ হবে, বার বার আরম্ভ হবে। আমি পরাজয়বাদী নই। আমি স্বীকার করব না যে হিন্দু মুসলমানের মিটমাট বা ভারত পাকিস্তানের মিটমাট কস্মিনকালে হবার নয়। সবাই হাল ছেড়ে দিলেও আমি হাল ধরে থাকব। সাম্প্রদায়িকতা অন্যান্য দেশেও ছিল, এখনো আছে। মিটে গেছে বা মিটে যাচ্ছে। আধুনিক যুগের সঙ্গে যা খাপ খায় না তার পরমায়ু বড়জোর ত্রিশ চল্লিশ বছর। এই তো দেখছি মিশরের মুসলমানরা সাইপ্রাসের গ্রীক খ্রীস্টানদের পক্ষে, স্বধর্মী তুর্কদের বিপক্ষে। ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানরা মালয়েশিয়ার মুসলমানদের বিপক্ষে, ভিন্নধর্মী চীনাদের পক্ষে। ধর্মকে রাজনীতির মূলধন করে পাকিস্তানীরা কদ্দিন চালাবে!

'ক' অক্ষরের লড়াই

কী নিয়ে লড়াই ?

'ক' নিয়ে লড়াই।

পুরাণে লিখেছে পাঠশালায় গিয়ে প্রহ্লাদ 'ক' দেখে অজ্ঞান। তার মনে পড়ে 'ক' থেকে 'কৃষ্ণ' নাম। সে কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ করে। চোখের জল ফেলে। ভাবাবেশে মূর্চ্ছা যায়। তার পড়াশুনা আর এগোয় না। ক অক্ষরের পর খ অক্ষর আছে, গ অক্ষর আছে, ঘ অক্ষর আছে, কিন্তু ওকথা ওকে বোঝাবে কে ? ক অক্ষর হচ্ছে কৃষ্ণ নামের আদ্য অক্ষর। কৃষ্ণ নামের পর আর কী শেখবার আছে ? কৃষ্ণই মানবজ্ঞানের শেষ কথা।

ছেলেবেলায় আমরা ওয়ার্ড মেকিং খেলা খেলতুম। অক্ষর জুড়ে জুড়ে শব্দ বানাতুম। কিন্তু সেসব শব্দ ইংরেজী অভিধানের শব্দ। মনগড়া শব্দ নয়। কিন্তু একটু বেশী বয়সে এক পাঞ্জাবী ছাত্র একটি মনগড়া শব্দ বানিয়ে ফেললেন। 'পাকিস্তান'। ইংরেজী বর্ণমালার যেসব শব্দ জুড়ে জুড়ে এই কাল্পনিক শব্দটি হলো তার তৃতীয়টি হচ্ছে 'কে' অর্থাৎ 'ক'। কাশ্মীরের আদ্য অক্ষর। সেই থেকে পাকিস্তান নামক কল্পনার একটি অত্যাবশ্যক অঙ্গ হলো কাশ্মীর। কাশ্মীরকে বাদ দিলে পাকিস্তান হয়ে যায় 'পাইস্তান'। তা হলে পাকিস্তানের অধিবাসীরা আর নিজেদের 'পাক' অর্থাৎ পবিত্র বলে দাবী করতে হক্‌দার হয় না। তারা হয়ে যায় 'পাই'। দুর্বোধ্য শব্দ।

সত্যি সত্যি যে একদিন পাকিস্তান বলে একটি রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হবে এটা ইতিহাসের বিস্ময়। কিন্তু ইতিহাসে যে কেবল বিস্ময় জোগায় তাই নয়, কৌতুকও জোগায়। মানুষকে নিয়ে কৌতুক তো ইতিহাসদেবতার সবদিনের খেলা। পাকিস্তান মঞ্জুর হলো, অথচ কাশ্মীর তার সামিল হলো না। হলো কিনা বঙ্গের একাঙ্গ।

কিন্তু ওই যে ছাত্রটি ওয়ার্ড মেকিং খেলায় 'ক' অক্ষর ব্যবহার করেছেন ওটা তো আর ভোলা যায় না। বঙ্গের একাঙ্গ থাক আর নাই থাক, কাশ্মীর চাইই চাই। ওটা একটা অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কাশ্মীর বাদ গেলে পাকিস্তানের কেবল অঙ্গহানি নয়, ভাবহানি হয়। পাকিস্তানের পেছনে একটা ইডিওলজি আছে। তাতে বলে হিন্দু ও মুসলমান এক নেশন নয়। দুই নেশন। দুই

নেশনের দুই বাসভূমি। পাকিস্তান আর হিন্দুস্তান। কাশ্মীরের অধিকাংশ লোক যখন মুসলমান তখন কাশ্মীর কেমন করে হিন্দুস্তানে পড়বে? কাশ্মীর পড়বে পাকিস্তানে।

এখন এই ধরনের যুক্তি যদি সত্য হতো তা হলে নেশন তৈরি করা কত সহজ হয়ে যেত। নেপাল এসে যেতো ভারতে, যেহেতু সে হিন্দুপ্রধান। ভুটান চলে যেতো তিব্বতে, যেহেতু সে বৌদ্ধপ্রধান। আফগানিস্তান মিশে যেতো পাকিস্তানে, যেহেতু সে মুসলমানপ্রধান। পাকিস্তান যোগ দিত ইরান ইরাক তুরস্কের সঙ্গে, যেহেতু সে মুসলমানপ্রধান। এ যুক্তির সার্থকতা আমরা কোথাও দেখছিনে। দুই মুসলমানপ্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া এখন পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধরত। ইন্দোনেশিয়া নাকি পরমাণু বোমা নির্মাণ করছে সিঙ্গাপুর আর কুয়ালালামপুরের উপর ফেলবার জন্যে। তার মানে স্বধর্মী নিধনের জন্যে।

খ্রীস্টান দেশগুলির গত পঞ্চাশ বছরের ইতিহাস আমরা সকলেই জানি। খ্রীস্টান জার্মানীর পরম মিত্র হলো বৌদ্ধ জাপান, আর পরম শত্রু খ্রীস্টান ফ্রান্স, খ্রীস্টান ব্রিটেন। ওদিকে বৌদ্ধ জাপানের পরম শত্রু হলো বৌদ্ধ চীন, আর পরম মিত্র হলো খ্রীস্টান জার্মানী। এই বিচিত্র জগতে ধর্মের যুক্তিই একমাত্র যুক্তি নয়। ইউরোপের ইতিহাসের পাতা ওলটাতে গিয়ে দেখেছি ভিয়েনা যখন তুর্কদের আক্রমণের মুখে বিপন্ন, ভিয়েনা গেলে পশ্চিম ইউরোপ যায় যায়, সেরকম দিনেও তুর্কদের সঙ্গে তলে তলে হাত মিলিয়েছেন ফ্রান্সের রাজা। পরম ধার্মিক খ্রীস্টান। অস্ট্রিয়ার রাজশক্তি তাঁর চক্ষুশূল।

কাশ্মীর যে মুসলমানপ্রধান এবিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সিন্‌কিয়াংও তো মুসলমানপ্রধান। পাকিস্তান কেন চীনের কাছে সিন্‌কিয়াং দাবী করে না? পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্বপাকিস্তান যতদূর সিন্‌কিয়াং ততদূর নয়। আকাশপথে রাওলপিণ্ডি থেকে ঢাকা যেতে যত সময় লাগে কাশগড় যেতে তত সময় লাগে না। চট্টগ্রাম থেকে কুয়ালালামপুরও তো এমন কিছু বেশী দূর নয়। পাকিস্তান কেন মালয় দাবী করে না? পামীরের ওপারেই সোভিয়েট শাসিত বাদাকশান। ওটা দাবী করলে তো ইসলামী সংহতি আরো জোর পেতো।

আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন একটা উপাদেয় প্রশ্ন। কিন্তু কই, পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্বে তো আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্নে গণভোট নেওয়া হয়নি। গণভোট নিলে

বাংলাদেশের হিন্দু মুসলমান মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতিতেই দিত, স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতিতে নয়। মুসলিম লীগের বাইরে বহু মুসলমান ছিল, তারা পাকিস্তান চায়নি। পাকিস্তান হলে বঙ্গদেশ দ্বিখণ্ডিত হবে, একথা পরিষ্কার জানা থাকলে মুসলিম লীগের ভিতরে যারা ছিল তারাও দ্বিমত হতো। ইংরেজ রাজত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে অরাজকতার লক্ষণ, গৃহযুদ্ধের চেয়ে পার্টিশন ভালো, এই চিন্তার থেকে যে সিদ্ধান্তের উদ্ভব সেটার পেছনে ছিল ইংরেজ নামক একটি তৃতীয় পক্ষ, যে এতকাল শান্তিরক্ষা করেছিল, যার উপরে বরাত দিয়ে লোকে নিশ্চিন্ত ছিল। তৃতীয় পক্ষকে বাদ দিলে বাকী থাকে প্রথম ও দ্বিতীয় পক্ষ। সেই দুই পক্ষে একতা ছিল না বলেই এক এক পক্ষকে এক এক ভাগ দিয়ে শান্তির ব্যবস্থা করতে হলো।

কিন্তু ইংরেজ বিদায়ের পর তো আর সে পরিস্থিতি নেই। কাশ্মীরের উপর যদি পাকিস্তানের দাবী থাকে তো ভারতেরও দাবী আছে। ভারত এককালে সৈন্য পাঠিয়ে তাকে রক্ষা করেছে। এখনো করছে। কাশ্মীর মুসলমানপ্রধান বলে ভারতের দাবী অন্যায় বা অযৌক্তিক হয়ে যায় না। ভারত যদি হিন্দু রাষ্ট্র হতো তা হলে অবশ্য কথা উঠত যে কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর ভারতের কোনো নৈতিক দাবী নেই। কিন্তু ভারত একটি সেকুলার স্টেট। সকলের উপরই এর নৈতিক দাবী আছে। যেমন খ্রীস্টান প্রধান নাগাল্যাণ্ডের উপরে তেমনি বৌদ্ধপ্রধান নেফার উপরে, সিকিমের উপরে। পাকিস্তানীদের এ তত্ত্ব বোঝানো মুশকিল। কারণ তাদের ঐতিহ্যে সেকুলার স্টেট বলে কিছু নেই। তারা ভাবতেই পারে না কোনো একটা রাষ্ট্র সত্যি সত্যি সেকুলার হতে পারে। তাদের বিশ্বাস ভারতের ওটা একটা চাল। ভারত আসলে একটা হিন্দু রাষ্ট্র। সেকুলার বলে মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে। তাই যদি হতো তবে ওই ছলনাটার আরম্ভ ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্মদিন থেকে। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম, দাদাভাই, ডব্লিউ সি বনার্জি এঁরাও সেই ছলনার নাটের গুরু। ব্রিটিশ লেবার পাটির অধিকাংশ সদস্য খ্রীস্টান বলে ওটা ওর সেকুলার চারিত্র্য হারায় কি? লেবার শাসিত ইংলণ্ডও রাজনৈতিক ব্যাপারে তার সেকুলার প্রকৃতি থেকে ভ্রষ্ট হয় কি?

এই বিবাদের মূলে সত্যিকারের যুক্তি বলে একটিই আছে। সেটি কাশ্মীরের অ্যাকসেসনের সময় নেহরুর প্রতিশ্রুতি যে কাশ্মীরের অধিবাসীদের

গণভোট নিয়ে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হবে। কিন্তু এই প্রতিশ্রুতির সঙ্গে একটি অলিখিত শর্ত ছিল। কাশ্মীরীরা ধর্মের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে সেকুলার গণনার দ্বারা পরিচালিত হবে। অর্থাৎ মুসলমান বলেই পাকিস্তানে যাবে, এমন নয়। রাজনৈতিক হিতাহিত অর্থনৈতিক সুবিধা অসুবিধা বিচার করবে। কাশ্মীরী মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই সেণ্টো সীআটো প্রভৃতি শক্তি জোটে যোগ দেওয়া পছন্দ করে না। কেন তারা বহিঃশক্তির ক্রীড়নক হবে? অনেকে চীনের উপর প্রসন্ন নয়। কেন তারা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতিতে সায় দেবে? অনেকে গণতন্ত্র চায়, প্রত্যক্ষ নির্বাচন চায়, মিশ্র নির্বাচন চায়। কেন তারা পাকিস্তানের অগণতান্ত্রিক সংবিধান মেনে নেবে? সব দিক বিবেচনা করার মতো বিদ্যাবুদ্ধি যদি নাগরিকমাত্রের থাকত তা হলে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে ওরা সেকুলার রাষ্ট্রের পক্ষেই ভোট দিত। কিন্তু এমনভাবে ওদের ধর্মান্ধতা জাগিয়ে তোলা হবে যে ওরা চোখ বুজে ইসলামের পক্ষেই ভোট দেবে ও গণভোটের প্রকৃত উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করবে। আয়ুব খান্ বলেন যে পাকিস্তানীরা গণতন্ত্রের উপযুক্ত হয়নি, যখন হবে তখন গণতন্ত্র পাবে। তাই যদি হয় তবে কাশ্মীরীরা পাকিস্তানে যোগ দিলে গণতন্ত্র হারাবে। তা সত্ত্বেও যদি পাকিস্তানে যোগ দিতে চায় তবে বুঝতে হবে যে ওরা গণভোটের উপযুক্ত হয়নি। নেহরুর প্রতিশ্রুতির অলিখিত শর্ত পালন করবার সময় আসেনি। তার আগে পাকিস্তান গণতন্ত্রের উপযুক্ত হোক, বহিঃশক্তির শিবির থেকে বেরিয়ে আসুক, সেকুলার হোক।

গণভোট হলে কাশ্মীর যে পাকিস্তানের 'ক' হতে চাইবে এটা পাকিস্তান ছাড়া আর কে ধরে নিচ্ছে? শেখ আবদুল্লা বরঞ্চ ভারত পাকিস্তান উভয়ের বাইরে এক স্বাধীন কাশ্মীর রাষ্ট্র পত্তন করতে পারলেই তুষ্ট হন। তাই যদি হয়ে থাকে তবে গণভোটের দ্বিতীয় এক শর্ত লঙ্ঘিত হয়। সেটি এই যে কাশ্মীরকে হয় ভারতে নয় পাকিস্তানে যোগ দিতে হবে। সে তৃতীয় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতে পারবে না। এটা ১৯৪৭ সালে ইংরেজ বিদায়ের পূর্বেই স্থির হয়ে যায়। কাশ্মীরের জননায়করাও সে সময় স্বতন্ত্র ও স্বাধীন অস্তিত্ব চাননি। এসব পরবর্তীকালের ভাবনা। দুর্বল একটি রাজ্য হঠাৎ স্বাধীন এক রাষ্ট্র হয়ে উঠলে তাকে তার শত্রুদের হাত থেকে বাঁচাবে কে? ভারত না বাঁচালে পাকিস্তান গ্রাস করবে যে!

কাশ্মীরের একখণ্ড এখনো পাকিস্তানের অধিকারে রয়েছে। সুতরাং পাকিস্তান যে 'ক' অক্ষরের কিঞ্চিৎ পায়নি তা নয়। সবটার জন্যে লড়তে গেলে সবটা হারাতেও পারে। যুদ্ধে কে জিতবে কে হারবে তা আগে থেকে জোর করে বলা যায় না। হিটলারকেও তো গোড়ার দিকে জিততে দেখা গেল। কিন্তু জার্মানরা এমন হারান হারাল যে স্টালিনগ্রাড থেকে হটতে হটতে রাশিয়ানদের ডেকে নিয়ে এল বার্লিনে। এখনো তারা সেখানে রয়েছে। লাভের মধ্যে জার্মানীই ভাগ হয়ে গেছে। তেমনি পাকিস্তান যে যুদ্ধে জয়লাভ করবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। শ্রীনগর থেকে হটতে হটতে ভারতীয়দের হয়তো ডেকে নিয়ে যাবে ঘরে। যদি না কোনো এক তৃতীয় পক্ষ এসে তাকে রক্ষা করে। করা সম্ভবপর। পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে এখনো তার মিত্রভেদ হয়নি। ওদিকে চীনের সঙ্গেও তার সীমান্তচুক্তি হয়েছে। তাতেও কী যেন একটা গুপ্ত ধারা আছে। অন্যান্য শক্তিরা যদি পাকিস্তানের রক্ষক হবার জন্যে এগিয়ে আসে তবে ভারতকে ঢের বেশী সাবধান হতে হবে।

আমরা পাকিস্তানের ক্ষয় ক্ষতি চাইনে। কাশ্মীরের খানিকটে সে বারো বছরের উপর বেআইনীভাবে দখল করে আছে। বলতে গেলে ওটা এখন ওরই হয়ে গেছে। ইচ্ছা করলে ওখানে একটা গণভোটের অনুষ্ঠান করে ওটাকে ও পাকাপাকিভাবে নিজের অঙ্গীভূত করতে পারে। কিন্তু ওর আকাঙ্ক্ষা ওইখানেই সীমাবদ্ধ নয়। সংঘাত অনিবার্য। শুধু যে ভারতের সঙ্গে তাই নয়, কাশ্মীরের নির্বাচক মণ্ডলীর অধিকাংশের ভোটে প্রতিষ্ঠিত কাশ্মীর সরকারের সঙ্গেও। পাকিস্তান স্বয়ং গণতন্ত্র মানে না, যেটুকু ছিল সেটুকুকে ধ্বংস করেছে। সুতরাং সে তো কাশ্মীর সরকারের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে হেসে উড়িয়ে দেবেই। সম্প্রতি কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ যারা করেছে তাদের হয়ে পাকিস্তান প্রচার করছে যে তারা কাশ্মীরী বিপ্লববাদী। বিপ্লব যারা ঘটায় তারা পরের স্বার্থে ঘটায় না, তারা পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্রকে কাশ্মীর নামক একটি ভূখণ্ড পাইয়ে দেবার জন্যে তাদের আপনার শক্তি নিয়োগ করতে যায় না। আর বিপ্লবীদের ধর্ম ইসলাম নয়, বিপ্লবীদের ধর্ম আজকাল কমিউনিজম। কাশ্মীরে যদি যথার্থই একটা বিপ্লব ঘটে তবে কাশ্মীর ঝুঁকবে চীনের দিকে। পাকিস্তানের দিকে নয়। এটা হচ্ছে বিপ্লব শব্দটাকে নিয়ে আরেক রকম ওয়ার্ড মেকিং খেলা। বিপ্লব যাকে বলা হচ্ছে সেটা ঘোরতর রক্ষণশীল একটি রাষ্ট্রের বেনামী অনুপ্রবেশ ও আক্রমণ।

এ খেলা ভারতও খেলতে পারত, কিন্তু খেলবে না, খেলা উচিত নয়। পাকিস্তান যদি সরাসরি যুদ্ধে নামতে সাহসী না হয় তবে এই অভিযাত্রীদের দম ফুরিয়ে যাবে। এরা ধরা পড়বে, মার খাবে, পালাবে। বহু শতাব্দী পরে এ এক বর্গীর হাঙ্গামা। একে বিপ্লব বললে সত্যের অপলাপ হয়। আর যুদ্ধ বললে বাড়িয়ে বলা হয়। তবে এটা যুদ্ধের ভূমিকা হতে পারে। এই অভিযান ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের কর্তাদের প্রেস্টিজ খাটো হবে, সেটা তাঁদের বিরোধীপক্ষের গণতান্ত্রিক দাবীকে জোরদার করবে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরেই এমন এক গণ আন্দোলন আরম্ভ হবে যে কর্তাদের আসন টলবে। সেসব এড়াবার ক্লাসিকাল উপায় হচ্ছে যুদ্ধের পথে পা বাড়ানো। আয়ুব খান কি তাই করবেন, না মিটমাটের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেবেন? আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে অক্ষম। তবে আমার মনে হয় পাকিস্তানের যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়ার ইচ্ছা মার্কিনদের নেই, ইংরেজদেরও নেই। যাতে জড়িয়ে পড়তে না হয় সেইজন্যে ওরাই পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করতে তৎপর হবে। তার মানে যুদ্ধ না করে সন্ধি করতে পরামর্শ দেবে।

মিটমাটের সম্ভাবনা অনেকদিন আগেই ছিল, হতে যাচ্ছে এমন সময় পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য করে আইজেনহাওয়ার তার দর কষাকষির ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন। সে পিস্তল দেখিয়ে কাশ্মীর আদায় করবে এই ব্ল্যাকমেলে নেহরু বেঁকে বসেন। কথাবার্তা বন্ধ হয়ে যায়। কথাবার্তা যখন অবশেষে শুরু হয় তখন পাকিস্তানে শাসক বদল হয়েছে। নতুন শাসকদের পলিসি চীনের সঙ্গে দহরম মহরম। কতকটা মার্কিনদের সমঝিয়ে দিতে যে তাঁরা মার্কিনদের হাতের পুতুল নন। কতকটা ভারতকে সমঝিয়ে দিতে যে তাঁদের আরেক মুরুব্বি আছেন, দরকার হলে তিনি ভারতকে শিক্ষা দেবেন। কথাবার্তা ফেঁসে যায়। ইতিমধ্যে আরো একদফা চেষ্টা হয়েছে, এগোয়নি। না হবার কারণ ভারত কাশ্মীরকে পশ্চিমবঙ্গের মতো একটি অঙ্গরাজ্যে পরিণত করে প্রকারান্তরে জানিয়ে দিয়েছে যে কাশ্মীর নিয়ে আর কথাবার্তার অবকাশ নেই। এটা বিজ্ঞতা কি অবিজ্ঞতা এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে।

অনেকের মতে কাশ্মীর সংক্রান্ত কথাবার্তার দরজা একেবারে বন্ধ করা উচিত নয়। যদিও আমাদের প্রহ্লাদ 'ক' অক্ষরেই আটকে থাকবে, খ অক্ষরে যাবে না, গ অক্ষরে যাবে না তবু আমাদের বর্ণমালায় খ অক্ষর

আছে, গ অক্ষর আছে। তার মানে ভারত পাকিস্তানের মাঝখানে একশোটা মামলা আছে। সব ক'টা মামলা একে একে মেটাতে হবে। এটা উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থ। উভয় রাষ্ট্রের উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ। কাশ্মীর 'ক' অক্ষর না হতে পারে, কিন্তু 'ক্ষ' অক্ষর তো বটেই। ভারত পাকিস্তানের মামলার তালিকার গোড়ার দিকে না হোক শেষের দিকে তো কাশ্মীরের মামলা থাকবেই। মামলার তালিকার থেকে ওটার নাম খারিজ করা যায় কি? বরঞ্চ বলতে পারা যায় সব মামলার শেষে কাশ্মীরের মামলা উঠবে। তখন আমরা দু'ভাই কাশ্মীর নিয়েও আপোসে পৌঁছব।

সুতাং পাকিস্তানকে হিংসার থেকে নিবৃত্ত হতে বলার সঙ্গে সঙ্গে ভারতকেও বলতে হয় চরম সিদ্ধান্তের থেকে নিরস্ত হতে। দরজা খোলা রাখাই সুবুদ্ধি।

আমাদের অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স, কমন ফরেন অ্যাফেয়ার্স। পাকিস্তান আপাতত এতে রাজী নয়। এতে তার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক অবস্থার চাপে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মতো ভারত পাকিস্তান নেপাল সিংহলকেও কমন মার্কেট, কমন ডিফেন্স ইত্যাদির প্রস্তাবে রাজী হতে হবে। কবে, কতদিন পরে সেটা আমার কল্পনার বাইরে। কিন্তু এটা আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে জনগণের বাঁচবার পথ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন নয় পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। দশ বিশ বছরের মধ্যে যদি আমরা সবাই মিলে একজোট না হই তবে কমিউনিজম প্রবল হবে। চীনের সঙ্গে দহরম মহরম করে তাকে ভারতের গায়ে লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে বুদ্ধিভ্রংশ। পাকিস্তানের বর্তমান শাসকদের পলিসি ভুল।

যা বলছিলুম, অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে কমন মার্কেট, ইকনমিক কমিউনিটি, কমন ডিফেন্স, ডিফেন্স কমিউনিটি ইত্যাদি। এর জন্যে ভারতকেও কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করতে হবে। ভারত তার সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট দিয়ে আর সবাইকে কোণঠাসা করবে এটা কাম্য নয়। আবার পাকিস্তান তার সংখ্যা-গরিষ্ঠতার অভাবকে ব্ল্যাকমেল দিয়ে পূরণ করবে এটাও অন্যায়। কাকে কতখানি ছাড়তে হবে, মেনে নিতে হবে, এসব এই মুহূর্তে আমার মানসে নেই। কিন্তু আমি বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে একদিন না একদিন ভারত পাকিস্তান নেপাল সিংহলকে একজোট হয়ে তাদের সব সমস্যার সমাধান করতে হবে।

সেই অন্তিম লক্ষ্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকলে আমরা এমন কোনো ভুল করব না যার ফলে সেই লক্ষ্য আরো বেশীদূর পেছিয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই পেছিয়ে গেছে। ভারত পাকিস্তানের সৈনিকরা কোনো কালে পরস্পরের উপর গুলী ছোঁড়েনি। বরাবরই তারা কমরেড। কিন্তু দেশবিভাজনের পর কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে মাঝে মাঝে তারা জ্ঞাতিবধ করেছে। এখন পর্যন্ত এটা অল্পক্ষেত্রেই ঘটেছে। এখন থেকেই একে সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে হবে। যাকে রাখ সেই রাখে। ভারতপাকিস্তানের সত্যিকার সম্পর্ক পরস্পরকে রক্ষা করা। আঠারো বছরে এ সম্পর্ক রদ হয়নি। কিন্তু বড়োরকম একটা যুদ্ধ যদি বেধে যায়, হাজার হাজার সৈনিক যদি মরে তবে ওরা পরস্পরের এমন শত্রু হয়ে উঠবে যে উভয়ের সাধারণ শত্রুর সঙ্গে কোনদিন একজোট হয়ে লড়বে না। বরং শত্রুর হয়ে লড়বে। তেমন যদি হয় তবে ভবিষ্যৎ ভয়াবহ।

পটভূমিকা

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে যে সমস্যা পাকিস্তানীদের কিছুতেই একমত হতে দিচ্ছে না সেটি হলো একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। যদি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে একটি করে ভোটের অধিকারী করা হয় তা হলে বাঙালীদের ভোট অ-বাঙালীদের ভোটকে ছাড়িয়ে যায়। তার ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালী সংখ্যাগরিষ্ঠতা হয়। সেইসূত্রে পাকিস্তানী সৈন্যদলে, সিভিল সার্ভিসে, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগে। স্বধর্মী হলেও অ-বাঙালীরা বাঙালীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সহ্য করতে রাজী নয়। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, মূলনীতি নির্ধারণ আর কিছুতেই হয় না। শেষে সাব্যস্ত হলো যে দেশটাকে পূর্ব ও পশ্চিম দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে ও লোকসংখ্যা কম বেশী হওয়া সত্ত্বেও উভয় প্রদেশকে প্যারিটি দেওয়া হবে।

এই "প্যারিটি" শব্দটি অবশেষে মুশকিল আসানের কাজ করে। ভোটার সংখ্যা যত বেশী আর যত কম হোক না কেন প্রতিনিধি সংখ্যা ফিফটি ফিফটি। সেকালের বি সি চ্যাটার্জির ফরমূলার নাম ছিল ফিফটি ফিফটি। তাঁর ডাকনামও দাঁড়িয়ে যায় ফিফটি ফিফটি চ্যাটার্জি। কিন্তু একালের এই প্যারিটিতে বাঙালীদের জনসংখ্যাকে তার উপযুক্ত ওজন দেওয়া হয় না। প্রকারান্তরে অবাঙালীরাই ওয়েটেজ পায়। তখন বাঙালীরা দাবী করে বসে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি। হ্যাঁ, বাঙালী মুসলমানরাই হঠাৎ মিশ্র নির্বাচনের ভক্ত হয়ে পড়ে। তারা হিসাব করে দেখে যে পশ্চিম পাকিস্তানের ফিফটিতে একটিও অমুসলমান থাকবে না, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের ফিফটিতে থাকবে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির দৌলতে কয়েকজন অমুসলমান। ফলে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পশ্চিমা মুসলমান ও বাঙালী মুসলমান সমান সমান হবে না, বাঙালী মুসলমানরাই সংখ্যায় কম হবে। তা হলে প্যারিটিতে রাজী হয়ে তাদের লাভ কী হলো? সেইজন্যে তারা দাবী করে যে প্যারিটি যদি হয় তবে মিশ্র নির্বাচনও হবে। মিশ্র নির্বাচন যদি না হয় প্যারিটিও হবে না। নানা ওজর আপত্তির পর পশ্চিমারাও এ দাবী মেনে নেয়, কিন্তু সকলে নয়। মুসলিম লীগ হুমকি ছাড়ে যে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি সে প্রাণ থাকতে মানবে না। লীগের পক্ষে ওটা প্রাণদণ্ডের সামিল। ওই মই বেয়েই

সে গাছে উঠেছে। মই কেড়ে নিলে সে ফল পেড়ে খাবে কী করে? অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় করে আবার এক ডাইরেক্ট অ্যাকশনের দ্বারা সাধারণ নির্বাচন পণ্ড করতে উদ্যত হয় লীগ। এমন সময় ইস্কান্দর মির্জা ও আয়ুব খান্ মিলে "বিপ্লব" করেন।

এরপর আয়ুব খান্ দেশবাসীকে একটি সংবিধান উপহার দেন। অর্থাৎ উপর থেকে চাপিয়ে দেন। তাতে প্যারিটি রইল, মিশ্র নির্বাচন রইল, রইল না কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচন। পরোক্ষ নির্বাচনে যাঁরা প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন তাঁদের হাতে ক্ষমতা রইল অতি সামান্য। প্রেসিডেণ্ট অনেকটা সেকালের বড়লাটের মতো সর্বশক্তিমান হয়ে তাঁর মনের মতো মন্ত্রীদের, গভর্নরদের নিয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। পরে উপর থেকে একটা দলও চাপানো হয়। সরকারী মুসলিম লীগ। পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক অর্থে মর্লি-মিণ্টোর যুগে ফিরে যায়। এটা একটা প্রচ্ছন্ন বড়লাটতন্ত্র। জঙ্গীলাটতন্ত্র বললেও চলে। কারণ আয়ুব খান্ শুধু প্রেসিডেণ্ট নন, তিনি ফীল্ড মার্শাল।

বহু শতাব্দীর পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে ইংলণ্ডে বিবর্তিত হয়েছিল মিলিটারীর উপর সিভিল কণ্ট্রোল। দু'শো বছর ধরে ইংলণ্ডের কাছে শিক্ষা নিয়ে আমরাও হয়েছিলুম তার উত্তরাধিকারী। কিন্তু পাকিস্তান সেটা হারিয়ে বসেছে। কবে ফিরে পাবে খোদা জানেন। তেমনি বহু শতাব্দীর পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে ইংলণ্ডে বিবর্তিত হয়েছিল গভর্ণমেণ্টের উপর পার্লামেণ্টের কর্তৃত্ব। আমরাও তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলুম। কিন্তু পাকিস্তান জল মিশিয়ে যা বানিয়েছে তার স্বাদ অন্যরকম। এখন পাকিস্তানীরা উঠে পড়ে লেগেছে ভারতের মতো একটি সংবিধান পেতে। তারা চায় পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী তথা মিলিটারির উপর সিভিল কণ্ট্রোল। পাকিস্তানের দুই প্রান্তের মানুষ এই দুটি ক্ষেত্রে একমত। তা ছাড়া আরো একটি ক্ষেত্রেও তারা একমত যে প্রদেশগুলি আগেকার মতো বহুসংখ্যক হবে ও আগেকার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অনেকের ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে ক্ষমতা থাকবে সেটা যেন আরো সীমাবদ্ধ হয়, বাড়তি ক্ষমতা যেন বিকেন্দ্রীকৃত হয়। পূর্ব পাশ্চিম পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়েও যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এটাও তাঁদের ইচ্ছা। নতুন সংবিধানে এর জন্যে জায়গা থাকবে।

কিন্তু এখনো কয়েকটি দল আছে তারা মিশ্র নির্বাচনে নারাজ, সুতরাং

নতুন সংবিধান রচনার সময় যখন আসবে তখন তারা আবার একটা লড়াই বাধাতে যাবে। তাদের কথা মেনে নিলে প্যারিটিতে পূর্বপাকিস্তানীদের লাভ হয় না, সুতরাং সংবিধান রচনার সময় যখন আসবে তখন এরাও আবার একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করবে। এরা বলবে এক একটি মানুষ এক একটি ভোট। বাঙালী যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তবে বাঙালীই পার্লামেণ্ট ও কেন্দ্রীয় সরকারে সংখ্যাগুরু হবে।

প্রথম দিকের ইসলামিক স্টেট আজকের দিনে খুব একটা জবরদস্ত আইডিয়া নয়। কিন্তু এখনো ওর যথেষ্ট শক্তি আছে। পূর্ব পশ্চিমকে একজোট করার বেলা ও যদি না থাকে আর কোনো সিমেণ্ট থাকে না। তেমনি ওর দরকার পড়ে কাশ্মীরকে কব্জা করার জন্যে। ও যদি যায় তবে কাশ্মীরের উপর দাবী খাটে না। তেমনি ওর প্রয়োজন হয় পাঠানিস্তান অস্বীকার করার সময়। ও যদি যায় পাঠানদের ধরে রাখা দায় হবে। সব চেয়ে বড়ো কথা মুসলিম লীগ প্রমুখ সাম্প্রদায়িক দলগুলির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে ইসলামিক স্টেট বলে একটি আইডিয়া চাই। যদিও প্রত্যেকদিন মানুষের মন ওকে পিছনে ফেলে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী ও সিভিল কাণ্ট্রোলের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। অপরপক্ষে সোশিয়ালিজমের স্বপ্নও মানুষের মন অধিকার করছে। ভারতের মতো পাকিস্তানেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধুম পড়েছে।

পাকিস্তানের আত্মা এখন পুরোপুরি ইসলামের কৌটায় ভরা নয়। তার দুই হাত ধরে তাকে দুই দিকে টানছে আমেরিকা ও চীন। সে যদি আর পাঁচ দশ বছরের মধ্যে পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রাসী, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, সিভিল কণ্ট্রোল ইত্যাদি না পায় তবে হতাশ হয়ে চীন কিংবা বর্মার মার্গ ধরবে। সেরকম সময় যখন আসবে তখন পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ সোশিয়ালিস্ট ও অপর ভাগ ক্যাপিটালিস্ট শিবিরে যেতে পারে। আয়ুব খান্ একটা ব্যালান্স রক্ষার চেষ্টা করছেন। যাতে পাকিস্তান দুই দিকে চলতে গিয়ে ছিন্নভিন্ন না হয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা এখন পূর্বপশ্চিম সমস্যা। পূর্ব বনাম পশ্চিম পাকিস্তান। আমেরিকা বনাম চীন। পূর্ব বনাম পশ্চিম শিবির।

পাকিস্তান তার নিজের সমস্যা নিয়ে এমন জর্জরিত যে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তার নেই। ইচ্ছাও যে আছে তাই বা কেমন করে বলি? সরকার ও জনগণ তো এক নয়। বিশেষত পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি

থাকতে। পাকিস্তান যুদ্ধ করে পাবেই বা কী! আক্রমণ করে একদিন যেটা পাবে প্রতি-আক্রমণে আরেকদিন সেটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। ভারতীয় সেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না করলে কোনো দখলই পাকা হবে না। সামরিক দখল জাপানীরাও তো যুদ্ধকালে নানা দেশে করেছিল। দখল বজায় রাখতে পারল কি?

আমার মনে হয় পাকিস্তানের আসল অভিপ্রায় যুদ্ধ জিতে কাশ্মীরলাভ নয়, কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে কাশ্মীরীদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমন এক বিপর্যয় সৃষ্টি করা যা দেখে দুনিয়ার লোক বলবে, ভারতকে কেউ চায় না, ভারত গায়ের জোরে চেপে বসেছে। বিদ্রোহ যদি সফল হয় তবে তো কেল্লা ফতে, বিফল হলেও চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে যে কাশ্মীরীরা ভারতবিরোধী, তারা ভারতীয়ই নয়। ফলে ইউনাইটেড নেশনসের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে। সিকিউরিটি কাউন্সিলে রাশিয়া ভীটো প্রয়োগ করলেও জেনারল অ্যাসেম্বলিতে পাকিস্তান ভোটে জিতবে। কত সহজ খেলা!

কিন্তু গোড়ায় গলদ কাশ্মীরীরা যদি বিদ্রোহ না করে তাঁ হলে কী উপায়! "যে পথ দিয়ে মোগল এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো আর।" আর যদি ফেরেও তবে দ্বিতীয়বার অনুপ্রবেশ করা শক্ত হবে।

গৃহযুদ্ধের সূচনা

উনিশ বছর আগে এমনি এক আগস্ট মাসে শুরু হয়ে যায় মুসলিম লীগের ডাইরেক্‌ট য়্যাক্‌শন। দেখতে দেখতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। যে উত্তাপটা সঞ্চিত হচ্ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আর্থিক পেষণে সেটা ইংরেজের অভিমুখে পরিচালিত হলে বিপ্লব ঘটাত। কিন্তু হলো হিন্দুর বিরুদ্ধে, তার থেকে মুসলমানের বিরুদ্ধে। সেসময় গান্ধীজীকে প্রশ্ন করা হয়, "এটা কি গৃহযুদ্ধ?" তিনি উত্তর দেন, "না, গৃহযুদ্ধ নয়, তবে গৃহযুদ্ধের সূচনা।" কথাগুলি ঠিক মনে নেই, কিন্তু ভাবার্থ ওই।

তার পরে কী হলো তা সকলের মনে আছে। গৃহযুদ্ধ ইংরেজ থাকতে হতে পারত না, কিন্তু ইংরেজ চলে গেলে হতোই হতো, যদি না মুসলিম লীগকে দেশের একাংশ ইংরেজের হাত দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হতো। অন্য যেসব বিকল্প ছিল সেসব ইংরেজ অবর্তমানে ধোপে টিকত না। আর ইংরেজকে ধরে রাখাও সম্ভব বা সঙ্গত হতো না। আসল ক্ষমতা অপরকে দিয়ে কেনই বা ওরা সাক্ষীগোপাল হয়ে থাকবে!

চাকা আবার ঘুরতে ঘুরতে অবিকল সেই জায়গাটিতে এসে পৌঁছেছে। মহাযুদ্ধের আর্থিক পেষণ ইতিমধ্যে হালকা হওয়া দূরের কথা আরো গুরুভার হয়েছে। জীবনযাত্রা দুর্বহ। যেমন ভারতে তেমনি পাকিস্তানে। পাকিস্তান ইতিমধ্যে সামরিক নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে গায়ের জোরে জনতাকে দাবিয়ে রেখেছে, কিন্তু লোকের রাগটাকে পাত্রান্তরিত না করলে গায়ের জোর নিয়ে বেশী দিন চালানো যাবে না। আর রাগটাকে পাত্রান্তরিত করার সহজ উপায় হচ্ছে কাশ্মীরের দাবীতে ভারতের সঙ্গে সংগ্রাম। আপাতত এটা বেনামীতে আরম্ভ করা হয়েছে। এমন ভাব দেখানো হচ্ছে যেন কাশ্মীরীরাই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। পরে ওটুকু ঘোমটার বালাই থাকবে না। পরিস্থিতিটা মোটের উপর ভিয়েৎনামের অনুরূপ হবে।

যুদ্ধ বলতে বোঝায় নেশনে নেশনে যুদ্ধ। কিন্তু আমরা দুই নেশনতত্ত্ব স্বীকার করিনি। সুতরাং যেমন গত শতাব্দীর আমেরিকার বেলা ওটা ছিল গৃহযুদ্ধ তেমনি এই শতাব্দীর ভারত পাকিস্তানের বেলাও এটা হবে গৃহযুদ্ধ। অর্থাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ। এই ভ্রাতৃঘাতী সমর কে জানে কতকাল চলবে,

কতদূর গড়াবে! কী হবে এর শেষ ফল? হয়তো ভারত পাকিস্তান একাকার হয়ে একপ্রকার কন্‌ফেডারেশন রচনা করবে। হয়তো কাশ্মীর পাকাপাকি-ভাবে পার্টিশন হবে। কিন্তু যেটাই হোক না কেন নিজেদের মধ্যে সন্ধিসূত্রে বা কথাবার্তাসূত্রে হওয়া চাই। তৃতীয় পক্ষকে দ্বিতীয়বার মধ্যস্থ মানতে যাওয়া ভুল।

গান্ধীজী যেই শুনলেন যে নেতাদের সম্মতিক্রমে দেশ ভাগ করে যাবেন মাউন্টব্যাটেন, অমনি জ্বলে উঠলেন। বললেন, "তৃতীয় পক্ষের হাত দিয়ে পাকিস্তান নৈব নৈব চ।" অর্থাৎ পাকিস্তান যদি হয় দুই পক্ষের কথাবার্তার ফলে হবে, বন্ধুভাবে হবে। ডাইরেক্‌ট য়্যাক্‌শনের পিস্তল দেখিয়ে বিদেশী কাজীর বিচারফলে নয়।

ভারত পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করা তৃতীয় পক্ষের কর্ম নয়। সে তৃতীয় পক্ষ যেই হোক না কেন। ইংরেজ বা মার্কিন বা চীন বা রুশ বা ইউনাইটেড নেশনস। দুই পক্ষকেই এক টেবিলে বসতে হবে। কোনো পক্ষের হাতে পিস্তল থাকবে না। বহুকালের জমে থাকা মামলা একে একে মেটাতে হবে। কাশ্মীরই একমাত্র মামলা নয়, সর্বপ্রথম মামলা নয়। কাশ্মীরের আরো আগে পাঠানিস্থানের মামলা রুজু হয়েছে। তার বাদী একদা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের নেতা। গোলটেবিল বৈঠকে খান্ আবদুল গফ্‌ফর খান্‌কেও ডাকতে হবে। যেমন শেখ আবদুল্লাকে। স্থায়ী সমাধানের জন্যে জনচিত্ত আকুল হলে সেই আকুলতাই শান্তির উপায় খুঁজবে। যুদ্ধবিগ্রহ চিরন্তন নয়।

আর যুদ্ধবিগ্রহের সত্যিকার কোনো প্রয়োজনও নেই। এটা কখনো হতে পারে না যে মুসলমানকে বাদ দিয়ে হিন্দু বাঁচতে পারে বা বড়ো হতে পারে। অথবা হিন্দুকে বাদ দিয়ে মুসলমান বাঁচতে পারে বা বড়ো হতে পারে। ইতিহাসবিরোধী, বিবর্তনবিরোধী, এ মতবাদ আমাদের অগ্রগতিকে অতি দীর্ঘকাল ব্যাহত করেছে। হয়তো আরো কিছুকাল করবে। কিন্তু বরাবর করবে না, করতে পারে না। এটা ভূগোলবিরোধীও বটে।

ভারত পাকিস্তানের সর্বত্র এখন আর্থিক দুর্গতি। ঢাকার পত্রিকাতেও কলকাতার পত্রিকার মতো আর্থিক দুরবস্থার চিত্র ও বিলাপ। যুদ্ধ এই দুরবস্থার প্রতিকার নয়। শান্তি ও সহযোগতা ভিন্ন আর কোনো প্রতিকার নেই। পার্টিশনের পর থেকে দুই রাষ্ট্রেরই খরচ অনর্থক বেড়ে গেছে।

ইংরেজরা ঢের কমে চালাতে পারত। যে শোষণটা ওরা বণিকহিসাবে করছিল সেটা এখনো পুরোপুরি থামেনি। বিভিন্ন খাতে ভারত পাকিস্তান পশ্চিমকে নজর জোগাচ্ছে। কিন্তু যে ইকনমি ওরা শাসকহিসাবে পোষণ করছিল সেটা পার্টিশনের দুই নৌকায় পা দিয়ে তলিয়ে গেছে।

গৃহযুদ্ধের পরিণাম কারো অজানা নেই। সময়ে অন্তঃপরিবর্তন ঘটলেই রক্ষা।

অন্তঃপরিবর্তন কেবল যে পাকিস্তানী মুসলমানদেরই হওয়া উচিত তাই নয়, ভারতীয় হিন্দুদেরও হওয়া উচিত। কোন একটা দেশে কোন একটা সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেই সে দেশটা তাদের একচেটে সম্পত্তি হয়ে যায় না। দেশ-মাত্রেই দেশবাসীমাত্রের মাতৃভূমি। প্রত্যেকেরই তাকে ভালোবাসবার, তাকে স্বাধীন করবার, তার স্বাধীনতার জন্যে প্রাণ দেবার অধিকার আছে। কাশ্মীর রক্ষা করতে গিয়ে সেবার ব্রিগেডিয়ার ওসমান প্রাণ দিয়েছিলেন। এবার দিয়েছেন ব্রিগেডিয়ার বৈরাম মাস্টার। দেশের জন্যে যারা প্রাণ দেয় দেশ তাদের না হয়ে হবে কিনা কতকগুলো ধর্মান্ধ ব্যক্তির বা দলের, যাদের নিত্যকর্ম হলো ধর্মের নাম করে দেশের উপর প্রভুত্ব দাবী করা! অপরাপর সম্প্রদায়ের উপর প্রাধান্য দাবী করা!

ভারত যদি প্রধানত হিন্দুর দেশ হয়ে থাকে তবে কাশ্মীরের উপর তার কোনো নৈতিক দাবী নেই। কারণ কাশ্মীর হচ্ছে মুসলমানপ্রধান। ভারত যদি শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবীর উপর জোর দেয় তা হলে দীর্ঘ সংগ্রামের পর ইংরেজের মতো অপসরণ করতে হবে। ভারতকে কাশ্মীরে থাকবার সনদ দিয়েছে তার সেকুলার স্টেট নীতি। এ নীতি যদি একটা লোকদেখানো ভাণ হয়ে থাকে তবে আসন্ন অগ্নিপরীক্ষায় ভাণ দিয়ে কাজ হবে না। চাই সত্যরক্ষা।

প্রতিশ্রুত গণভোট হলে সত্যরক্ষা হতো; সেটা যখন হচ্ছে না তখন সেকুলার স্টেট নীতিরক্ষাই সত্যরক্ষা। ওটাও যদি না হয় তবে আর একটা ভিয়েৎ নামের জন্যে প্রস্তুত হতে হবে। সেটার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া পূর্ব পাকিস্তানে ও পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ও লোকবিনিময়। কিন্তু সময় থাকতে যদি অন্তঃপরিবর্তন হয় হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্ধদের তা হলেই আমরা মহতী বিনষ্টির হাত থেকে ত্রাণ পেয়ে মহৎ ভবিষ্যতের জন্যে বাঁচব।

অহিংসা তো গেছেই। বাকী আছে সত্য। সত্যও যদি যায় তবে লক্ষ লক্ষ মানুষকে রক্ষা করবে কে? বাহুবল ও ছলচাতুরী? ধর্ম এর নাম নয়। অগ্নিপরীক্ষার দিন এই যথেষ্ট নয়। ভারতের সত্যিকার জোর এইখানে যে ভারত হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শী নির্বিশেষে সকলের। পাকিস্তান শুধু মুসলমানের।

সমর ও শান্তি

দেশ যখন চোখের সুমুখে দু'ভাগ হয়ে যায় তখন আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করি নি। কী করে সে অঘটন সম্ভব হলো তা নিয়ে গবেষণা করেছি। মূঢ়ের মতো ঘোষণাও করেছি যে পাকিস্তান দুবছর বাদে ফেল করে যাবে। আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী যখন ফলি ফলি করছে তখন হঠাৎ শুনি আমেরিকা পাকিস্তানকে কোলে টেনে নিয়েছে। পাকিস্তান হয়েছে মার্কিন জোটবন্দী। এতদিন তৃতীয় পক্ষ বলতে বোঝাত ইংরেজ। এর পর থেকে বুঝতে হলো মার্কিন তথা ইংরেজ।

এটা তেমন কল্পনাতীত ছিল না। কিন্তু কল্পনাও পরাস্ত হলো যখন শুনলুম পাকিস্তান হঠাৎ বাঁদিকে মোড় নিয়ে চীনের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। আমেরিকা এতে খুশি হয় নি। বাধা দিয়েছে। কিন্তু পাকিস্তান সে বাধা অগ্রাহ্য করেছে। এত জোর সে পায় কোথায় যে আমেরিকাকে এক হাতে সরিয়ে চীনের দিকে আরেক হাত বাড়িয়ে দেয়! আমেরিকা রাগ করে ঠিকই কিন্তু তার শাসন যেন মায়ের শাসন। গায়ে লাগে না। দেখা যায় চড়টা-চাপড়টা যেমন পিঠে পড়ছে তেমনি মেঠাই-মোণ্ডা পেটে পড়ছে। পেটে খেলে পিঠে সয়। আর ওদিকে চীনের আদর যেন মাসীর আদর। পাকিস্তানকে মাসীই যেন পেটে ধরেছে। আমেরিকাকে দেখিয়ে দেখিয়ে চীনা কর্তারা পাকিস্তানে আনাগোনা করেন। সম্বর্ধনা পান। চীনকে দেখিয়ে দেখিয়ে মার্কিনদের অপমান করা হয়। এত অপমান ভারত যদি কোনো দিন করত তা হলে ভারতের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি ঘটে যেত। কিন্তু রাজার নন্দিনী প্যারী যা করে তা শোভা পায়।

এর পিছনে কী আছে তা অন্বেষণ করেছি। আছে ভারতের জোট নিরপেক্ষ নীতি। ভারত জোটনিরপেক্ষ হয় এই জন্যে যে ভাবী বিশ্বযুদ্ধকে সে ঘরে ডেকে আনবে না, ঘরের বাইরে সে সৈন্য পাঠাবে না। পাকিস্তান ঘরে ডেকে আনতেও রাজী ছিল, বাইরে সৈন্য পাঠাতেও নারাজ ছিল না। ভারতের দায় যেমন স্বাধীনতারক্ষা পাকিস্তানের দায় তেমনি পরের টাকায় ও পরের হাতিয়ারে মস্ত এক সৈন্যদল রক্ষা। অতবড়ো একটি শ্বেতহস্তীকে

সে পুষবে ও সাজাবে কী করে! অথচ ওর চেয়ে ছোটখাটো একটা একটি হাতী হলেও তার চলে না। জন্মদিন থেকেই সে সংকল্প নিয়ে বসে আছে যে ভারতের সঙ্গে সে একদিন লড়বে। লড়তে হলে সৈন্য চাই, প্রভূত সৈন্য চাই। আত্মরক্ষার জন্যে লড়াই নয়, লড়কে লেঙ্গের দাবীতে লড়াই। সেই জন্যে তার সৈন্যদলকে ব্যাঙের মতো ফুলতে ফুলতে হাতি হতে হয়। ছোট একটি দেশ। সে চায় বড়ো একটি দেশের সমান বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও সাঁজোয়াবাহিনী। এর জন্যে যদি জোটবন্দী হতে হয় তবে সে জোটবন্দী হবে। যদি বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনতে হয় তবে সে ডেকে আনবে। যদি বাইরে সৈন্য পাঠাতে হয় তবে সে বাইরে সৈন্য পাঠাবে। তারপর একদিন সে ভারতের সঙ্গে য্যায়সা লড়াই লড়বে যে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে হেরে হিন্দুস্থান কত কী সমর্পণ করবে। শুধু কি কাশ্মীর! আসাম, কলকাতা, দিল্লী। ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন, মন্ত্রিমণ্ডলীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন, চাকরি বাকরিতে নির্দিষ্ট বখরা ইত্যাদি ইত্যাদি।

পরে দেখা গেল জোটবন্দী হয়ে পাকিস্তান যা পাচ্ছে জোটবন্দী না হয়ে ভারতও তার চেয়ে কিছু কম পাচ্ছে না। অথচ ভারতের তেমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। তাকে বিদেশীদের স্বার্থে সৈন্য সরবরাহ করতে হচ্ছে না। বিদেশীদের স্বার্থে আন্তর্জাতিক সভায় ভোট দিতে হচ্ছে না। ঘরের মধ্যে বিদেশীদের ঘাঁটি জোগাতে হচ্ছে না। পাকিস্তান এসব করে তার মানসম্মান এমনভাবে খুইয়েছে যে মুসলিম দেশগুলিতেও তার অনাদর, ভারতের সমাদর। আর রাশিয়া তো ভীটো প্রয়োগ করে ইঙ্গমার্কিন প্রস্তাবগুলোকে বানচাল করছে। কাশ্মীরপ্রাপ্তির আশা সুদূর থেকে সুদূরতর।

ওদিকে ঘরের ভিতরেও অনর্থ কম নয়। পাখতুনরা চায় পাখতুনিস্তান, তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরে আস্ত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশটাকেই বিলুপ্ত করে দিতে হলো। এই কর্মটিকে ঢাকা দিতে গিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশগুলিকেও মুছে ফেলতে হলো। অমন যে প্রাচীন প্রদেশ পাঞ্জাব আর সিন্ধু তাদের নাম পর্যন্ত রইল না। ওরা সব কটি মিলে হলো এক ইউনিট। আর একা পূর্ববঙ্গ হলো অপর ইউনিট। দুই ইউনিটের লোক-সংখ্যা যদিও সমান সমান নয় তবু প্রতিনিধিসংখ্যা হলো সমান সমান। এতে পূর্ব পাকিস্তানকে খাটো করা হলো। একজন পশ্চিমার ওজন একজন পুরবিয়ার চেয়ে হলো বেশী। দুজনেই প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হতে পারে না।

এটা গলাধঃকরণ করতে গিয়ে পূর্ববিয়ারা চেয়ে বসল যৌথ নির্বাচন পদ্ধতি। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একই নির্বাচক মণ্ডলী। পশ্চিমারা অনেকেই এটা মেনে নিতে রাজী হয়, কিন্তু মুসলিম লীগ বাদ সাধে। তা হলে যে দ্বিজাতিতত্ত্ব টেকে না। পাকিস্তানের মূল ভিত্তি টলে যায়। সাধারণ নির্বাচনের মুখে মুসলিম লীগের হিংস্র আয়োজন, তা দমন করতে ইস্কান্দর মির্জা ও আয়ুব খান্ কর্তৃক ক্ষমতা দখল, তারপরে আয়ুব খানের একচ্ছত্র শাসন, তারপর নতুন সংবিধান প্রবর্তন। নতুন সংবিধানে সব ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আইনসভা পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত, প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডলী গভর্নরের দ্বারা মনোনীত ও তাঁর কাছেই দায়ী, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলী প্রেসিডেণ্টের দ্বারা মনোনীত ও তাঁর কাছেই দায়ী, গভর্নর প্রেসিডেণ্টের দ্বারা মনোনীত ও তাঁর কাছেই দায়ী। কোথাও কোনো প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী নেই।

এই ভাবে যে সরকার গঠিত হলো সেটা ভূতপূর্ব ইংরেজ সরকারেরই দেশী সংস্করণ। তফাতের মধ্যে জঙ্গীলাটই বড়লাট, বড়লাটই জঙ্গীলাট। আয়ুব যতদিন নির্দলীয় ছিলেন ততদিন এটা সহনীয় ছিল। কিন্তু একদিন দেখা গেল তিনি মুসলিম লীগকে নতুন জীবন দিয়েছেন ও আপনি তার সভাপতি হয়েছেন। স্বয়ং জিন্না সাহেব বড়লাট হয়ে মুসলিম লীগের সভাপতিত্ব ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু আয়ুব সাহেব দুই নৌকায় পা রাখলেন। পাকিস্তানী সৈন্যরা ভারতীয় সৈন্যদের মতো রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে ছিল, আয়ুব তাদের এমন এক 'কুদৃষ্টান্ত দেখালেন যে তারাও এখন থেকে রাজনীতিক্ষেত্রে পদক্ষেপ করবে। বিচারবিভাগকেও দুর্বল করে দেওয়া হয়েছে। জুডিসিয়ারি তথা লেজিস্লেচার দুই বাহু শক্তিহীন। সমস্ত শক্তি এক্জিকিউটিভের মুঠোয়। তাও আর্মির কবলে। পাকিস্তান বলবান ও সুপরিচালিত হতে পারে কিন্তু গণতন্ত্র তথা সিভিল পাওয়ার বর্জিত। সৈন্যদলের কবল থেকে সে নিকট ভবিষ্যতে গণতন্ত্র ফিরে পাবে না, সিভিল পাওয়ার ফিরে পাবে না। ব্রিটিশ শাসনও এর চেয়ে ভালো ছিল কারণ ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইনে ইংলণ্ড ভারতবর্ষকে ঢের বেশী ক্ষমতা দিয়েছিল।

কিন্তু আয়ুব খান একদিক থেকে যেমন হরণ করেছেন অন্যদিক থেকে তেমনি দানও করেছেন। সেই যে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতি সেটা আর বলবৎ নেই। আজকাল যেসব নির্বাচন হয় সেসব যৌথ পদ্ধতির নির্বাচন। হিন্দু

মুসলমানের একই নির্বাচকমণ্ডলী। পাকিস্তান একটু একটু করে সেকুলার হয়ে উঠছে। আয়ুব খানের মুসলিম লীগ হিন্দুর ভোটনির্ভর। জিন্না সাহেবের মুসলিম লীগ হিন্দুর ভোটনির্ভর ছিল না। হলে ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্যরূপ হতো। পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-মুসলমানের যে সম্প্রীতি আজ লক্ষিত হচ্ছে তার মূলে যৌথ নির্বাচন পদ্ধতিও কাজ করছে।

তারপর আয়ুব খান পাকিস্তানের সত্যিকার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম করছেন। পূর্ববর্তী পাকিস্তানী নেতারা যা করেন নি। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি এখন মার্কিনরা নিয়ন্ত্রণ করছে না, ইংরেজরা নিয়ন্ত্রণ করছে না। ওদের ব্যালান্স করার জন্যে তিনি চীনকে ডাক দিয়েছেন। ব্যালান্স অফ পাওয়ার এখন আর ইঙ্গ-মার্কিনের হাতে আছে কি না সন্দেহ। এক এক সময় মনে হয় ওটা পাকিস্তানের হাতে। আয়ুব খানের হাতে। এ নীতির শেষ না দেখে জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে জোর করে বলতে পারি যে পাকিস্তানী সৈন্যদল আর পরের স্বার্থে লড়বার জন্যে ভিয়েৎনামে বা বোর্নিও দ্বীপে যাবে না। তারা ভারতীয় সৈন্যদের মতো স্বদেশের জন্যেই লড়বে। আমেরিকা তার হয়ে লড়বার জন্যে দক্ষিণ কোরিয়া থেকে সৈন্য নিয়ে আসছে, ফিলিপাইন থেকে সৈন্য নিয়ে আসছে, অস্ট্রেলিয়া থেকে সৈন্য নিয়ে আসছে, কিন্তু পাকিস্তান থেকে সৈন্য নিয়ে যেতে পারছে না। খাস আমেরিকা থেকে মার্কিন যুবকদের কন্‌স্ক্রিপ্ট করে নিয়ে আসতে হচ্ছে বলে সে-দেশের জনমত পাকিস্তানের উপর রুষ্ট। পাকিস্তানই তো বশংবদের মতো সৈন্য জোগাত। তা তো সে করছে না। তবে সে কেমনতর বন্ধু!

পাকিস্তানকে দোষ দেবার আগেই সে মুখ বেঁধে দিয়েছে। কাশ্মীরের দাবীতে বাধিয়ে বসেছে ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ। তার কাছে সৈন্যের জন্যে হাত পাতলে সে বলবে, "হায়, বন্ধু, তোমাকে সৈন্য দিতে পারি সে সুখ কি আমার কপালে আছে! দেখছ না হিন্দুস্তানীরা আমার দেশ আক্রমণ করে আমাকেই পরাধীন করতে উদ্যত। আমার ঐ কাশ্মীরের দাবীটি মিটিয়ে দাও। আর নয়তো চীন এসে মেটাক।"

যতদূর বোঝা যায় পাকিস্তান অর্থাৎ আয়ুব খান এই যুদ্ধকে বছরের পর বছর চালিয়ে যাবেন যাতে আমেরিকাকে সৈন্য সরবরাহ করতে না হয়। মরুক গে আমেরিকানরা ভিয়েৎনামের ময়দানে, পাকিস্তানীরা পরের জন্যে মরবে না। তারা মরবে কাশ্মীরের দাবীতে খাস পাকিস্তানের জন্যে। তাদের

একমাত্র শত্রু হিন্দুস্তান। পাকিস্থান কি আমেরিকার জন্যে না পাকিস্তানের জন্যে? ন্যাশনালিজমের মূলকথা হলো যার দেশ তার নিজের জন্যে। পাকিস্তানের এতদিনে সাবালক দশা হয়েছে। সে নেশন হয়েছে। রেডিওতে সে আর "হিন্দু" কথাটা উচ্চারণ করে না। তার বদলে করে "ইণ্ডিয়ান" বা "হিন্দুস্তানী" কথাটি। আয়ুব খান একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান। পাকিস্তানী মুসলমানদের তিনি জাতীয়তাবাদী মুসলমান করে তুলছেন। তবে তাঁর জাতীয়তাবাদ ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নয়। তিনি আমাদের একজন নন!

দেশবিভাগের আগে হিন্দু মুসলমানের ক্রমবর্ধমান কলহ দেখে আমি প্রায়ই ভাবতুম এর চেয়ে যুদ্ধ ভালো। যারা যুদ্ধ করে তার পরে একসময় সন্ধি করে, সেইভাবে নিষ্পত্তি হয়। আমার ধারণা ছিল ইংরেজ যেতে না যেতে গৃহযুদ্ধ বাধবেই। দেখলুম সেটা যাতে না বাধে তার জন্যে দেশটাকেই ভাগ করে দেওয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা প্রদেশকেও। যুদ্ধ যখন হলো না সন্ধিও তখন হলো না। স্বাধীনতার পরে কাশ্মীর নিয়ে যুদ্ধ বাধি বাধি হয়েছিল কিন্তু সেটাও মাঝপথে থেমে গেল। বিবাদটা গেল আন্তর্জাতিক রঙ্গমঞ্চে। জাতিপুঞ্জের বৈঠকে।

দীর্ঘ অষ্টাদশ বর্ষ পরে অবশেষে উপস্থিত সেই যুদ্ধ। কেউ রোধ করতে পারল না নিয়তির গতি। যেটা বাধবার সেটা বাধলই। কাশ্মীর একটা উপলক্ষমাত্র। স্বাধীনতার আগে কেউ তার কথা ভাবে নি। কিন্তু যেসব লমূগত প্রশ্ন সে সময় ছিল সেসব প্রশ্ন আজকেও রয়েছে। দেশবিভাগ বা প্রদেশবিভাগ সেসব প্রশ্নের গোড়া ঘেঁষে উত্তর দেয় নি। ভারত পাকিস্তানের হিন্দুসমাজ একটাই সমাজ। একাধিক নয়। একাধিক হতে পারে না। তেমনি ভারত পাকিস্তানের মুসলমান সমাজ একটাই সমাজ। একাধিক নয়। একাধিক হতে পারে না। কলকাতার হিন্দু ঢাকার হিন্দুর জন্যে ভাববেই। করাচীর মুসলমান দিল্লীর মুসলমানের জন্যে ভাববেই। নিরাপত্তার গ্যারান্টি অবশ্য মস্ত জিনিস। তবু সেই সব নয়। পরিপূর্ণ জীবনের গ্যারান্টি কে দিচ্ছে বা দিতে পাবে? একটা সমাজ যদি এগিয়ে যায় ও আরেকটা সমাজ পেছিয়ে থাকে তা হলে গাত্রদাহ অবশ্যম্ভাবী। কী করে এরা পায়ে পা মিলিয়ে চলবে এর ইঙ্গিত সংবিধানে নেই। পার্লামেণ্টারি রাজনীতিতেও নেই। সেই জন্যে এক দেশের সংখ্যালঘু অপর দেশের সংখ্যাগুরুর উপর নির্ভর করবে ও

ফলে extra-territorial হবে। এই নির্ভরতা দূর করতে হলে দুই দেশের মধ্যে সমঝোতা চাই।

চাই বোঝাপড়া, চাই যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা ও চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। রাষ্ট্র দুটো হতে পারে, নেশন দুটো হতে পারে, সমাজ দুটো বা তার বেশী হতে পারে. কিন্তু পরিপূর্ণ জীবন সকলের জন্মস্বত্ব। ক্রমাগত যুদ্ধবিগ্রহ চলতে থাকলে সব সম্পদ বারুদের ধোঁয়া হয়ে আকাশে মিলিয়ে যাবে। স্বাচ্ছন্দ্যের মান উন্নয়ন তো হবেই না, যেটুকু হয়েছে সেটুকুও নেমে যাবে। এই দীনদরিদ্র দেশদ্বয়ের অগণিত নরনারী যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা কোনো মতেই লাভবান হতে পারে না। তাদের যে প্রকৃত বল তা কৃষি ও শিল্পের সুষ্ঠু উৎপাদনে ও বণ্টনে, শিক্ষার উৎকর্ষে ও বিস্তারে, সামাজিক ন্যায়ে, সাংস্কৃতিক সৃষ্টিতে, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে, রাজনৈতিক স্বাধীনচিন্তায়, শাসনগত সুপরিচালনায়।

দুই পক্ষকেই একদিন না একদিন এক সঙ্গে বসতে হবে এক শ'টা মামলার মিটমাটের ইচ্ছা নিয়ে। ইচ্ছা থাকলেই উপায় থাকে। আমাদের দিক থেকে ইচ্ছার অভাব নেই, আমরা পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধপর্ব মিটিয়ে দিয়ে মিলনপর্ব আরম্ভ করতে পারলেই বাঁচি। এ ইচ্ছা গান্ধীজীর ছিল, এ ইচ্ছা জবাহরলালের ছিল, এ ইচ্ছা লালবাহাদুরেরও আছে। কিন্তু অপর পক্ষের আচরণ থেকে বোঝা যায় না যে অপর পক্ষ কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি টানতে চান। কাশ্মীর সমস্যাকে তাঁরা জীইয়ে রাখবেন যতদিন না তাঁরা গোটা কাশ্মীরটা পাচ্ছেন। কী করে তাঁরা পাবেন, না অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে বিদ্রোহ জাগিয়ে পাবেন। তা করতে গিয়ে যদি যুদ্ধ বেধে যায় তবে চীনের সহায়তায় পাবেন। চীন যোগ দিলে যদি বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায় তা হলে কী হবে সে ভাবনা তাঁদের নয়, সে ভাবনা নিরাপত্তা পরিষদের। সেই জন্যে নিরাপত্তা পরিষদ থেকে যুদ্ধবিরতি নির্দেশ এসেছে।

আমার বিশ্বাস, বিলম্বে হলেও এ নির্দেশ রক্ষিত হবেই। না হলে পাকিস্তানকে জাতিপুঞ্জ ত্যাগ করতে হয়। সেটা অভিমানের কথা, মনের কথা নয়। নিরাপত্তা পরিষদ অগ্রণী হয়ে বা মধ্যস্থ হয়ে মিটমাট করে দিক এটা পাকিস্তানের নতুন দাবী নয়, তৃতীয়পক্ষের মধ্যস্থতায় তার বহুকালের আস্থা। কিন্তু প্রত্যেকবারেই দেখা গেছে নিরাপত্তা পরিষদে ইঙ্গ-মার্কিন জোটই সংখ্যাধিক ও তাঁদের প্রস্তাব পক্ষপাতদুষ্ট। তাই প্রত্যেকবারই ভারত আপত্তি করে ও রাশিয়া ভীটো দেয়। কেবল শেষের কয়েকবার তার

দরকার হয় নি। নিরাপত্তা পরিষদ আর একতরফা প্রস্তাব পাশ করবে না, করলে করবে রুশ-মার্কিন মিলিত প্রস্তাব। ক্ষেত্র এর জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছে। এতে হতাশ হলে পাকিস্তানকে যেতে হবে জাতিপুঞ্জের সাধারণ সংসদে। সেখানে দুই তৃতীয়াংশ ভোট হস্তগত করা আদৌ সহজ নয়। মোহভঙ্গের পর পাকিস্তান কী করবে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। আয়ুব খান যদি প্রাচীরের লিখন পাঠ করে থাকেন তো নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে দেশবাসীর কাছে শান্তির আবেদন করবেন। আর নয়তো জাতিপুঞ্জ বর্জন করে চীনের সঙ্গে মিলে অ্যাডভেঞ্চারে নামবেন। যেমন নেমেছেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুকর্ণ।

এইমাত্র যা বললুম তার থেকে মনে হতে পারে যে চীন, পাকিস্তান ও ভারত তিনজনে মিলে লড়বে আর রুশ, মার্কিন ও ইংরেজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবে। আজকের দুনিয়াতে যে-কোনো যুদ্ধই বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হতে পারে। সেইজন্য সুয়েজ নিয়ে ইংরেজ, ফরাসী, ইসরাইল ও ইজিপ্টের যুদ্ধ অন্যান্য শক্তিরা শশব্যস্ত হয়ে থামিয়ে দেয়। ইংলণ্ডের পরম মিত্র আমেরিকাই ইংলণ্ডকে কঠোরভাবে নিবৃত্ত করে। নয়তো সুয়েজের ইস্যুতে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যেত। সকলেই জড়িয়ে পড়ত। হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করা হতো। লক্ষ লক্ষ মানুষ অকারণে মরত। সুয়েজ কি সত্যি এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার জন্যে দুনিয়া পুড়ে ছারখার হবে?

তেমনি কাশ্মীর কি সত্যি এত গুরুত্বপূর্ণ যে তার জন্যে বিশ্বযুদ্ধ বাধবে, আর সকলে জড়িয়ে পড়বে, হাইড্রোজন বোমা ও অন্যান্য মারণাস্ত্র ব্যবহার করা হবে, দুনিয়ার লোক লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে কীটপতঙ্গের মতো প্রাণ দেবে? পাকিস্তানের কাছে কাশ্মীর জীবনমরণের ব্যাপার হতে পারে, কিন্তু তার মিত্রদের পক্ষে তা নয়। এমন কি চীনের পক্ষেও তা নয়। চীন পাকিস্তানকে মার্কিনের বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে একটি শত্রু কম করতে চায়, তারপর তাকে আরেক শত্রুর বিরুদ্ধে খেলিয়ে লড়িয়ে কাঁটা দিয়ে কাঁটা উদ্ধার করতে চায়। চীনের বদ্ধমূল ধারণা যে আমেরিকার সঙ্গে ভারতের যোগসাজস আছে। ক্যাপিটালিস্ট যখন, তখন ওরা মাসতুত ভাই। গণতন্ত্রী যখন, তখন ওরা পরস্পরের বন্ধু। আমেরিকার সঙ্গে লড়তে হলে ভারতের সঙ্গেও লড়তে হয়। কাশ্মীর ইস্যুতে লড়লে আফ্রিকার ও এশিয়ার মুসলিম দেশগুলির সহানুভূতি পাওয়া যায়।

চীন পাকিস্তান যাই ভাবুক আর যাই করুক পৃথিবী এখন যুদ্ধবিরোধী। ওই যে ভিয়েৎনামে সীমাবদ্ধ আকারে লড়াই চলেছে দুনিয়ার লোক ওর জন্যে বিরক্ত। বিরক্তিটা মার্কিনদের ঘরেও সক্রিয়। পাকিস্তান ও চীন যুদ্ধের আকার সীমাবদ্ধ রাখতে সমর্থ হবে কি? যদি হয় তবে এ যুদ্ধে ততকাল চলতে পারে ভিয়েৎনামের যুদ্ধ যতকাল। কিন্তু একে সীমার মধ্যে রাখা তাদের হাতে নয়। এমন কি পাকিস্তান যদি জাতিপুঞ্জ ত্যাগ করে তা হলেও তার হাতে ও চীনের হাতে নয়। দেখতে দেখতে এ যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়বে ও অন্যান্য দেশের মানুষ জড়িয়ে পড়বে। সেই ভয়েই নিরাপত্তা পরিষদে রুশ মার্কিন একমত হয়ে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ জারি করেছে। সে ভয় যদি পাঁচ বছর স্থায়ী হয় তবে যুদ্ধবিরতি পাঁচ বছর স্থায়ী হবে। যদি না পাকিস্তান জাতিপুঞ্জের নির্দেশ অমান্য করবার মানসে সদস্যপদ ত্যাগ করে। অথবা, যদি না নিরাপত্তা পরিষদ একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানে উপনীত হয়।

পাকিস্তানকে যুদ্ধে জিতিয়ে দেবার জন্যে বা কাশ্মীর পাইয়ে দেবার জন্যে ইংরেজ, মার্কিন, চীন সবাই ভারতের বিরুদ্ধে কোমর বাঁধবে ও বছরের পর বছর লড়বে এতখানি পরহিতৈষিতা মানবচরিত্রে নেই। আর পাকিস্তানই বা হাজার বছর লড়বার মতো দম খুঁজে পাবে কোথায়? ইসলামে? গণতন্ত্রে? সাম্যবাদে? তার সেই হাজার বছর লড়বার মতো মতবাদের জোর কোথায়? থাকবার মধ্যে আছে খুঁটির জোর ও উৎকট হিন্দুবিদ্বেষ তথা ভারতবিদ্বেষ। নিছক বিদ্বেষ কোনো দেশের জনগণকে বা সৈন্যদলকে শেষ পর্যন্ত জিতিয়ে দিতে পারে না, দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো ত্যাগ বরণ করতে প্রেরণা দিতে পারে না। খুঁটির জোর কমতে কমতে শূন্যে ঠেকলেই পাকিস্তান সন্ধি করবে। সুতরাং খুঁটিগুলিকে এক এক করে সরানোই হবে আমাদের পলিসি। যতদূর মনে হয় আমেরিকাই সরে যাবে সকলের আগে। তার পরে বোধহয় ব্রিটেন। 'বোধহয়' বলছি এই জন্যে যে ব্রিটেন স্বেচ্ছায় তার সৈন্যবল অপসরণ করে কীর্তি রাখলেও পাকিস্তানের সৈন্যবলের উপর তার ভরসা সহজে যাবে না। ওরা এই উপমহাদেশের তথা পারস্য উপসাগরের ব্রিটিশ স্বার্থের রক্ষী। ওরা মার খেলে ব্রিটেনের গায়ে লাগে। ওরা হটে গেলে ব্রিটেনের বুকে বাজে।

ইরান, তুরস্ক, ইন্দোনেশিয়াকে আমি ধর্তব্যের মধ্যে আনিনে। তা হলে বাকী থাকে চীন। চীনের অন্তঃপরিবর্তন না ঘটা অবধি পাকিস্তানের

অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে বলে মনে হয় না। তার মানে আরো দু'তিন বছর। যদি না ইতিমধ্যে রুশ মার্কিন একমত হয়ে নিরাপত্তা পরিষদের মারফত কাশ্মীর সম্বন্ধে নিষ্পত্তি করে। এবং সে, নিষ্পত্তি বলবৎ হয়। তিন মাসে কি ছ' মাসে এটাও কি সম্ভবপর! এই দ্বন্দ্ব অনেকদিন গড়াবে। পশ্চিম পাকিস্তান ততদিন সবুর করতে পারে। পূর্ব পাকিস্তান কি পারবে? পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র সংযোজক হচ্ছে ভারতের আকাশ। সেই পথ দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ। বিমান আজকাল নাকি কলম্বো ঘুরে যায়। তা ছাড়া রেলপথও বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়েছে; রেলপথে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে যাতায়াত এখন আর সম্ভব নয়। সমুদ্র পথ সিংহল ঘুরে যায়। করাচী থেকে সমুদ্র পথে চট্টগ্রাম যেতে তত সময় লাগে ইউরোপ যেতে যত সময় লাগে। খরচও তেমনি। এভাবে বেশী দিন চলতে পারে না। তারপর পূর্ব পাকিস্তানের তিন দিকে ভারত। সীমান্ত যদি সত্যি সত্যি সীল করে দেওয়া হয় তবে পূর্ব পাকিস্তানে তেল নুন চালের দুর্ভিক্ষ হবে। সমুদ্রপথে ওরা বাইরে থেকে যা পাবে তাতে ওদের কুলোবে না। পাটের বাজার পড়ে গেলে ক্রয়শক্তিও কমে যাবে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় সম্ভবপর। তবে এপার থেকে ওপারে বা ওপার থেকে এপারে মাল পাচার বন্ধ থাকবে না। সে জলতরঙ্গ রোধিবে কে! রাজা ক্যানিউটের মতো আমিও এককালে সমুদ্রকে হুকুম দিয়েছি, সমুদ্র, হটে যাও। সমুদ্র আমার হুকুম শোনেনি, আমাকেই হটতে হয়েছে। সেই জন্যে আমি জোর করে বলতে পারব না যে মাল পাচার বন্ধ হবার দরুণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী।

বর্তমান পরিস্থিতির উদ্‌ভব কাশ্মীরকে নিয়ে। সেই জন্যে কাশ্মীরের কথাই সকলের আগে। কিন্তু আমরা বাঙালী। পূর্ব পাকিস্তানই আমাদের সবচেয়ে কাছে। প্রতি মুহূর্তেই আমরা আমাদের প্রিয়জনদের কথা ভাবছি যারা এখন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। এ বিচ্ছিন্নতা কবে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ মানেই দীর্ঘস্থায়ী বিচ্ছেদ। স্বভাবতই আমরা শর্টকাটের স্বপ্ন দেখছি। ওপারে যাঁরা আছেন তাঁদেরও সেই স্বপ্ন। তাঁরাও চান আশু অবসান। কাশ্মীরের ফয়সালার জন্যে অপেক্ষা করতে হলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয়। ততকাল অপেক্ষা করতে তাঁদেরও ধৈর্য থাকবে না। এমনি করে স্বায়ত্তশাসনের কথা, স্বাধীনতার কথা উঠছে। এটা কেউ কাউকে শিখিয়ে দিচ্ছে না। পরিস্থিতিই মন্ত্রণা দিচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে পরিচ্ছন্ন চিন্তার প্রয়োজন আছে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে পূর্বপাকিস্তান বাঙালী মুসলমানের জন্যেই শুধু নয়। তার সৃষ্টি হয়েছিল উপমহাদেশের অর্ধেক মুসলমানের জন্যে। বাকী অর্ধেকের জন্যে পশ্চিম পাকিস্তান। ইতিমধ্যেই বহু অবাঙালী মুসলমান সেখানে গিয়ে বাস করছে। আরো যেতে পারত, আমরা যেতে দিই নি। আমাদের সংবিধান যদি পাকিস্তানের সংবিধানের মতো হতো, আমাদের রাষ্ট্র যদি দ্বিজাতিতত্ত্বের দ্বারা শাসিত হতো তা হলে পূর্ব পাকিস্তান এতদিনে অবাঙালী মুসলমানে ভরে যেত, বাঙালী মুসলমানরাই হতো সংখ্যালঘু। আমরা আমাদের সুকৃতির দ্বারা পূর্বপাকিস্তানকে সম্ভাব্য অবাঙালী সংখ্যাপ্রাধান্যের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। কিন্তু এর দরুণ পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্ব অচল হয়ে যায় নি, পাকিস্তান এখনো সেই তত্ত্বের দ্বারা শাসিত। পূর্ব পাকিস্তান বাঙালীস্থান নয়। বাংলাভাষার দরুণ বাঙালীস্থান বলে ধরে নেওয়াটাই ভুল। তার আগে দ্বিজাতিতত্ত্বের দাগ মুছে ফেলতে হবে। পূর্ব পাকিস্তান নামটাকেই পূর্ববঙ্গে নামান্তরিত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তিটাকেও রূপান্তরিত করতে হবে। যাতে সেটা উপমহাদেশের মুসলমানের হোমল্যাণ্ড না হয়ে বাঙালী হিন্দু মুসলমানের হোমল্যাণ্ড হয়।

পূর্ব পাকিস্তানের নেতারা যেদিন দ্বিজাতিতত্ত্বের মোহ থেকে মুক্ত হবেন সেদিন তাঁদের মুক্তি দিবস। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন তার পরের কথা। পূর্ব পাকিস্তান কাদের হোমল্যাণ্ড সেইটেই আগে ঠিক হোক। যদি বাঙালী হিন্দু মুসলমানের হোমল্যাণ্ড হয় তবে ইতিহাসের চাকা আবার ঘুরে যাবে। নয়তো যেটা হবে সেটা একটা ডাহা মিথ্যার চেয়ে কিছু কম মিথ্যা। তেমন স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন বা গণতন্ত্র কি টিকবে? করাচীর জাহাজ এসে চট্টগ্রামে ভিড়বে যে! সংঘাত অনিবার্য।

এই অনিবার্য সংঘাতের জন্যে কৃতসংকল্প হবে যারা তাদের মনের অগোচরে একটি দ্বিধা আছে। সে দ্বিধা যতদিন থাকবে ততদিন তারা পাকিস্তানের সঙ্গে লড়তে বল পাবে না, বরং পাকিস্তানের হয়ে লড়বে। দ্বিধাটি আসাম নিয়ে। বহুকাল থেকে আসামের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সেখানে গিয়ে চাষবাস করছে বহু পুরুষ ধরে পূর্ববঙ্গের মুসলমান। পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে যেমন কাশ্মীরের প্রলোভন পূর্ব পাকিস্তানের কাছে তেমনি আসামের। লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর যদি সম্ভব হয় তবে লড়কে লেঙ্গে আসামও সম্ভব হবে। সেরকম

একটা সম্ভাবনা থাকতে পাকিস্তান ছেড়ে স্বাধীন হতে চাইবে কোন্ নির্বোধ! বিশেষত চীন যখন আসামের অপর প্রান্তে ওৎ পেতে বসে আছে। যে-কোন দিন ঝাঁপ দিয়ে ঘাড়ে পড়বে আসামের। তখন পাকিস্তানের ধ্বজা বয়ে আসাম আক্রমণ করবে না কোন্ মূঢ়! অত বড়ো মওকা কি আর কখনো মিলবে! স্বাধীন হয়ে পূর্ব পাকিস্তান এমন কী বলবান হবে যে ভারতের হাত থেকে আসাম ছিনিয়ে নিতে পারবে! স্বাধীনতা পূর্ব পাকিস্তানকে সীমাবদ্ধ করবে। প্রসারিত হতে দেবে না। তবে কি আসাম চিরকালের মতো তার নাগালের বাইরে থেকে যাবে?

আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের নাড়ী টিপে দেখছেন যে সে আসামের জন্যে সব কিছু সহ্য করতে রাজী। মার্শাল ল, মিলিটারি ডিকটেটরশিপ, বেসিক ডেমোক্রাসী, পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশরূপে অবস্থান, অবাঙালী মুসলিম প্রভুত্ব। চীনের সঙ্গে দোস্তি করে আয়ুব খান পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিলুব্ধ সর্বহারাদের কামরূপের সম্মোহনে ভেড়া বানিয়ে রেখেছেন। মোহভঙ্গের দেরি আছে। কাশ্মীরের জন্যে মুজাহিদবাহিনী গঠন করা হচ্ছে শুনছি। তার মানে আসামের জন্যে। একদিন শোনা যাবে আসামে অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

ভারতের নেতাদের সাধুবাদ যে পূর্ব পাকিস্তানের তাঁরা ফৌজ পাঠাননি, বোমা ফেলেন নি। ভরসা করি সেখানকার অধিবাসীদের উপর এই আত্ম-সংবরণের ক্রিয়া শুভ হবে। জানুক তারা যে তাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। তা সত্ত্বেও যদি তারা আয়ুবের সম্মোহনে বা চীনের প্রলোভনে ভোলে তবে তারা স্বাধীনতা বা গণতন্ত্রের যোগ্য নয়। তবে তাদের মধ্যেও চক্ষুষ্মান ও চিন্তাশীল আছেন। দ্বিধাহীন বীরত্বের পরিচয় দিলে ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁদের পরম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করবেন। এই যে দুর্যোগ এই তাঁদের সুযোগ। একটা তাঁদের "finest hour"। এটা কিন্তু তাঁদেরই ব্যাপার। আমাদের নয়।

এই যুদ্ধ বা যুদ্ধবিরতি যদি দীর্ঘস্থায়ী হয় তবে পাকিস্তানের অন্তর্নিহিত স্ববিরোধিতা ক্রমেই পরিস্ফুট হবে। সে যদি মার্কিনের তাঁবেদারি থেকে সত্যি সত্যি পরিত্রাণ চায় তবে চীনের দিকে আরো বেশী করে ঝুঁকবে। যদি চীনের দিকে আরো বেশী করে ঝুঁকতে ভয় পায় তবে ভারতের সঙ্গে মিটমাটের জন্যে ব্যাকুল হবে। যদি তাতেও তার অন্তরে বাধা থাকে তবে পাকিস্তানের দুই অঙ্গ জরাসন্ধের মতো দুই ভাগ হবে। পূর্ব পাকিস্তান ফারাক হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই সেখানে ভারতবিরোধী মনোভাবের চেয়ে যুদ্ধবিরোধী

মনোভাব দানা বাঁধছে। এ মনোভাব যদি ব্যাপক ও গভীর হয় তা হলে পূর্ব পাকিস্তানের শাসকদের পক্ষে উটপাখির মতো বালুতে মুখ গুঁজে থাকা বেশী দিন চলবে না। বাস্তবের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিয়ে মন্ত্রিমণ্ডলী সম্প্রসারণ করতে হবে, তাতেও যদি লোকের সন্তোষ না হয় তবে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে। তাতেও যদি আলোড়ন না থামে গণতন্ত্র প্রবর্তন করতে হবে। হ্যাঁ, এমনি করে একদিন নতুন সংবিধান রচনার সময় আসবে। সেটা যদি সমগ্র পাকিস্তানের সংবিধান হয় তবে পাকিস্তান দু'ভাগ হবে না। যদি কেবলমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের সংবিধান হয় তবে পাকিস্তান দ্বিধাবিভক্ত হবে।

ভারত যদি সংযোজক না হয় তবে পাকিস্তান এক নেশন হতে পারে না। ভারতকে হিসাবের মধ্যে না ধরলে পাকিস্তান দুই নেশন। ভারতের সৌজন্যই এতদিন পাকিস্তানকে একাধারে বিধৃত করেছে। পাকিস্তানের নেতাদের মতে ভারতবিদ্বেষই তাঁদের একতার সিমেণ্ট। ওটা আপাত সত্য। পাকিস্তান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের বাই-প্রোডাক্ট। ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংঘাত যদিও তার জননী তবু জনক তার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের স্বাধীনতালাভ। পাকিস্তান সমান স্বাধীন হতে পারে কিন্তু সব সম্পর্ক ছেদ করে কখনো তার সংহতি রক্ষা করতে পারবে না। এর সত্য-মিথ্যা যাচাই করবার সময় এতদিন পরে এসেছে। এই সেই বহুদিন প্রতীক্ষিত সঙ্কট যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অগ্নিপরীক্ষা ঘটবে। অগ্নিপরীক্ষার পর পাকিস্তান যদি অবিভক্ত থাকে তবে বুঝতে হবে যে ভারতের সঙ্গে তার একটা চিরস্থায়ী সেটলমেণ্ট ঘটেছে। আর নয়তো পাকিস্তানের পশ্চিমের সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বের নাড়ীর বাঁধন কেটে যাবে। সে বাঁধন দৃশ্যত ইসলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ভারত।

পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিকরা না পারুক পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিকদের এবার মনঃস্থির করতে হবে, ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী হবে। কেউ তাকে বলবে না যে ভারতীয় ইউনিয়নের দুয়ার খোলা রয়েছে, ইচ্ছা করলেই প্রবেশ করা যায়। সে সিংহলের মতো, নেপালের মতো, বর্মার মতো ভারতের প্রতিবেশী হতে পারে। তার পররাষ্ট্রনীতি তার নিজস্ব হতে পারে। সে যতদিন না ভারতের শত্রুদের খাল কেটে ডেকে আনছে ততদিন কেউ তার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবে না। যুদ্ধবিগ্রহ বাধাবে না। কেউ তার স্বাধীনতায়

হস্তক্ষেপ করবে না। অনায়াসেই শান্তিচুক্তির দ্বারা পূর্বে পাকিস্তানকে অভয় দেওয়া যায়। সে যদি কমনওয়েলথের সদস্য হয় তবে কমনওয়েলথের দিক থেকেও ভরসা পাবে। যদি জাতিপুঞ্জের সদস্য হয় তবে সেদিক থেকেও আশ্বাস পাবে। আজকের দিনে এক নেশন অপর নেশনকে গ্রাস করতে পারে না। করলে দুনিয়া ছুটে আসবে। পূর্বে পাকিস্তান যদি সাহসপূর্বক স্বাধীনতা ঘোষণা করে তবে তার স্বাধীনতা ভারতের দ্বারা বিপন্ন হবে না।

একদা আমি উভয় বঙ্গের পুনর্মিলনের স্বপ্ন দেখছি। এখন আর দেখিনে। কারণ আমি হৃদয়ঙ্গম করেছি যে পুনর্মিলন একপক্ষের ইচ্ছায় হয় না। তার জন্যে চাই উভয় পক্ষের ইচ্ছা। সে রকম ইচ্ছা দশ বিশ বছরে হয় না, হলে হয় শতাব্দীকাল পরে। দুই বঙ্গ যদি দুই স্বাধীন দেশ হতো তা হলে হয়তো পুনর্মিলন নিকটতর হতো, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে ভারতীয় ইউনিয়নের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তার সঙ্গে মিলিত হতে হলে সারা ভারতের সঙ্গে হতে হবে। তাতে পূর্ব পাকিস্তানের আন্তরিক আপত্তি। কারণ দুই বঙ্গ এক হলে স্বাধীন হলে মুসলমানরা হতো সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়, কিন্তু ভারত ও পূর্ব পাকিস্তান এক হলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয় না। তা সত্ত্বেও যদি পূর্ব পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে প্রস্তুত হয় তবে বুঝতে হবে যে সেকুলারিজম তার মনে বসেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এর কোনো পাকা প্রমাণ মেলেনি। হিন্দু মুসলমান মিলে মিশে থাকা খুব ভালো কথা, কিন্তু শুধু তাই হলেই সেকুলারিজম হয় না। আমরাও যে পুরোপুরি সেকুলার মনোভাবে অভ্যস্ত হয়েছি তাও নয়। আরো অনেকদিন লাগবে এর মর্ম উপলব্ধি করতে। ততদিন পূর্ব পাকিস্তান বাইরেই থাকুক। তাকে ভিতরে ডাকলে আবার সেই সব পুরোনো প্রশ্ন উঠবে। চাকরি-বাকরিতে নির্দিষ্ট হার, মন্ত্রিমণ্ডলীতে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন ইত্যাদি। আমরা আর সেসব প্রশ্ন শুনতে চাইনে।

আমার নিজের ধারণা এই যে, চীনের সঙ্গে মিটমাট না হলে পাকিস্তানের সঙ্গে মিটমাট হবে না, পাকিস্তানের সঙ্গে মিটমাট না হলে চীনের সঙ্গে মিটমাট হবে না। অবস্থা আগে এমন জটিল ছিল না এখন যেমন হয়েছে। জটিলকে সরল করতে নিরাপত্তা পরিষদও কি পারবে! নিরাপত্তা পরিষদে লাল চীন নেই। তার অনুপস্থিতিতে সিদ্ধান্ত নিলে সে পাকিস্তানকে তেমন সিদ্ধান্ত মানতে দেবে না। রুশ মার্কিনের উপর এক হাত নেবার জন্যে সে পাকিস্তানকে ওদের সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার প্রবর্তনা দেবে। চীনও তার সঙ্গে

মিটমাটের কথা উঠলে পাকিস্তানের সঙ্গে মিটমাটের কথা তুলবে। বলা বাহুল্য পাকিস্তানের শর্তে। কেই বা তাতে রাজী হবে। ভারত কখনো নয়।

সঙ্কট দীর্ঘস্থায়ী হবে বলেই আমার ধারণা। এই দীর্ঘকালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান তার আপনাকে আবিষ্কার করবে বলেও আমার বিশ্বাস। পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন বা গণতন্ত্র এমন একটা মঙ্গলময় ঘটনা যে তার প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের উপরও পড়বে। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ পুনরায় স্বাভাবিক হবে। গত আঠারো বছরের অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ছায়ার মতো মিলিয়ে যাবে। বাংলাদেশ যদিও ফিরবে না তবু বাঙালী স্বস্থানে ফিরবে। শরণার্থীর স্রোত ফিরবে। দুই প্রান্তের বা দুই রাষ্ট্রের বাঙালী ধর্মের কথা অত বেশী ভাববে না, ধর্মভেদকে অত বেশী প্রাধান্য দেবে না। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অতীতের বিষয় হবে।

এই গেল একটা সম্ভাবনা। আর একটা সম্ভাবনা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার আগেই পাকিস্তানের কর্ণধারগণ ভারতের সঙ্গে গোল টেবিল বৈঠকে মিলিত হবেন, এক এক করে প্রত্যেকটি বিবাদ মিটিয়ে ফেলবেন ও পরে চীনকেও টেনে আনবেন সেই টেবিলে। এখন এই অবাস্তব আশাবাদের মতো শোনাবে, কিন্তু ইতিহাসে অলৌকিক ঘটনাও ঘটে। গান্ধী নেহেরু যেসব সদ্‌ভাবনা ভেবে গেছেন যেসব সৎকর্ম করে গেছেন সেসব তো কেবল ভারতের জন্যে বা হিন্দুর জন্যে নয়। সেসব বীজ থেকেও একদিন সুফল ফলবে।

এ ছাড়া আরো একটা সম্ভাবনা আছে। সেটা কিন্তু আশাপ্রদ নয়, আশঙ্কাজনক। যুদ্ধবিগ্রহ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণতন্ত্র গজায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বাধীনতা। তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিপ্লব। পূর্ব পাকিস্তানের জমিন কিসের উপযুক্ত তা কি আমরা এতদূর থেকে পরখ করে বলতে পারি? যদি বিপ্লবের উপযুক্ত হয়ে থাকে বা হয়ে ওঠে তা হলে আমরা হয়তো আশ্চর্য হব, কিন্তু সেখানকার লোক হয়তো হবে না। চীনের সঙ্গে অত বেশী মাখামাখি করলে মনের অগোচরে বিপ্লবের প্রতি অনুরাগ উদয় হওয়া বিচিত্র নয়। জীবনযাত্রা যদি দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায় তা হলে রাগ থেকেও বিপ্লবের আবির্ভাব হয়। মুসলিম দেশগুলিতে বিপ্লব অসম্ভব বলে সেই যে একটা কিংবদন্তী ছিল গত বারো-তেরো বছরের ইতিহাস সেটা অপ্রমাণ

করেছে। খোদ আয়ুব কর্তা নাকি বিপ্লব ঘটিয়ে ক্ষমতা করায়ত্ত করেছেন। বিপ্লবের প্রতিপত্তি তিনিই বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর কথা সত্য হলে কাশ্মীরের কোনখানে যেন বিপ্লবী কাউন্সিল গঠিত হয়েছে।

"বাঘ" "বাঘ" বলে বার বার চেঁচালে সত্যি সত্যি একদিন বাঘ এসে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানে একদিন বাঘের উপদ্রব হতে পারে। আমাদের রেডিওতে বলছে ইতিমধ্যে সেখানে নাকি বিপ্লবী কাউন্সিল কাজ করছে। কথাটা অবিশ্বাস্য নয়। গণতন্ত্রের সব আশা নির্মূল হলে মানুষের মন অগত্যা বিপ্লবের দিকে যায়। যুদ্ধবিগ্রহের বিশৃঙ্খলায় বুভুক্ষু জনতা বিপ্লবের মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খোঁজে। এশিয়া আফ্রিকার ছোট বড়ো মাঝারি নানান দেশ এখন ক্ষুধার চাপে বা সামাজিক অবিচারের দায়ে গণতন্ত্র ছেড়ে বৈপ্লবিক সমাজতন্ত্রের পক্ষপাতী। সবাই যে রুশপন্থী বা চীনপন্থী কমিউনিস্ট তা নয়। কিন্তু সকলেই দ্রুত পরিবর্তনের জন্যে আবশ্যক হলে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্থাবান। পূর্ব পাকিস্তানও কি তাদের অন্যতম হবে?

আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পূর্ব পাকিস্তানে অনুসৃত হলে আমাদেরই নৈতিক জয়। তা যদি না হয় তবে আমাদের গর্বের কারণ নেই। ইংলণ্ড আমেরিকারও না। তখন নৈতিক জয় হবে চীনের কিংবা রাশিয়ার। ইসলাম কি পারবে তাকে প্রাণপণে ঠেকাতে? কোথাও কি পেরেছে? মুসলিম লীগ যখন প্রবল হয় নি তখন কৃষক প্রজা দলের মুসলমান নেতাদের কারো কারো সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ছিল। ইসলামে নিষ্ঠাবান হয়েও এঁরা সামাজিক পরিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এঁদের কথাবার্তায় হিন্দু মুসলিম ভেদবুদ্ধির গন্ধ পর্যন্ত পাই নি। ইসলাম সামাজিক পরিবর্তনের অন্তরায় নয়। গণতন্ত্রের অন্তরায় নয়। হিন্দু মুসলিম সহযোগিতার অন্তরায় নয়। মুসলিম লীগের দাপটের দিনেও আমি কোনো কোনো লীগ দলপতির মধ্যে বিস্ময়কর হিন্দুপ্রীতি লক্ষ করেছি। তারা হাড়ে হাড়ে বাঙালী। যদিও মনে প্রাণে মুসলিম।

পাঞ্জাবী মুসলমান বন্ধুও তো পেয়েছি। পরম উপকারী ও বন্ধুবৎসল। ভেদনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। জিন্নার সঙ্গে একমত নন। কিন্তু কেমন করে কী যে ঘটে গেল। মনে হয় ব্যক্তি এক্ষেত্রে মালিক নয়। সমষ্টিই মালিক। কিংবা ইতিহাসই মালিক। ঘটনার চাকা ব্যক্তির হাত দিয়ে ঘোরে বটে, তবে যে ঘোরায় সে নৈর্ব্যক্তিক বা বহুব্যক্তিক কোনো শক্তি। আমরা তাকে

চিনতে না পেরে তার বাহনকেই চালক বলে ভ্রম করি। চার্চিল বা গান্ধী বা জিন্না। হিটলার বা স্টালিন বা মাও সে-তুং। আরো গভীরে যাবার চেষ্টা করলে দেখব এঁদের হাত পা বাঁধা। যেটা ঘটবার সেটাই ঘটে। এমন সব কারণে ঘটে যা দৃষ্টির অগোচর, মনের অগোচর।

আমার এক বিদেশী অধ্যাপক বলতেন মানবিক ব্যাপারের নিয়ামক হচ্ছে স্বার্থ। কিন্তু এমন ব্যক্তিও তো দেখেছি যাঁর স্বার্থ বলতে কিছু নেই। যিনি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। সেইজন্যে অধ্যাপক হর্নের উক্তি ব্যক্তির বেলায় খাটে না। কিন্তু এখনো আমি এমন একটিও দেশ বা নেশন বা শ্রেণী বা দল দেখিনি যে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ। তার বেলা প্রত্যাশা করতে হয় বুদ্ধিদীপ্ত স্বার্থ। এন্‌লাইটেন্‌ড সেল্‌ফ-ইন্টারেস্ট। ওই বিশেষণটি যদি অনুপস্থিত থাকে বা ওলটানো হয় তবে একজন অন্ধ রাখাল একপাল অন্ধ ভেড়াকে গহ্বরের সীমায় নিয়ে যায়। সেটাও কি ইতিহাসের চালনা? নিয়তি কি মানুষকে অন্ধ করে দেয়, ভেড়া বানায়?

একটা বলপরীক্ষার জন্যে পাকিস্তান তার সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই প্রস্তুত হচ্ছিল। সে যা চেয়েছিল সে তা পেয়েছে। অর্থাৎ যুদ্ধ। কিন্তু সে যা চায় সে তা পাবে না। কাশ্মীর। এই যুদ্ধের হারজিত পূর্ব প্রান্তে নির্ধারিত হবে না। হবে পশ্চিম প্রান্তে। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে পাকিস্তান হীনবল হবে নিশ্চয়, কিন্তু তেমন বিচ্ছেদের জন্যেও সে মনে মনে প্রস্তুত আছে। তার বিশ্বাস সে যদি কাশ্মীর কেড়ে নিতে পারে তা হলে তার প্রেস্‌টিজ এত প্রবল হবে যে সে যা চাইবে তাই পাবে। আবার পূর্ব পাকিস্তান ফিরে পেতে কতক্ষণ! আসল কথা কোন্ পক্ষ বেশী বলবান। পাকিস্তানী পক্ষ না ভারতীয় পক্ষ। পাকিস্তানী পক্ষে চীন সশরীরে বিদ্যমান, ব্রিটেন অশরীরে বিরাজমান, আমেরিকাও অধিষ্ঠানের আভাস। এ ছাড়া কয়েকটি মুসলিম দেশও আছে। ভারতীয় পক্ষে কে কে? গণতন্ত্র, সেকুলারিজম, জোট-নিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্রী ধাঁচ। এরা একালের চার মহাশক্তি। এদের শক্তিমত্তার পরিচয় অতগুলো ট্যাঙ্ক বা এতগুলো বিমান দিয়ে হয় না। এমন কি কতগুলো পরমাণু বোমা দিয়েও হয় না। এদের শক্তিমত্তা সূক্ষ্মতর স্তরের ব্যাপার।

যুদ্ধের হারজিৎ নির্ভর করে নৈতিক শক্তি কী পরিমাণে অংশ নেয় তার উপরে। নৈতিক শক্তি যার যত দুর্বল তার "morale" তত ভঙ্গুর। দীর্ঘস্থায়ী

যুদ্ধে সে খাড়া থাকতে পারে না। তার মাজা ভেঙে যায়। এই বাইশ দিনের যুদ্ধ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ নয়। কোন্ পক্ষের মাজার জোর কত সেটা এত কম সময়ের যুদ্ধে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করা শক্ত। কোন্ পক্ষ কত জমি দখল করেছে এটা দিয়েও মাজার জোর মাপা যায় না।

আমাদের পক্ষের নৈতিক শক্তি চতুষ্টয়ের নাম করেছি। পাকিস্তানের পক্ষে যদি সেরকম কোনো নৈতিক শক্তি থাকত তা হলে পাকিস্তানকে হারানো ঢের বেশী কঠিন হতো। কিন্তু তার গণতন্ত্রও নেই, সে ধর্মনিরপেক্ষতায়ও বিশ্বাস করে না, সোজাসুজি ইসলামের দোহাই দিয়ে জেহাদ চালায়। সে জোটনিরপেক্ষ হবে কী দুই জোটে বন্দী হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ধাঁচ বলতে কী বোঝায় তাও সে জানে না। কাশ্মীরীদের অধিকাংশ মুসলমান, তাই তারা পাকিস্তানকেই চায়, এই প্রতীতি তার নৈতিক শক্তি। দীর্ঘস্থায়ী বলপরীক্ষার বেলা এই পরিমাণ নৈতিক শক্তি যথেষ্ট নয়। এটা সে হাড়ে হাড়ে বোঝে তাই চীনের সঙ্গে আপনাকে জড়িয়েছে। চীনের নৈতিক শক্তি বিপ্লবসঞ্জাত ও বিপুল। এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে প্রধানত চীনের সঙ্গেই ভারতকে লড়তে হবে। সেক্ষেত্রে চীনের নৈতিক শক্তির সঙ্গেই আমাদের মোকাবিলা করতে হবে।

আমরা যেন সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তনের উপর আরো ঝোঁক দিই। আর ফাঁকি নয়। গণতন্ত্রের সঙ্গে সমাজতন্ত্র যে খাপ খায় তার দৃষ্টান্ত ব্রিটেন। শ্রমিকরা এখন সেদেশ শাসন করছে। সেখানে কেউ কর্মহীন নয়, কেউ অভুক্ত নয়। বাসস্থানের সমস্যা যদিও তীব্র। আমাদের এদেশে এখন অনেক কিছুর অভাব, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি। এই যুদ্ধে সেটার অবসান হোক। লক্ষণ শুভ।

এই প্রসঙ্গে চীনের রেকর্ড অপূর্ব। সে যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতান্ত্রিক পরিবর্তন ঘটাত তা হলে সবাই তাকে শিরোপা দিত। কিন্তু সে তা করে নি। তাই তাকে শিরোপা দিতে পারছিনে। তা বলে তাকে আমি লঘু করব না। সম্প্রতি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপিকা জোন রবিনসন চীন ঘুরে এসে বই লিখেছেন। তিনি অহেতুক প্রশংসা করেন নি। দুঃখের বিষয় আমরা চীনের গঠনমূলক কার্যকলাপ সম্বন্ধে খুব কমই খবর রাখি। সে যেন শুধু পরমাণু বোমা তৈরি করছে আর সর্বত্র চক্রান্ত করে বেড়াচ্ছে। সে যে আমাদের সঙ্গে শত্রুতা করছে এটা

সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে সে এশিয়া ভূখণ্ডে নিজেকে শক্তিশালী দেশরূপে গড়ে তুলেছে। তার এই গঠনশক্তি তো কই পনেরো ষোল বছর আগে ছিল না। এ শক্তি সে পেলো কোথায়? কার কাছ থেকে?

এই চীনের সঙ্গে কি কেউ শতবর্ষের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায়? সুতরাং এর সঙ্গে সন্ধির কথাও চিন্তা করতে হবে। ইতিমধ্যে চীন আমাদের প্রতিবেশী পূর্ব পাকিস্তানীদের হৃদয়ে অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের পত্রিকায় চীনের স্থানই পাকিস্তানের ঠিক পরে। পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হলেও চৈনিক অনুপ্রবেশ অতিক্রম করতে পারবে না। একটি অধঃপতিত দুর্বল দেশ স্বল্প সময়ের মধ্যে কী করে এত সবল ও অগ্রসর হলো আর একটি অনুন্নত দুর্বল দেশ নিশ্চয় সেটা জানতে চাইবে, জেনে অনুসরণ করতে চাইবে। পূর্ব পাকিস্তানকে আমরা যদি আরো মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়ে আমাদের পন্থায় আকর্ষণ করতে না পারি তবে সে ত্বরিত প্রগতির আশায় চীনের পিছনেই ছুটবে। যেমন ছুটছে বর্মা, আমাদের অপর প্রতিবেশী। দুর্ভাগ্য, আমরা বর্মার হৃদয় পাই নি। যদিও ওর হৃদয় বুদ্ধের রাজধানী।

ভুল আমাদের দিক থেকেও হয়েছে। নতুন কোনো ভুল যেন না হয়, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তান ইসলামের ব্যূহ থেকে ছাড়া পেয়ে চৈনিক কমিউনিজমের ব্যূহে ভর্তি হয়। তা যদি হয় তবে সে আমাদেরও সেই দিকে টানবে। আমরা তাকে টানব, না সে আমাদের টানবে, এটাই হবে আগামীকালের প্রশ্ন।

চিরন্তন ত্রিভুজ

যুদ্ধের কথা ভাববার জন্যে অনেক লোক আছেন, শান্তির কথা ভাববার জন্যে লোক বেশী নেই। যদি বা কেউ থাকেন তিনিও ঠিক জানেন না কিসে শান্তি হবে। বলা বাহুল্য যুদ্ধবিরতি ও শান্তি একই জিনিস নয়।

কাশ্মীরে একপ্রকার যুদ্ধবিরতি হয়েছিল ষোল বছর আগে। এই সেদিন যুদ্ধবিরতি রেখা লঙ্ঘিত হয়েছে ও এখনো সে লঙ্ঘনকার্য চলছে। হয়তো আবার সেই রেখা সুরক্ষিত হবে। হয়তো আর কোনো দিন সে রেখা সুরক্ষিত হবে না। কে জানে ইতিহাসের মনে কী আছে। আমরা শুধু অনুমান করতে পারি ও আমাদের অভিমত ব্যক্ত করতে পারি। যাতে শান্তির কিছু সুরাহা হয়।

কাশ্মীরে কাজ করছে একটা নয়, দুটো নয়, তিন তিনটে মতবাদ বা মনোভাব। কাশ্মীর যেন তিন শক্তির তাণ্ডবক্ষেত্র। এই শক্তির মধ্যে সমন্বয় না হলে, অন্ততপক্ষে সমঝোতা না হলে কাশ্মীর শান্ত হবে না। হতে পারে না।

এখন এই তিন শক্তির এক শক্তি হচ্ছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, যার কাছে হিন্দু মুসলমান ভেদ নেই, যার চোখে কাশ্মীরীরাও ভারতীয়, কাশ্মীরী-মাত্রেই ভারতীয়। এই শক্তি দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়েছে, ব্রিটিশ সরকার মানে মানে সরে না গেলে আরো দীর্ঘকাল লড়তে তৈরি ছিল, কাশ্মীরের ব্রিটিশ আশ্রিত মহারাজা হিন্দু বলে যে তাঁর সঙ্গে সংগ্রাম করত না তা নয়। এই শক্তিকেই এখন কাশ্মীর রক্ষা করতে হচ্ছে যাতে সে ছলে বলে কৌশলে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরভুক্ত না হয়। তেমন শিবিরভুক্তি যদি ঘটে তবে ভারতের স্বাধীনতা কমজোর হবে। কাশ্মীর হারানো মানে স্বাধীনতা হারানোর দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

দ্বিতীয় শক্তি হলো মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদ, যার প্রতিমূর্তি পাকিস্তান। এ শক্তি বিনা দ্বন্দ্বে পৃথক রাষ্ট্র পায়নি। যুদ্ধবিগ্রহে এর অনাগ্রহ নেই। "লড়কে লেঙ্গে" এর প্রাণের কথা। কার কাছ থেকে লড়কে লেঙ্গে? ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছ থেকে নয়। পাশ্চাত্য শিবিরের বাইরে এসে নয়। এর শত্রুসম্পর্ক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সঙ্গে, ভারতীয় ইউনিয়নের

সঙ্গে, বলতে গেলে ভারতবাসীর স্বাধীনতার সঙ্গে। সবকিছুই এর চোখে হিন্দু। আর হিন্দু হলেই মুসলমানের দুশমন হতে হবে। হিন্দু মুসলমানে মৈত্রী হতে পারে না, হিন্দু মুসলমানকে গ্রাস করার জন্যে হাঁ করে রয়েছে। আর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ যেন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার নামান্তর। কাশ্মীরের উপর তার যেন কোনো নৈতিক দাবী নেই, সেটা যেন তার উপনিবেশ।

একথা সত্য যে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যান্য রাজ্য যেমন হিন্দুপ্রধান কাশ্মীর তেমন নয়। কাশ্মীর এককালে হিন্দুপ্রধান ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ হিন্দু মুসলমান হয়ে যাওয়ায় কাশ্মীর এখন মুসলমানপ্রধান। তা বলে তাদের ভাষা বা সংস্কৃতি বা প্রদেশিক স্বকীয়তা লুপ্ত হয়নি। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে তারা কাশ্মীরী। ভারতবর্ষ যদি এক রাষ্ট্র হতো, ভারত পাকিস্তান যদি দুই রাষ্ট্র না হতো, তা হলে তারা হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে একরাষ্ট্রভুক্ত হতো। কিন্তু ভারত পাকিস্তান দুই রাষ্ট্র হয়েছে ও কাশ্মীর কার্যত দুই শক্তির মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। কাশ্মীরীদেরও অগত্যা দুই ভাগ হতে হয়েছে। এতে যাঁদের আন্তরিক আপত্তি, যাঁরা কাশ্মীরের ঐক্য চান ও তাকেই সব চেয়ে বেশী মূল্য দেন তাঁরা কাশ্মীর পেট্রিয়ট। যেমন বাঙালী পেট্রিয়ট ছিলেন স্বর্গত শরৎচন্দ্র বসু। তিনি সুহ্‌রাবর্দি সাহেবের সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্বতন্ত্র বঙ্গের কল্পনা করেছিলেন। যুক্ত বঙ্গ থাকত ভারত পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের বাইরে। যুক্ত বঙ্গ হতো তৃতীয় এক রাষ্ট্র। তার পিছনে যে মতবাদ বা সেন্টিমেণ্ট ছিল সেটা তৃতীয় এক শক্তি।

স্বতন্ত্র বঙ্গের পিছনে তেমন জনমত ছিল না, নয়তো স্বতন্ত্রবঙ্গ বলে তৃতীয় এক রাষ্ট্র ভূমিষ্ঠ হতো। গান্ধীজীও কতকটা সেইরূপ পরামর্শ দিয়েছিলেন, যাতে গৃহযুদ্ধ না বাধে। এখনো পূর্ববঙ্গে বহু মুসলমান আছেন যাঁরা পাকিস্তান ছেড়ে দিতে রাজী আছেন, যদি স্বতন্ত্র বঙ্গ বলে তৃতীয় এক রাষ্ট্র হয়। স্বতন্ত্র বঙ্গ না হলে তাঁরা পাকিস্তানকেই ভারতের চেয়ে আরো আপনার মনে করেন। এঁদের জীবন সুখের নয়, কারণ এঁরা পাকিস্তানী হওয়ার চেয়ে বাঙালী হওয়া বেশী পছন্দ করেন, অথচ পাকিস্তানী না হয়েও গতি নেই। বাইরে থেকে আমরা এঁদের ভুল বুঝি। এঁদের সঙ্গে আমাদের শত্রুসম্পর্ক নয়। কিন্তু পাকিস্তান যদি শত্রুভাবাপন্ন হয়, যদি যুদ্ধঘোষণা করে, তবে এঁদের সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃঘাতী সমন্ধ হবে। ট্র্যাজেডী আর কাকে বলে! যুক্ত বঙ্গে যাঁরা হতেন 'কমরেড' যুধ্যমান বঙ্গে তাঁরাই হবেন 'এনিমি'।

এখন কাশ্মীরীদের মনের ভাবও কতকটা সেইরকম। ভারতবর্ষ বলে একমাত্র রাষ্ট্র যদি থাকত তা হলে কোনো গোলমাল ছিল না, স্বতন্ত্র কাশ্মীর বলে তৃতীয় একটা রাষ্ট্র যদি হয় তা হলেও কোনো গোলমাল থাকে না, কিন্তু ভারত পাকিস্তান বলে দুই যুধ্যমান রাষ্ট্র হয়েই যত গোলমাল। সব কাশ্মীরী এক শিবিরে থাকতে পারছে না, থাকতে চায়ও না, অথচ বরাবরের মতো দুই শিবিরে থাকতে হবে এটাও তারা মেনে নিতে কুণ্ঠিত। বাঙালীরাও কি মেনে নিতে কুণ্ঠিত নয়? 'পার্টিশন জিন্দাবাদ' বলে জয়ধ্বনি করবে এমন বাঙালী খুব বেশী আছে কি? যারা করে তারা সেটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ'। 'পশ্চিমবঙ্গ জিন্দাবাদ'।

বঙ্গভঙ্গের যে বেদনা আমরা অন্তরে অন্তরে অনুভব করছি সেই বেদনাই শেখ আবদুল্লা সাহেবের অন্তরে। বেদনা দিয়ে বেদনার পরিমাপ করলে মানুষকে বোঝা কঠিন নয়। ভারত যদি কাশ্মীরের সমস্তটা নিতে পারত, রাখতে পারত, তা হলে সব কাশ্মীরীকেই পাওয়া যেত এক নৌকায়। কিন্তু তার তো কোনো লক্ষণ নেই। কাশ্মীরের এক-তৃতীয়াংশ আমরা পাকিস্তানকে ছেড়ে দিয়েছি বললে সত্যের অপলাপ হয় না। সেইভাবেই যুদ্ধবিরতি হয়, সেইভাবেই যুদ্ধবিরতি আবার হবে। কাশ্মীর থেকে যারা বহুদূরে থাকে তাদের পক্ষে যুদ্ধবিরতিই আরামপ্রদ। যারা কাশ্মীরের দুই বিভক্ত অঞ্চলে থাকে তাদের পক্ষে তা নয়। তাদের পক্ষে ওটা একটা গর্ভযন্ত্রণা। ওর থেকে নিস্তারের উপায় খুঁজতে খুঁজতে তাদের কেউ কেউ সেটা পেয়েছে সংযুক্ত কাশ্মীর নামক আইডিয়াটির মধ্যে। যার অন্য নাম স্বতন্ত্র কাশ্মীর বা স্বাধীন কাশ্মীর।

এসব লোক মতবাদের দিক থেকে পাকিস্তানী নয়। অথবা স্বভাবত সাম্প্রদায়িক নয়। তবে তৃতীয় একটা রাষ্ট্রকে অবাস্তব বলে যদি নস্যাৎ করা হয়, যেমন করা হয়েছিল স্বতন্ত্র বঙ্গকে, তা হলে চিরকাল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকার চেয়ে সব কাশ্মীরী মিলে পাকিস্তানে যাওয়াই ভালো, এই হলো হতাশ পেট্রিয়টদের যন্ত্রণামুক্তির উপায় উপলব্ধি। ভারতে কেন নয়? এর উত্তর, ভারত তো সমগ্র কাশ্মীর চাইছে না, নিচ্ছে না, নেবে না। পাকিস্তান অখণ্ড কাশ্মীর চাইছে, তার জন্যে দুনিয়া তোলপাড় করছে, চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, মার্কিনের সঙ্গেও। এদিকে গেরিলাযুদ্ধের জন্যেও তৈরি হচ্ছে। ভিয়েৎ নামের মতো দীর্ঘকাল চালাতে পারে। এমন যে পাকিস্তান তারই আকর্ষণ ভারতের চেয়ে বেশী বলে মনে হচ্ছে এখন অনেকের কাছে।

কাশ্মীর তারই হবে যে তার সবটাই জয় করে নিতে পারবে। নয়তো তার এই দ্বিধাদীর্ণ দশা কতক লোককে হতাশ করে তুলবে, কতক লোককে মরীয়া করে তুলবে। তবে সাধারণ মানুষ যেভাবে আমাদের এদিকে পার্টিশন মেনে নিয়েছে ও তার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে কাশ্মীরেও সেইভাবে মেনে নেবে ও মানিয়ে নেবে, যদি কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখাই পাকাপাকিভাবে কায়েম হয়। অর্থাৎ কাশ্মীর যদি বাংলার মতো বরাবরের মতো পার্টিশন হয়ে যায়। "যদি" বলেছি; কারণ পাকিস্তানের মনোভাব দেখে মনে হয় না যে যুদ্ধবিরতি রেখাটাকে সে আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিণত করতে রাজী হবে। সুযোগ পেলেই সে আবার হামলা করবে। মামলাটাকে জাইয়ে রাখবে। কাশ্মীরীদেরও আশা দেবে, লোভ দেখাবে, ইন্ধন জোগাবে।

কাশ্মীরের সবটা যে জয় করে নেবে কাশ্মীর তারই হবে, বলেছি। কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভের সম্ভাবনা কোন্ পক্ষের কতখানি? পাকিস্তান কাশ্মীরের সমস্তটা জয় করে নেবে আর ভারত তাকে জয় করে নিতে দেবে ভারত নিশ্চয়ই এতখানি দুর্বল নয়। অপর পক্ষে ভারত কাশ্মীরের সমস্তটা জয় করে নেবে আর পাকিস্তান তা জয় করে নিতে দেবে পাকিস্তান যদি-বা এত খানি দুর্বল হয় তার মিত্ররা এত দুর্বল নয়। ইংরেজ মার্কিন চীন সবাই "হাঁ, হাঁ" করে ছুটে আসবে তার ডাক শুনে। ব্যালান্স অফ পাওয়ার ভারতের অনুকূলে যায় এটা ইংরেজ মার্কিন চীনা কেউ মন থেকে চায় না। তেমনি পাকিস্তানের অনুকূলে যায় এটাও চায় না রাশিয়া।

ব্যালান্স অফ পাওয়ার তত্ত্ব যদি সত্য হয় তবে কাশ্মীর যুদ্ধে কোনো পক্ষই জিতবে না, কোনো পক্ষই হারবে না। যুদ্ধে এর ফয়সালা হতে পারে না। হলেই বা দশ বছর ধরে যুদ্ধ। যেটা হতে পারে সেটা হচ্ছে কাশ্মীরে গণবিদ্রোহ বা বিপ্লব। আয়ুব খানের শেষ তাস সেটাই। তবে তিনি যদি মনে করে থাকেন যে গণবিদ্রোহ বা বিপ্লব তিনি ও তাঁর ছদ্মবেশী সৈনিকরা ঘটাবেন সেটা তাঁর ভ্রম। সৈনিকে জনগণে তফাৎ আছে। আর সেনানায়কে ও জননায়কে তফাৎ আছে। কাশ্মীর যখন স্বৈরাচারী মহারাজার অধীনে ছিল তখনো সেখানে বিদ্রোহ বা বিপ্লব ঘটেনি। এখন তো গণতান্ত্রিক মন্ত্রীমণ্ডলীকে ভোট দিয়ে গদীতে বসানো গেছে, বিপক্ষে ভোট দিয়ে হটানো যায়। যেখানে সাধারণ নির্বাচন নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেখানে রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটানোর জন্যে বিদ্রোহের বা বিপ্লবের

প্রয়োজন হয় না। কাশ্মীরীরা ইচ্ছা করলে অন্য একটি দলকে ভোটে জিতিয়ে দিতে পারে। সেই দলটি ইচ্ছা করলে ভারতের সঙ্গে ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের যোগদানের সময় যে সব ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছিল সে সব ক্ষমতা বাদে আর সব ক্ষমতা একে একে ফেরৎ চাইতে পারে। সেই ইস্যুতে পদত্যাগ করতে পারে। বিকল্প মন্ত্রীমণ্ডল গঠন করা অসম্ভব হলে রাষ্ট্রপতির শাসন চিরকাল চলতে পারে না। সেরকম সঙ্কট উপস্থিত হলে কাশ্মীরী নেতাদের সঙ্গে ভারতীয় নেতাদের একটা সেটলমেণ্ট হবে। সেটা ভারতের ঘরোয়া সেটলমেণ্ট।

পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সেটলমেণ্ট অন্য জিনিস। এর মধ্যে কাশ্মীর আসে না। কিন্তু আসতে পারে যদি পার্টিশন সাব্যস্ত হয় তা হলে সীমানা নির্ধারণের জন্যে। কিংবা যদি কনফেডারেশন স্থির হয় তবে দুই অংশের সংযুক্তির জন্যে। পাকিস্তানের নেতারা যেদিন ভারতের নেতাদের সঙ্গে সেটলমেণ্ট চাইবেন সেদিন কাশ্মীরের নেতাদের মতামত নেওয়া হবে। কিন্তু পাকিস্তানে যোগদানের জন্যে নয়। তার দিন গেছে। কাশ্মীর সংযুক্ত হলে কনফেডারেশন। নতুবা পার্টিশন।

কোনো রাষ্ট্র যদি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ছদ্মবেশী সৈন্য পাঠিয়ে ক্ষমতা দখলের উপক্রম করে তা হলে যুদ্ধ অনিবার্য। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব যতবার উঠবে ততবার ব্যর্থ হবে এইজন্যে যে পাকিস্তান তার হামলাদারদের ফিরিয়ে নিতে রাজী নয়, এর পরে আর কখনো হামলাদার পাঠাবে না এমন কোনো অঙ্গীকার করতে রাজী নয়। যুদ্ধবিরতির জন্যে চেষ্টা হচ্ছে, ইউনাইটেড নেশনস স্বতঃপ্রবৃত হয়ে অগ্রণী হয়েছেন। আনন্দের কথা। যে রক্তপাত শেষপর্যন্ত কাশ্মীরের কোনোরকম এদিক ওদিক ঘটাতে পারবে না সে রক্তপাত অবিলম্বে বন্ধ হলেই মঙ্গল। কিন্তু পাকিস্তান যদি হামলাদার ফিরিয়ে না নেয়, যদি বার বার হামলাদার পাঠায়, যদি অঙ্গীকার করা দূরে থাক অধিকার দাবী করে তা হলে যুদ্ধবিরতির কোনো অর্থ হয়?

না। পাকিস্তান যতদিন না স্বীকার করছে যে নিজের এলাকার বাইরে হামলাদার পাঠানোর অধিকার তার নেই ততদিন স্থায়ী যুদ্ধবিরতির কোনো আশা নেই। সিকিউরিটি কাউন্সিল এক্ষেত্রে অসহায়। তাঁরা বড়জোর এই বলতে পারেন যে কাজটা গর্হিত। কিন্তু শুধু সেটুকু বললেই পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করা যাবে না। সে এখন ইউনাইটেড নেশনসের সদস্য নয় এমন দুটি

রাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে। যদিও গাঁটছড়া বাঁধেনি। লাল চীন ও ইন্দোনেশিয়া তার মিতা। এরা তাকে পরামর্শ দিচ্ছেন, তুমিও ইউনাইটেড নেশনস থেকে বেরিয়ে এস। পাকিস্তানের হাতে আরো একখানা তাস। সিকিউরিটি কাউন্সিল তাকে হামলাদারি থামানোর নির্দেশ দিলে সে হয়তো ইউনাইটেড নেশনস ত্যাগ করে বসবে। তার ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘের নৈতিক বল কমে যাবে। সেটাই তো তার সম্বল।

সত্যিকার আশা যদি থাকে তবে মার্কিন ইংরেজ রুশ এই তিন শক্তির মিলিত সংকল্পের উপরে। এঁরা যদি একবাক্যে বলেন যে পাকিস্তানের হামলাদারি অন্যায় ও অবৈধ ও পাকিস্তান যদি সেটা বন্ধ না করে এঁরা তাকে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া বন্ধ করবেন তা হলে হয়তো তার টনক নড়বে। তাতেও যদি ফল না হয় তবে অর্থসাহায্য ও অপরাপর সাহায্য বন্ধ করতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ পাকিস্তানকে ইংরেজ মার্কিন প্রাণ ধরে কোলছাড়া করতে পারবেন না। ভারতীয় উপমহাদেশে ব্যালান্স অফ পাওয়ার রক্ষা করছে পাকিস্তান। পাকিস্তান হলো মাসীর আদুরে দুলাল বেণী। যতদিন না সে মাসীর কান কেটে নিচ্ছে ততদিন তার সাত খুন মাফ। বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। তা ছাড়া পাকিস্তানের মতে এটা একটা স্বত্বের মামলা। সে তার স্বত্ব আদায় করতে চায়। তা হলে এ যুদ্ধ চলবে? অগত্যা। যেমন চলেছিল ও চলছে চীনের সঙ্গে।

উপরের অংশ যখন লেখা হয় তখনো যুদ্ধ ছড়ায়নি, কাশ্মীরে সীমাবদ্ধ রয়েছে। তারপর দেখতে দেখতে ছড়িয়ে যায়। তখন আর তাকে কাশ্মীরের লড়াই বলা চলে না। পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতীয় পাঞ্জাব ও রাজস্থান জড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গেও বোমা পড়ে। পূর্বপাকিস্তানে যুদ্ধ করা আমাদের নীতি নয় এটা ঘোষণা করা হয়। যুদ্ধ আর ছড়ায় না। অতঃপর যুদ্ধবিরতি।

আর একদফা হবে নাকি? পাকিস্তানের কর্তারা শাসাচ্ছেন যে, হবে। হওয়া বিচিত্র নয়। কারণ নেপথ্যে আরেক অভিনেতা রয়েছেন। তিনি একটা চরমপত্রও দিয়েছিলেন, কিন্তু সহসা যুদ্ধবিরতি ঘটায় তাঁকে রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতে হয়নি। পরের বার হয়তো তিনিও আসরে নামবেন। তখন সেটা হবে একসঙ্গে দুই যুদ্ধ। ভারত পাকিস্তান। ভারত চীন।

বলা বাহুল্য, ভারত-চীন যুদ্ধ নতুন করে বাধলে সেটাও সীমাবদ্ধ থাকবে

না। কাশ্মীর থেকে যেমন পশ্চিম পাকিস্তান ও পশ্চিম ভারত তেমনি সিকিম বা নেফা বা লাদাখ থেকে তিব্বত ইত্যাদি। নেপথ্যে আর কে কে আছেন, জানিনে। আমেরিকাও ভারতের ভার লাঘব করার জন্যে চীনের সীমানা লঙ্ঘন করতে পারে। তখন রাশিয়াও যে না জড়িয়ে পড়বে তা নয়। তার মানে বিশ্বযুদ্ধ।

আগুন আর একবার লাগানোর আগে পাকিস্তানকে নিবৃত্ত করতে হবে। পরে দমকল পাঠিয়ে ফল নেই। ইতিমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদ্ থেকে যুদ্ধবিরতির ও পশ্চাদ্ অপসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা নিষ্পত্তির ইঙ্গিতও করা হয়েছে। নিষ্পত্তি মানে দু'পক্ষের সম্মতি নিয়ে নিষ্পত্তি। একপক্ষের অসম্মতি থাকলে নিষ্পত্তি কথাটায় অর্থ হয় না।

যত বিলম্ব হোক না কেন সম্মতি লাভ করতে হবে। পাকিস্তানের সম্মতি তথা ভারতের সম্মতি। পাকিস্তান কি একথা জানে না? জানে ঠিকই, কিন্তু তার আশঙ্কা যত সময় যাবে ভারত কাশ্মীরে ততই শক্ত হয়ে জাঁকিয়ে বসবে। তখন তাকে যুদ্ধের দ্বারা হটানো যাবে না। তখন বাকী থাকবে একখানিমাত্র তাস। গণবিদ্রোহ বা বিপ্লব। যারা বিদ্রোহ বা বিপ্লব করে সফল হবে তারাই কাশ্মীরের মালিক হবে। পাকিস্তান নয়। আর চীনকেই বা বিশ্বাস কী? কাশ্মীরী বিপ্লবীরা যদি রাজা হয় চীনই তো হবে ওদের মন্ত্রী ও সেনাপতি। পাকিস্তানকে আমল দেবে কে?

সময় পাকিস্তানের দিকে নয়। সেইজন্যে সে সবুর করতে পারছে না। হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে! নিরাপত্তা পরিষদে আরো একবার ঘুরে আসা হলো। গায়ে পড়ে ভারতের বিরুদ্ধে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে, আপনারি হিন্দু পূর্বপুরুষদের বিরুদ্ধে মুখখিস্তি করা হলো। গায়ের জ্বালা কি অত সহজে মেটে! এখন শোনা যাচ্ছে জাতিপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যাবে। এবার চোদ্দ পুরুষ কানে আঙুল দেবে। সারা দুনিয়ার লোক কান পেতে শুনবে হাজার বছরের পুরোনো কেচ্ছা কিন্তু নিষ্পত্তি ওভাবে হবে না। নিষ্পত্তির জন্যে চাই সম্মতি। সেটা ভারতের হাতে।

তা হলে কি সালিশ মেনে তাঁর সহায়তায় নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে হবে! সে চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। প্রথমে ইঙ্গ মার্কিন শিবিরের কোনো এক মহারথীকে সালিশ মানার প্রস্তাব উঠেছিল, কিন্তু পাকিস্তান সেই শিবিরে নাম লিখিয়ে তাঁদেরি একজন হয়ে যাওয়ায় তাঁদের কারো অপক্ষপাতের উপর

ভারতের আস্থা থাকে না। তারপর তো স্পষ্ট দেখা গেল পাকিস্তান মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র পাচ্ছে, নামে কমিউনিস্টদের রুখতে, কামে ভারতের উপর প্রয়োগ করতে। এবার তো হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল যে প্যাটন ট্যাঙ্ক হিমালয় ভেদ করে চীনের গতিরোধ করার জন্যে নয়, কাশ্মীর সীমান্ত লঙ্ঘন করে ভারতীয় এলাকা দখল করার জন্যে। এর পরে আর ইঙ্গ মার্কিন শিবিরের সালিশের কথা ওঠে না। ইতিমধ্যে ভারতীয় ফৌজের লাহোর অভিমুখে যাত্রায় বিচলিত হয়ে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর ভারতবিরোধী উক্তি এমন তিক্ততা সৃষ্টি করেছে যে কমনওয়েলথ ত্যাগের কথাই বরং শোনা যাচ্ছে।

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি যদিও ইঙ্গমার্কিন আঁচল বরাবরের মতো ছাড়েনি তবু আগের চেয়ে অনেকটা স্বাধীন হয়েছে। চীনের সঙ্গে গোপন শলাপরামর্শের পর এখন রুশের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপের উদ্যোগ লক্ষ করা যাচ্ছে। এবার হয়তো রুশকে বা রুশ শিবিরের কোনো মহারথীকে সালিশ মানার চেষ্টা হবে। কিন্তু ভারত ইতিমধ্যে মনঃস্থির করে ফেলেছে যে কাশ্মীর নিয়ে সে আর পাকিস্তানের সঙ্গে বাক্যালাপ করবে না। কাশ্মীর ভারতেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ভারতের অঙ্গহানি না করে তো কাশ্মীরের কোনো অংশ হস্তান্তর করা যায় না। কোনো একজন তৃতীয় পক্ষ সদয় হয়ে কাশ্মীরের কিছু অংশ ভারতের হাতে দান করবেন আর বাকী অংশ পাকিস্তানের হাতে, এতে ভারতের মান বাড়বে না। পাকিস্তানেরও যে পেট ভরবে তাও নয়। সে আবার অনুপ্রবেশ করবে। আবার লড়াই বাধাবে।

নিষ্পত্তি বলতে কী বোঝায়? নিষ্পত্তি বলতে এই বোঝায় যে পাকিস্তান আর কোনোদিনই ভারতের সঙ্গে লড়বে না। লড়বার জন্যে তৈরি হবে না। লড়বার মত আর কোনো অজুহাত রাখবে না। দু'পক্ষের মধ্যে যতগুলো বিবাদ আছে সব একে একে মিটিয়ে ফেলবে। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করবে। বর্মা যেমন নিজের সীমানা নিয়ে সন্তুষ্ট আছে, ভারতের ঘরোয়া ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে না পাকিস্তানও তেমনি সন্তুষ্ট থাকবে ও হস্তক্ষেপ করবে না। তা ছাড়া এটাও চাই যে ভারতের সঙ্গে যার শত্রুতা পাকিস্তান তার সঙ্গে মিত্রতা করবে না, গোপন চুক্তি করবে না, তার দাবী সমর্থন করবে না, তার হয়ে লড়বে না। চীনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের সঙ্গে হাত মেলানো আপাতত সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যদি চীন ভারত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা হলেই সম্ভব হবে। তার দেরি আছে।

কাশ্মীরকে সামনে রেখে পাকিস্তান বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে বিভিন্ন বন্দোবস্তের বেড়াজালে আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। এ যেন বিভিন্ন মহাজনের কাছে একই সম্পত্তি বন্ধক রাখা। যে সম্পত্তি তার বলে সে দাবী করছে, কিন্তু এখনো পায়নি। কাশ্মীরঘটিত নিষ্পত্তি যদি একা পাকিস্তানের সঙ্গেই হয়ে চুকে যেত তা হলে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া যেত। কিন্তু ইংরেজ, মার্কিন, চীন ও বোধ হয় রুশ সেই নিষ্পত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। যেটা এককালে ছিল ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগবাঁটোয়ারা সেটা এখন আন্তর্জাতিক দলাদলির টানা-হ্যাঁচড়া। ভারত এদের মধ্যে ক'জনের সঙ্গে রফা করবে, কার কার সঙ্গে রফা করবে! কেনই বা করবে!

ভারত তার দরজা সতেরো বছর ধরে খোলা রেখেছিল। কিন্তু পাকিস্তানের নেতারা ধরাছোঁয়া দিচ্ছেন না, দেবার নামগন্ধ নেই দেখে দরজা বন্ধ করে দিল। কাশ্মীর যদিও ভারতের সামিল ছিল তবু অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল। তার সেই বিশেষত্বটুকু রদ হলো। এতে পাকিস্তানের কী? ক্ষতি যা হলো তা কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্যবাদীদের। তাঁদের দাবী ছিল কাশ্মীর পুরোপুরি অন্যান্য রাজ্যের মতো হবে না, তার বৈশিষ্ট্য বজায় থাকবে। পাকিস্তানের দাবী তা নয়। পাকিস্তানের দাবী কাশ্মীর পাকিস্তানের অঙ্গীভূত হবে, পরে একসময় পাকিস্তানে বিলীন হবে। কাশ্মীরীদের দাবী ও পাকিস্তানীদের দাবী এক নয়। কিন্তু পাকিস্তান তাঁদের মনোভঙ্গের সুযোগ নিল। দেখল যে তাদের একাধিক দল ভারতের উপর ক্ষেপে রয়েছে। কাশ্মীর অনুপ্রবেশ ও বলপূর্বক ক্ষমতা অধিকার করতে গেলে তাদের সহায়তা পাওয়া যাবে। কার্যসিদ্ধির পর তাদের ধোঁকা দিলে চলবে। তারা হবে পা রাখার সিঁড়ি। ঘরে ঢুকে সিঁড়িটাকে লাথি মেরে সরিয়ে দেওয়া যাবে।

এই নিয়ে যুদ্ধ বেধে যাবে এটা বোধ হয় প্যাকিস্তানের হিসাবের বাইরে ছিল। কিন্তু বেধে যখন গেল তখন পাকিস্তান ধুয়ো ধরল যে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের জন্যেই তার মাথাব্যথা। তার নিজের স্বার্থের জন্যে সে লালায়িত নয়। কাশ্মীরীরা যদি প্লেবিসাইটে ভারতের পক্ষে ভোট দেয় তবে পাকিস্তান সেটা মেনে নেবে। কিন্তু তারা যদি স্বাধীন কাশ্মীরের জন্যে ভোট দেয় তা হলে? সে বিষয়ে পাকিস্তান নীরব। সকলেই জানে যে প্লেবিসাইটে দুটি মাত্র বিকল্প থাকবে। হয় পাকিস্তান নয় ভারত। তৃতীয় কোনো রাষ্ট্র নয়। কিন্তু এমনি প্রচারকার্যের প্রতারণা যে কাশ্মীরের

বহু লোকের বিশ্বাস একবার যদি গণভোট অনুষ্ঠিত হয় তা হলে কাশ্মীর নেপালের মতো স্বাধীন হয়ে যাবে। সুতরাং গণভোট যাতে হয় সেই তাদের লক্ষ্য। তার জন্যে তারাও আন্দোলন করবে। সত্যাগ্রহ করবে অহিংস মতে। যে দিনটি সত্যাগ্রহের জন্যে ধার্য ছিল সেই দিনটিতেই পাকিস্তানীরা অনুপ্রবেশ করে হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয়। তখন হিংসা এসে অহিংসাকে কোথায় ডুবিয়ে দেয়।

গোলমেলে ব্যাপার বইকি। পাকিস্তানের লক্ষ্য ও কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদী-দের লক্ষ্য এক নয়। পাকিস্তান চায় আর একটি অঙ্গরাজ্য। যেমন বেলুচিস্থান বা চিত্রাল। কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীরা চায় আর একটি পাকিস্তান। অথচ দুই কণ্ঠে একই ধ্বনি। আত্মনিয়ন্ত্রণ। গণভোট। পাকিস্তান সফল হলে কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের কণ্ঠরোধ করবে। যেমন করছে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাখতুনদের কণ্ঠরোধ। কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীরা কি জানে না যে পাকিস্তান কাশ্মীর হাতে পেলে পকেটে পুরবে, তখন হাজার সত্যাগ্রহ করলেও তার পকেট থেকে স্বাতন্ত্র্য আদায় করা যাবে না? তা হলে পাকিস্তানের সঙ্গে কণ্ঠ মেলানো কেন?

পাকিস্তানের ও কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের লক্ষ্য এক নয়, এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। তেমনি লক্ষ্যভেদ করার উপায় এক নয়, এটা অতটা পরিষ্কার না হলেও সত্য। কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীরা সত্যাগ্রহী। আর পাকিস্তান সত্যাগ্রহের ধার কোনো কালেই ধারত না, এখনো ধারে না। সে সরাসরি হত্যাগ্রহী। "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" যেমন "লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর"ও তেমনি রক্তপাতের পণ। কাশ্মীরের জনসাধারণ তাদের আচরণের দ্বারা বুঝিয়ে দিয়েছে যে তারা এর মধ্যে নেই। পাকিস্তানীরা তাদের কাছে প্রশ্রয় পায়নি। বরং তারাই খবর দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। তারাও তো মুসলমান। কিন্তু তারা পাখতুনদের দশা দেখে সাবধান হয়েছে। আগেও তো উপজাতির আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছে, ইজ্জৎ হারিয়েছে। সে সব কথা ভুলে যাবার মতো কথা নয়। ইসলামের নাম করে একপক্ষ মার দেবে ও আরেকপক্ষ মার খাবে, একপক্ষ নারীনিগ্রহ করবে ও আরেক-পক্ষ সহ্য করবে পাকিস্তান তাদের কাছে কী করে যে এতটা প্রত্যাশা করেছিল ভেবে অবাক হতে হয়।

প্রথমবারের আক্রমণে আতঙ্কিত হয়ে যারা ভারতের কাছে সৈন্য সাহায্য

চেয়েছিল ও পেয়ে কৃতজ্ঞ হয়েছিল তাদের সবাই কিছু ভারতবিদ্বেষী বা পাকিস্তানপ্রেমিক বনে যায়নি। তারা হয়তো বক্‌শী গোলাম মহম্মদের অপশাসনে বিক্ষুব্ধ অথবা ভারত যেভাবে কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা লোপ করেছে তার দরুন বিক্ষুব্ধ, কিন্তু এ বিক্ষোভ সে আতঙ্কের তুলনায় কতটুকু? সে আতঙ্কের পুনরাবৃত্তি কেউ কখনো কামনা করতে পারে? বিক্ষোভ আছে বলে আতঙ্ক ডেকে আনবে কাশ্মীরীদের মধ্যে এমন নির্বোধ্ কেউ নেই, সেইজন্যে পাকিস্তান কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে কারো কাছে ধন্যবাদ পায়নি। এখন সাধু সেজে আত্মনিয়ন্ত্রণের বুলি আওড়াচ্ছে। এতে অবশ্য কারো কারো কাছে সাধুবাদ পাচ্ছে। এটা তো আতঙ্কের ব্যাপার নয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের একটা কুহক আছে। ডাকাত যদি আত্মনিয়ন্ত্রণের কপট আশ্বাস দেয় তবে ডাকাতকেও লোকে বন্ধু ঠাওরায়। কিন্তু এই রবিন হুড নিঃস্বার্থ নন। ইতিমধ্যেই ইনি চীনকে কাশ্মীরের একখণ্ড দিয়ে তার কাছ থেকে বিনিময়ে একখণ্ড ভূমি পেয়ে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে ইনিই কাশ্মীরের মালিকানায় হক্‌দার। তাকে ইনি কিনতেও পারেন, বেচতেও পারেন। স্বাতন্ত্র্যবাদীদেরও ইনি এক হাটে কিনে আরেক হাটে বেচবেন।

জবাহরলালজী বলতেন, শ'; বছরের লড়াই। ভুট্টো সাহেব বলছেন, হাজার বছরের লড়াই। এই এক জায়গায় দু'জনে একমত যে জীবদ্দশায় এর শেষ নেই।

কিন্তু কেন এই লড়াই? কাশ্মীর এমন কী গুরুত্বপূর্ণ যে এর জন্যে দুটো দেশ লড়তে লড়তে ফতুর হয়ে যাবে, আর অন্যান্য দেশ ছাড়িয়ে দিতে পারবে না? তবে কি তাদেরও স্বার্থ আছে?

কাশ্মীরকে ভূস্বর্গ বলা হয়। সশরীরে স্বর্গে যাবার জন্যেই কি এতগুলো দেশ উদ্‌গ্রীব? না, তার জন্যে নয়। কাশ্মীর যদি ভূনরক হতো তা হলেও তার অবস্থান তাকে বিশেষ গুরুত্ব দান করত। তার অবস্থানঘটিত বিশেষ গুরুত্ব আছে বলেই তার জন্যে বিশেষ মর্যাদা দাবী করছেন শেখ আবদুল্লা প্রমুখ কাশ্মীরের সেই সব নেতা যারা পাঞ্জাব বা পশ্চিমবঙ্গের মতো আর একটি রাজ্যের সাধারণ মর্যাদায় সন্তুষ্ট নন।

কাশ্মীরের গুরুত্ব ভারতের প্রত্যেকটি রাজ্যের তুলনায় বেশী। তার গুরুত্বের কারণ এই শুধু নয় যে সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। কাশ্মীরের একদিকে আফগানিস্থান, একদিকে রাশিয়া, একদিকে চীন, একদিকে

ভারত ও একদিকে পাকিস্তান। এ ছাড়া ব্রিটেন ও আমেরিকা দূরে থেকেও নিকট। তারাই নিকটতম দুই সমুদ্রশক্তি। ভারত মহাসাগর তো তাদেরই পৈত্রিক সম্পত্তি। একজন যদি-বা একটু হটে যায় আরেকজন এসে তার জায়গা নেয়। পাকিস্তানের ভূস্বর্গপ্রাপ্তির পর তারা যদি একবার কাশ্মীরে গিয়ে ঘাঁটি গাড়তে পারে তা হলে ব্যালান্স অফ পাওয়ার ভারত, চীন, রুশ, আফগানিস্থানের বিরুদ্ধে যায়। সেরকম সম্ভাবনা আছে বলেই ভারত সেখানে সাবধান ও শক্ত হয়ে বসেছে! আর চীনও পাকিস্তানের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে ভারতকে বেদখল করে নিজের জন্যে জায়গা করে নিয়েছে। রাশিয়ার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় ভারতের সঙ্গে বন্ধুতা করলে। তা বলে সে পাকিস্তানের সঙ্গে শত্রুতা করতেও চায় না। পাকিস্তানও যদি বন্ধু হয় তবে অধিকন্তু ন দোষায়। আফগানিস্থানের পলিসিও রাশিয়ার মতোই। ভারতের উপরেই তার ভরসা। যদিও সে মুসলমান।

ব্রিটিশ আমলে উত্তর পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের যে গুরুত্ব ছিল এখন কাশ্মীরের সেই গুরুত্ব। বলতে গেলে কাশ্মীরই এখন ভারতের উত্তরপশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ। সৈন্যদলকে সেখানকার পথঘাট আগলে থাকতে হয়, পাছে কেউ কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে। আগেকার দিনে ভয় ছিল সব চেয়ে বেশী রাশিয়ার দিক থেকে। কিন্তু স্বাধীন ভারতের গোষ্ঠীনিরপেক্ষ পলিসি রাশিয়াকে ভারতের দিক থেকে নির্ভয় করেছে বলে রাশিয়াও ভারতকে অভয় দিয়েছে। চীনের বেলাও সেইরূপ হতে পারত, যদি না তিব্বত নিয়ে চীনের সঙ্গে ভারতের মনোমালিন্য ঘটত। ব্রিটিশ আমলে ভারত তিব্বতের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছেছিল। তিব্বত কার্যত স্বাধীন ছিল। চীন স্বাধীনতা কেড়ে নেয় ও তার সঙ্গে ভারতের দীর্ঘকালের বোঝাপড়া ধীরে ধীরে বানচাল করে। ইতিহাসে যা কোনোকালে হয়নি তাই হয়, চীনের সৈন্য এসে হিমালয়ের উত্তর প্রান্ত জুড়ে বসে। যারা হাজার মাইল তফাতে ছিল তারা যদি হাজার মাইল এগিয়ে আসে তা হলে তাদের প্রতি শঙ্কা ও সন্দেহ স্বাভাবিক। চীন তার সৈন্যদের তিব্বত থেকে না হোক হিমালয় থেকে হটিয়ে না নিলে শঙ্কা ও সন্দেহ দূর হবে না। ভারতীয় সৈন্য নিজের এলাকায় পিছু হটতে পারে না, পিছু হটতে হলে হটতে হয় চীনকেই। কিন্তু চীনও বলছে যে হিমালয়ের ওপারে চীনেরই নিজের এলাকা। তিব্বতকে সে ঝেড়ে অস্বীকার করছে। তিব্বতের নাম রেখেছে চীনের তিব্বত অঞ্চল। ও দাবী সম্পূর্ণ ইতিহাস-

বিরুদ্ধ। তিব্বত ছিল চৈনিক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত। ভারতকে ব্রিটেনের ভারত অঞ্চল বলে দাবী করার মতোই উদ্ভট এ দাবী। তিব্বত সম্বন্ধে নতুন করে বোঝাপড়া না হলে চীন ভারত সম্পর্ক শোধরাবে না। এটা কেবল সীমানার বিরোধ নয়। তা যদি হতো অনেক আগেই মিটে যেতো।

এই উপমহাদেশের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা বরাবর একটাই ছিল। এমন কি মোগল আমলেও, দক্ষিণাঞ্চল বাদে। এতকালের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দেশভাগের দরুন তছনছ হয়ে গেছে। চীনা সৈন্য যে শিয়রে বসে আছে এর জন্যে যা কিছু দুর্ভাবনা একমাত্র ভারতেরই। পাকিস্তান যেন সমান বিপন্ন নয়। একটা ঘরের মাঝখানে পার্টিশন তুলে দু'ভাগ করলে কি কোনো ভাগের বিপদ কোনো ভাগের চেয়ে কম হয়, যদি ঘরের এক কোণে আগুন লাগে? এক্ষেত্রে কমন ডিফেন্স চাই, ভারত পাকিস্তান যৌথ প্রতিরক্ষা আবশ্যক। কিন্তু এর জন্যে পাকিস্তানকে কাশ্মীর ঘুষ দিতে হবে, নইলে সে চীনের সঙ্গেই হাত মেলাবে? এক ভাই যেমন আরেক ভাইকে জব্দ করার জন্যে গুণ্ডা ডেকে আনে? অতীতে বহুবার এইভাবে এ দেশ পরাধীন হয়েছে। পাকিস্তানের যদি স্বাধীনতার জন্যে দরদ থাকত সে কখনো এত বড়ো একটা সর্বনাশকে ব্ল্যাকমেলের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করত না। কিন্তু লীগ তো স্বাধীনতার জন্যে ইংরেজের সঙ্গে লড়েনি। লড়াই বলতে সে বোঝে হিন্দুর সঙ্গে লড়াই। স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম যারা করেছে তারাই সে দায় বহন করবে। এবার চীনের হাত থেকে স্বাধীনতা রক্ষার দায়। কাশ্মীর থেকে সৈন্য সরালে চীন অনায়াসে ঢুকে পড়বে; পাকিস্তানের কতটুকু শক্তি! সে কি পারবে একহাতে চীনকে ঠেকাতে! সে কি চায় চীনকে ঠেকাতে? না আরো কিছু আদায়ের ফিকিরে চীনকে ভিতরে ডেকে আনাই তার মতলব? কাশ্মীর পেলেই তার সব দাবী মিটে যায় এমন তো নয়!

চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্বন্ধটা সেকালের মুসলিম লীগের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্বন্ধের অনুরূপ। লীগ কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছু আদায় করবে, ইংরেজ কংগ্রেসের কাছ থেকে কিছু আদায় করে দেবে। লীগ চায় যে ইংরেজ থাকুক। ইংরেজ চায় যে লীগ তাকে থাকতে সাহায্য করুক। চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্বন্ধ ভারতের স্বাধীনতার পরিপন্থী। এ সম্বন্ধ যতদিন অটুট থাকবে ততদিন পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্বন্ধ নির্বৈর হবে না। আর বৈরভাব যতদিন অব্যাহত থাকবে কাশ্মীর নিয়ে মিটমাটেরও

কোনো আশা নেই। গায়ের জোরে যে যতটা দখল করেছে সে ততটা রাখবে। আর নয়তো ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি রেখায় ফিরে যাবে। আর নয়তো আরো একদফা লড়ে গায়ের জোরে আরো কিছু দখল করবে। বলা বাহুল্য, সেটা একতরফা হবে না। বেশ বোঝা যাচ্ছে ওরা যদি জম্মু অধিকার করে এরা শিয়ালকোট অধিকার করবে। ওরা যদি শ্রীনগর অধিকার করে এরা লাহোর অধিকার করবে। ওরা যদি কাশ্মীরের সবটা নেয় এরা পশ্চিম পাকিস্তানের আধাআধি নেবে।

তার মানে সারা দেশটাই ইংরেজ যে ভাবে ভাগ করে দিয়ে গেছল সেভাবে ভাগ না হয়ে অন্যভাবে ভাগ হবে। এবার আর মধ্যস্থের সিদ্ধান্তে নয়। এবার মারামারি করে। বলপরীক্ষায় নেমে। এবারকার বাঁটোয়ারা বেয়োনেট দিয়ে। যদি না তৃতীয় পক্ষ এসে থামিয়ে দেয়। আমার বিশ্বাস নিরাপত্তা পরিষদ্ থামিয়ে দেবেই। তা ছাড়া পাকিস্তানের জনমতও কাশ্মীরের জন্যে লাহোর শিয়ালকোট হারাতে রাজী হবে না। বদলাবদলি করে লাভ নেই তাদের। লোকসান নেই আমাদের। শেষ পর্যন্ত ওই ১৯৪৭ সালের পার্টিশন ও ১৯৪৯ সালের যুদ্ধবিরতি রেখাই টিকে যাবে। উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে একটু আধটু এদিক ওদিক হতে পারে, কিন্তু ভারতের সম্মতি বিনা পাকিস্তান কাশ্মীর উপত্যকা পেয়ে যাবে এ কথনো হতেই পারে না। যেই তাকে পাইয়ে দিতে যাবে সেই হবে ভারতের শত্রু। নিরাপত্তা পরিষদ যদি তেমন কোনো সিদ্ধান্ত করে তবে তার সঙ্গে ভারতের বিচ্ছেদ ঘটবে। সোভিয়েট ভীটো থাকতে সেরূপ কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে বলে মনে হয় না। যদি হয় তবে জাতিপুঞ্জ থেকে ভারতের বিদায় অবশ্যম্ভাবী। তখন তার দশা হবে লীগ অফ নেশনসের মতো।

না। তেমন কোনো সম্ভাবনা নেই। পাকিস্তান যদিও আলালের ঘরের দুলাল তবু মার্কিনরাও পাকিস্তানকে পাইয়ে দেবার জন্যে ব্যগ্র নয়। ইংরেজরা যদি ব্যগ্রতা দেখায় কমনওয়েলথ থেকে ভারতের প্রস্থান অনিবার্য। তখন কমনওয়েলথ ভেঙে যাবে। আমার মনে হয় রুশ, মার্কিন, ইংরেজ একমত হয়ে মিটমাটের সূত্র বার করবে। সেটা ভারত ও পাকিস্তান উভয়পক্ষের গ্রহণযোগ্য হওয়া চাই। যদি একপক্ষের গ্রহণযোগ্য হয়, অপরপক্ষের না হয়, তা হলে সে সূত্র অকেজো। বার বার চেষ্টা করেও যদি সেরকম কোনো সূত্র খুঁজে না পাওয়া যায় তবে নিরাপত্তা পরিষদ্ হাত

যোড় করে বলবে, "ধন্য তোমাদের মামলা। আমরা তো হদ্দ হয়ে গেলুম। এখন তোমরা ঘরের ছেলে ঘরে যাও। নিজেরাই দয়া করে মিটিয়ে ফেল। খবরদার, আর কখনো আমাদের কাছে এসো না। নিরাপত্তা পরিষদ আর এই নিয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। তবে আবার যদি তোমরা ফৌজদারি বাধাও আমরা আবার যুদ্ধবিরতির নির্দেশ জারি করব। শেষে কি একটা বিশ্বযুদ্ধ বাধাবে?"

তখন আর একটি মাত্র পথ খোলা থাকবে। যদি না পাকিস্তান জাতিপুঞ্জ থেকে বেরিয়ে গিয়ে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ অমান্য করে। সেই পথটি হচ্ছে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের সরাসরি আলাপ আলোচনা। কেবল কাশ্মীর নয়, যতগুলো বিষয়ে ঝগড়া ততগুলো বিষয়ে প্রাণ খুলে বকবক করতে হবে। মাথা কাটাকাটির চেয়ে কথা কাটাকাটি ভালো। দশবার বৈঠক ভেস্তে যাবে, একবার সফল হবে। দু'পক্ষ মিলে সন্ধিপত্র সই করবে। তারপর সেই সন্ধিপত্র দৃঢ় করা হবে। দুই রাষ্ট্রের পার্লামেণ্ট তাকে স্বীকার করে নেবে। দরকার হলে নতুন নির্বাচনের দ্বারা তার উপর জনমত নেওয়া হবে। এরপর থেকে ভারত পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

কিন্তু অত সহজে হবে কি! চীন কি চায় যে ভারত পাকিস্তান মিলে মিশে এই উপমহাদেশের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব নেয়? মার্কিন কি তার ঘাঁটির মায়া কাটাতে পারবে? ইংরেজ কি তার "ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল" নীতির যেটুকু অবশিষ্ট আছে সেটুকুও ছাড়তে রাজী হবে? আর পাকিস্তানের মোগলরা কি তাদের প্রাক্তন প্রজাদের দিল্লীতে ও শ্রীনগরে কায়েম হয়ে সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে দেবে? এর জন্যে চাই গভীর অন্তঃপরিবর্তন। কিন্তু সেটা তো একদিনে হবার নয়। তার জন্যে চাই সময়। সময়ে সেটা সম্ভব।

তবে সময়কে এগিয়ে দিতে পারে বাহ্য ঘটনা। হঠাৎ যদি একটা বিশ্বযুদ্ধ বেধে যায়—কাশ্মীর নিয়ে নয়, ভিয়েট নাম বা বার্লিন নিয়ে—তা হলে দশ বছরে সময় এক মাসে অতিক্রম করতে পারা যায়। কিংবা যদি পূর্বপাকিস্তান বিদ্রোহ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তা হলেও সেই রকম সময় সংক্ষেপ হতে পারে। বলতে নেই, কাশ্মীরেও যদি অনুরূপ কোনো স্বতঃস্ফূর্ত অভ্যুত্থান ঘটে তা হলেও সময় দ্রুত এগিয়ে আসতে পারে। ইতিহাসে কখন কী হয় কেউ বলতে পারে না। সেইজন্য উটপাখীর মতো বালুতে মুখ গুঁজে যেটা অপ্রীতিকর

সেটাকে উড়িয়ে দেওয়া ভুল। যারা প্রাজ্ঞ তাঁরা সব কিছুর জন্যে প্রস্তুত।

ভারত কাশ্মীরকে যা দিয়েছে আর কেউ তাকে তা দেয়নি ও দেবে না। ভারত দিয়েছে গণতন্ত্র। ভারত তাকে রক্ষা করেছে পাকিস্তানের উৎপাত থেকে, রক্ষা করছে চীনের গ্রাস থেকে, ভবিষ্যতেও করবে। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি ঠিকই হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস ঠিক হয়নি। কাশ্মীরের গুরুত্ব যেমন অদ্বিতীয় তার মর্যাদা তেমন নয়। তার বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে মিলিয়ে তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া উচিত।

ভারতভুক্তির সময় সেই রকমই কথা ছিল। কিন্তু একটু একটু করে তার বিশেষ মর্যাদা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে। যেটুকু বাকী ছিল সেটুকুও জবাহরলালের মৃত্যুর পর গেল। এর হয়তো যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা তো ঠিক যে কাশ্মীর বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন রাজ্য। তাই যদি হয়ে থাকে তবে তাকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়াটাই ন্যায়। না দেওয়াটাই অন্যায়। সুতরাং আগামী নির্বাচনের পূর্বে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে কাশ্মীরকে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হবে।

তারপর কাশ্মীরের রাজনীতি থেকে শেখ আবদুল্লার নির্বাসন আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসাবে অপরিহার্য হতে পারে, কিন্তু জনগণের উপর তাঁর প্রভাব এতে কমবে না। বরং বাড়বে। একদিন না একদিন তাঁকে তাঁর জন্মভূমিতে ফিরে গিয়ে রাজনীতিতে অংশ নিতে অনুমতি দিতে হবে। তখন যদি দেখা যায় যে অধিকাংশ লোক তাঁর দিকে তবে তাঁকে ক্ষমতার আসন ছেড়ে দিতে হবে। তিনি যদি বিশেষ মর্যাদা দাবী করেন তাঁর সে দাবী এক কথায় অগ্রাহ্য করলে চলবে না। আলাপ আলোচনা চালাতে হবে, বৈঠক বসাতে হবে। তাঁর রাজনৈতিক মতের জন্যে তিনি যতকাল ধরে দুর্ভোগ সহ্য করেছেন ততকাল আর কেউ করেননি। তাঁকে বন্ধুরূপে পেলে আমাদেরি নৈতিক জোর বাড়বে। বিদেশে আমাদের পক্ষের প্রচারকার্য সফল হচ্ছে না এই জন্যে যে আবদুল্লার সঙ্গেও আমাদের বনছে না, শুধু আয়ুব খানের সঙ্গেই নয়। ভারতের যাঁরা সত্যিকারের সুহৃদ তাঁরাও ভারতের সমর্থন করতে পারছেন না, যদিও পাকিস্তানকে সমর্থন করতেও তাঁরা অনিচ্ছুক। নিরপেক্ষ জনমত ক্রমেই এই দিকে যাচ্ছে যে কাশ্মীরকে ভারত পাকিস্তানের থেকে পৃথক করে দেওয়া উচিত। যাঁরা ভারতের শত্রু বা পাকিস্তানের মিত্র নন তাঁরাও বুঝতে পারছেন না কাশ্মীর স্বাধীন হলে কার কী ক্ষতি! ওই তো কেমন

আফগানিস্থান স্বাধীন। কেউ কেউ বলছেন কাশ্মীরকে আন্তর্জাতিক অধিকারে রাখতে। যেন সেটা বেওয়ারিশ সম্পত্তি।

ইতিহাস সতেরো আঠারো বছরে শেষ হয়ে যায় না। সামনের উনিশ বিশ বছরের কথাও ভাবতে হবে। কাশ্মীরের বর্তমান মর্যাদাই কি চূড়ান্ত? গুরুত্ব অনুসারে মর্যাদা, এই তত্ত্ব যদি সত্য হয় তবে আমার মতে কাশ্মীরের মর্যাদাবৃদ্ধি দূরদর্শিতার পরিচায়ক। তা বলে তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিয়ে পাকিস্তানের হাতে সঁপে দিতে কেউ বলছে না। ভালো করে মনে রাখতে হবে যে ভারত ত্যাগের দাবী অন্যায়, কিন্তু বেশীর ভাগ লোক যদি বিশেষ মর্যাদা চায় সেটা অন্যায় নয়। সেটা একপ্রকার বিকেন্দ্রীকরণ। জার্মানীর সংবিধান বাভেরিয়াকে বরাবর একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। গুরুত্ব অনুসারে মর্যাদা।

শেখ আবদুল্লা যদি কাশ্মীরের জন্যে আন্তর্জাতিক মর্যাদা দাবী করেন করেন তবে তাঁর দলবলের সঙ্গে আপস কোনো কালে হবে না। কাশ্মীর পাঁচ সাতটি বিদেশী শক্তির কূটনীতির মধুচক্র হয়ে ভারতের বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত হবে সেটা ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক। পাকিস্তান যে এতদূর অধঃপাতে যাবে এটা জানা থাকলে আমরা কি পাকিস্তান সৃষ্টিতে রাজী হতুম? তার চেয়ে গৃহযুদ্ধ ভালো। একবার যে ভুল করা হয়েছে আবার সেই ভুল আমরা করব না। করতে রাজী হব না। আন্তর্জাতিক জনমত যতই সেদিকে যাক। পাকিস্তান তৃতীয় একটা নেশন সৃষ্টির পক্ষপাতী নয়। আবদুল্লাকে নিয়ে সে তার নিজের খেলাই খেলেছে। আবদুল্লার খেলা খেলেনি। বলা যেতে পারে প্লেবিসাইটের দাবী বা আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী এমন একটা দাবী যে পাকিস্তানের মতে সেটা তার স্বার্থে, কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের মতে সেটা তাঁদের স্বার্থে। এটা দুই পরস্পরবিরোধী স্বার্থের গোঁজামিল। পাকিস্তানের লক্ষ্য দ্বিতীয়বার ভারত বিভাগ। কাশ্মীর প্রাপ্তির পর সে আসাম প্রভৃতির জন্ম হাত বাড়াবে। তখন তার লক্ষ্য তৃতীয়বার ভারত বিভাগ। আর কাশ্মীরী স্বাতন্ত্র্যবাদীদের লক্ষ্য অন্তর্জাতিক মর্যাদালাভ।

অন্তর্জাতিক মর্যাদা নয়, অথচ বিশেষ মর্যাদা, এর নজীর নানা দেশের সংবিধানে আছে। আয়রলণ্ডের উত্তরাংশ ইংলণ্ডের সঙ্গে রয়ে যায়, কিন্তু সর্বতোভাবে মিশে যায় না। তখন আয়ারলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীই বলা হয়, মুখ্যমন্ত্রী নয়। ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়তো শ্রমিক দলের, উত্তর আয়ারলণ্ডের

প্রধানমন্ত্রী হয়তো রক্ষণশীল দলের. তা বলে বিরোধ বাধে না। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদাহানি ঘটিয়ে লাভ কী হলো, জানিনে। কিন্তু লোকসান এই হলো যে শেখ আবদুল্লাকে কখনো মুখ্যমন্ত্রী পদে পাওয়া যাবে না। ভারতের নিজের স্বার্থেই একদিন তাঁকে প্রয়োজন হতে পারে। রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। আজ যে শত্রু কাল সে বন্ধু। যে কংগ্রেস নেতাদের আহমদনগর দুর্গে আবদ্ধ করা হয়েছিল তাঁদেরি আদর করে ডেকে নিয়ে গিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়ে দেওয়া হলো। সেইজন্যে বনিবনার দরজা খোলা রাখতে হয়। বন্ধ করে দিতে নেই।

মানবিক ব্যাপার পুরোপুরি যুক্তির দ্বারা শাসিত নয়। ভাইটাল বলে আরো একটি কথা আছে যা মানুষকে যুদ্ধবিগ্রহের দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়, বিদ্রোহ বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়। ভাইটালের সঙ্গে ভাইটালের সংঘর্ষে শেষ ফল নির্ধারিত হয়। কাশ্মীর ভারতের পক্ষে ভাইটাল, পাকিস্তানের পক্ষেও তাই, কাশ্মীরীদের পক্ষে তো বটেই। যুক্তিযুক্ত মীমাংসার জন্যে মন খোলা রাখতে হবে, দুয়ার খোলা রাখতে হবে, এ যেমন ঠিক তেমনি এটাও ঠিক যে যুক্তিযুক্ত মীমাংসা না হলে সংঘর্ষ অবধারিত ও শেষ ফল অনিশ্চিত।

খোলা মন ও খোলা দরজা

স্বাধীনতা দিবসে

আজ স্বাধীনতা দিবসে আপনার আরো একখানি পত্র পেয়ে সম্মানিত বোধ করছি।

সতেরো বছর আগে এই দিনটিতে আপনি পশ্চিমবঙ্গের ভার গ্রহণ করেন। আমিও সেদিন কলকাতায় আমার নূতন পদে যোগ দিই। আপনাদের সহকর্মীরূপে যে কয় মাস কলকাতায় ছিলুম সে কয় মাসের সরকারী কাজকে আমি দেশের কাজ বলেই মনে করেছি। একবারও মনে হয়নি যে আমি চাকুরে। আপনার অকালবিদায়ের পরে আমি মুর্শিদাবাদে বদলি হয়ে যাই। তখনো আমার মনে অনুরণন চলছিল যে আমি চাকরি করছিনে, দেশের কাজ করছি। কিন্তু আরো কয়েক মাস পরে হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারি সে জোয়ার চলে গেছে, সে উদ্দীপনা আর নেই। আমি পুনর্মূষিক। আমি সরকারী চাকুরে। আমি কারো সহকর্মী নই। আমি এক বছরকাল একটা স্বপ্নের মধ্যে কাটিয়েছি। জীবনের সেই এক বছর ভোলবার নয়।

তার পরে আমি স্থির করি আর চাকরি করব না। পুনর্মূষিক হব না। সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজে পরিণত করতে কয়েক বছর লাগল। সেটা আমার পায়চারি। আসলে আমার চাকরির বন্ধন খুলে যায় যেদিন ভারত স্বাধীন হয়। আগে থেকে সংকল্প ছিল যে দেশের যদি দরকার থাকে দেশকে আমি ছ'মাস কি এক বছর দেব। আপনাদের সহকর্মীরূপে। তার পরে আমি আমার সাহিত্যসৃষ্টিতে মনপ্রাণ সমর্পণ করব। দেশের কাজে প্রাণ দেবার প্রশ্ন একবার আমার সামনে হাজির হয়েছিল। আমার উত্তর হলো, প্রাণ যদি দিতে হয় তবে আমি দেব সাহিত্যের জন্যে বা প্রেমের জন্যে। আর-কিছুর জন্যে নয়; যার যেটা স্বধর্ম।

আমি যখন মুর্শিদাবাদে তখন মহাত্মা গান্ধী স্বধর্মে নিধন বরণ করেন। আমার সে সময় মনে হয় যে তাঁর অসমাপ্ত কাজ আর-পাঁচজনের মতো আমাকেও তুলে নিতে হবে। তাঁর অসমাপ্ত কাজ তো পর্বতপ্রমাণ আর শতবিধ। আমার সাধ্য কী যে সব রকম কাজে হাত দিই! সেইজন্যে আমি একটিই বেছে নিই। সেটি সাম্প্রদায়িক ঐক্য। এ বিষয়ে আমি দিনরাত ভেবেছি, যতবার পেরেছি ততবার লিখেছি। প্রধানত গান্ধীজীর শিক্ষাই অনুসরণ করেছি। এর জন্যে আমাকে বহু লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করতে

হয়েছে। কিন্তু এতে আমি বিরত হইনি। গান্ধীজীর প্রিয় কাজ করে যাচ্ছি বলে একপ্রকার তৃপ্তি লাভ করেছি।

যাঁরা চরকা খাদি বুনিয়াদী তালিম ইত্যাদি নিয়ে আছেন তাঁরা ঠিক পথেই আছেন। কিন্তু কতক লোককে নিষ্ঠার সঙ্গে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের মার্গেও চলতে হবে। এ ব্রত হয়তো একদিন শত্রুকেও বন্ধু করবে, কিন্তু এই সতেরো বছরের অভিজ্ঞতার আলোয় দেখছি বন্ধুকেও শত্রু করেছে। হিন্দু মুসলমানের ঐক্য সতেরো বছর আগে যাঁদের কাছে স্বতঃসিদ্ধ ছিল তাঁরাও এখন বলতে আরম্ভ করেছেন যে ও-জিনিস হবার নয়। কিংবা তাঁরা এখন পাকিস্তানের সুমতির উপর বরাত দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন। যেন পাকিস্তানই গান্ধীজীর উত্তরসাধক।

আজ কেবল স্বাধীনতা দিবস নয়। আজ পার্টিশন দিবস। এই দিনটিতেই দেশ ও প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। আনন্দের সঙ্গে বিষাদও আজকের অনুভূতি। এই বিষাদের সঙ্গে খালি তিক্ততা মেশাতে চাইনে। ভারতের স্বাধীনতা যদি গান্ধীজীর সিদ্ধি হয়ে থাকে তবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা জিন্না সাহেবের সিদ্ধি। পাকিস্তানী যাদের বলা হয় তারাও ভারতমাতার সন্তান। সেই দশ কোটি লোকের আনন্দ কি আমার নিরানন্দ? আমি যদি তাদের সুখে সুখী হতে না পারি তবে এই বিচ্ছেদ কোনো কালেই দূর হবে না। আমি জানি যে পার্টিশন বিনা দ্বন্দ্বে হয়নি। তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বহু রক্ত, বহু অশ্রু। বিষাদই এর স্বাভাবিক উপলব্ধি। কিন্তু কোটি কোটি মানুষের আনন্দ উপলব্ধির সঙ্গে নিজের উপলব্ধিকে মিলিয়ে নিতে পারাটাই মহত্ত্ব। আমরা যেন আমাদের স্বাভাবিক বিষাদকে অতিক্রম করতে পারি ও তার উর্ধ্বে উঠতে পারি।

ইংরাজীতে বলে, ভুল করাটাই মানুষের স্বভাব। মানুষ স্বভাবতই ভুল করে। কিন্তু সেইসঙ্গে এটাও মানতে হবে যে মানুষ ভুল করতে করতে ঠিক করতে শেখে। পার্টিশন যদি ভুল হয়ে থাকে তবে একদিন তার সংশোধন হবে। কবে, তা আমি বলতে পারব না। কেমন করে, তাও পারব না বলতে। এইটুকুই শুধু বলব যে পার্টিশন যদি ভুল হয়ে থাকে তবে কালে তার সংশোধন হবে। আর তাই যদি হয় তবে হিন্দু মুসলমানের ঐক্যই স্বতঃসিদ্ধ। এর বিপরীতটা অসিদ্ধ। আমরা ঠিক থাকব।

খোলা মন ও খোলা দরজা

দেশ ভাগাভাগির সময় আমার এক ইংরেজ সহকর্মী বলেন, "দশ বছর এর মেয়াদ। তারপর দেশ আবার এক হয়ে যাবে।"

তা শুনে আমি সবজান্তার মতো হাসি। বলি, "দ-শ বছর! কিছুতেই না। দেখবেন তিন বছর এর স্থিতি।"

হায়! তখনকার সেই আশাবাদ গেল কোথায়! আমরা যারা এ দেশে বহুদিন প্রশাসন কার্যে নিযুক্ত ছিলুম তারা ইংরেজই হই আর ভারতীয়ই হই দেশ ভাগাভাগিকে সাময়িক একটা রফা বলেই ধরে নিয়েছিলুম। চিরস্থায়ী একটা মীমাংসা মনে করিনি। মীমাংসার একটা সন্তোষজনক সূত্র আবিষ্কার করতে তিন বছরের বেশী লাগবার কথা নয়। বড়জোর দশ বছরই লাগুক। সে সময় আমরা কেউ ভাবতেই পারিনি যে সতেরো বছর বাদেও মীমাংসার কোনো গ্রহণযোগ্য সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না।

দুনিয়ার অন্যান্য দেশের দিকে চেয়ে দেখি একই সমস্যা দেশে দেশে। জার্মানীতে, কোরিয়াতে, ভিয়েৎনামে। আরো আগে থেকে আয়ারলণ্ডে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই মানুষ আশা করেছে ভাগাভাগিটা দু'দিনের জন্যে। সব দিনের জন্যে নয়। কিন্তু অতি বড় আশাবাদীর আশাবাদও বিরোধকে মীমাংসায় পরিণত করতে পারেনি। কবে করবে তাও জানে না। অনির্দিষ্টকাল পায়চারি করছে।

আশা যদি সুদীর্ঘকাল অপূর্ণ থাকে তা হলে মানুষ স্বভাবতই নৈরাশ্যবাদী হয়। তখন তার মুখে শোনা যায়, "মীমাংসা হবার নয় বলেই হয়নি। কোনো কালেই হবে না। এই যা দেখছ এটাই চিরন্তন, যদি না একে বাহুবলে উল্টে দাও।"

বাহুবলে উল্টে দেওয়া মানে এক পক্ষ অপর পক্ষকে যুদ্ধে পরাস্ত করে নিজের সিদ্ধান্তটাকেই অপরের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবে। সেটার নাম দু'পক্ষের মীমাংসা নয়। সেটা একতরফা একটা ব্যাপার। বলা বাহুল্য তাতে অপর পক্ষের আন্তরিক সম্মতি নেই। যেমন জাপানের আন্তরিক সম্মতি নেই মার্কিনের সঙ্গে সন্ধিব্যবস্থায়। পরে একদিন জাপান প্রবল হয়ে সন্ধিপত্র ছিঁড়তে চাইবে।

ভারত ও পাকিস্তান যদি বাহুবলের সাহায্যে সমাধান খোঁজে তা হলে ভুল করবে। সেটা বিপথ। যুদ্ধে সফল হয়েও নিশ্চিন্ত হবার জো নেই। পরে আবার বলপরীক্ষার সম্ভাবনা থাকবে। এক মাঘে শীত যায় না। ভারতের শত্রুদের শিবিরে যোগ দিয়ে পাকিস্তান যদি ভারতকে হারিয়ে দেয় তা হলে শেয়ালের হিস্সা হিসাবে সে যা পাবে ওটা সাময়িক লাভ। তেমনি পাকিস্তানকে পরাস্ত করে ভারত যা পাবে সেটাও সাময়িক।

যুদ্ধের পরিবর্তে দাঙ্গা বাধলে কি সমাধান আরো সুগম হবে? না, ওপথেও সমাধান নেই। ওটাও বিপথ। গত সতেরো বছরে আমরা বার বার একই দৃশ্য দেখলুম। তাতে ভারত বা পাকিস্তান কারো মূল পলিসির এদিক ওদিক হলো না। শুধু সংখ্যালঘুরাই ছুটল ওদিক থেকে এদিক, এদিক থেকে ওদিক। কয়েক লক্ষ নিরীহ নিরপরাধ উলুখাগড়াকে উন্মূল করে কার কী লাভ হলো বোঝা গেল না। যারা পালিয়ে এলো তারা অবশ্য নিরাপদ হলো, কিন্তু যারা তা পারল না তাদের বিপদ তো কাটল না। বরং তাদের মনোবল আরো কমল।

প্রত্যেকবারই লোকবিনিময়ের রব উঠেছে। বেসরকারীভাবে একপ্রকার লোকবিনিময় ঘটেও গেছে। সরকারীভাবে ঘটাতে হলে উভয় রাষ্ট্রের একমত হওয়া চাই। তার জন্যে দু'পক্ষের কর্তাদের একসঙ্গে বসা চাই। কিন্তু সেই জিনিসটিই সবচেয়ে শক্ত। কোনো মতে দু'জন মন্ত্রীকে যদি একত্র করা যায় তাঁদের বৈঠকের আনাচে-কানাচে আড়ি পাতেন তৃতীয় পক্ষের রাষ্ট্রদূত। তৃতীয় পক্ষের অবিদ্যমানে ভারত-পাকিস্তান কথা বলবে ও একমত হবে সতেরো বছরে আমরা এতটুকুও এগোতে পারিনি। সুতরাং সরকারীভাবে লোকবিনিময়ের সম্ভাবনা নেই। সেটা সদ্‌ভাবনাও নয়।

সকলেই বুঝতে পারছেন যে, এ রকম অবস্থা মানুষের অসহ্য। বিশেষত পূর্বপাকিস্তানের হিন্দুদের অবস্থা সম্পূর্ণ দুর্বহ। কিন্তু তার প্রতিকার কি এই যে, ভারতের বা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের অবস্থাকেও সম্পূর্ণ দুর্বহ করে তুলতে হবে? তাও তো কেউ কেউ করে দেখেছে। রক্ত ও অশ্রুর মহাসাগর পার হয়ে পাঞ্জাবের হিন্দু-মুসলমান ও শিখ কি একজাতিত্বে উপনীত হয়েছে, না দ্বিজাতিতত্ত্বকে দৃঢ়তর করেছে? দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে চূড়ান্ত মীমাংসা কস্মিন্ কালেই হবার নয়। হলে তাতে ভারতেরই পরাজয়। দ্বিজাতিতত্ত্ব মেনে নিলে কাশ্মীর রাখতে পারা যাবে কি?

না যুদ্ধ, না শান্তি। এই গোধূলিকে সতেরো বছর কাল প্রসারিত করা গেছে, চাইকি আরো সতেরো বছর প্রসারণ করা যায়। ইউরোপেও তাই দেখছি। জার্মানরাও সহ্য করছে। ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে, যাকে আরোগ্য করতে পারা যায় না তাকে সহ্য করতেই হয়। তবে এমন একদিন আসবে যেদিন পাকিস্তানীদেরও অসহ্য বোধ হবে। ভারতীয় বা কাশ্মীরী মুসলমানদের উপর অত্যাচার হচ্ছে বলে নয়, সংকীর্ণ একটা এলাকায় চলাচলবিহীন অবরুদ্ধ জীবন পাকিস্তানী মুসলমানদের খর্ব করে রাখছে বলে। ওদের গণতন্ত্রের আশা যখন বিড়ম্বিত হবে তখন ওখানকার ঘটনাপ্রবাহ দ্রুত হবে। গণতন্ত্রের জন্যে সংগ্রামে নেমে ওখানকার লোক ভারতবিমুখ ও হিন্দুবিমুখ মনোভাব অতিক্রম করবে।

সেই শুভদিনটির জন্যে আমরা মন খোলা রাখব, দরজা খোলা রাখব। মীমাংসার ইচ্ছা দেখলেই হাত বাড়িয়ে দেব। মীমাংসা মানে দু'পক্ষের যাতে মন মানে। একপক্ষের মন না মানলে মীমাংসা হতে পারে না। যা হয় তার নাম একতরফা ডিক্‌টেশন। কিংবা তৃতীয় পক্ষের রোয়েদাদ। বলা বাহুল্য ডিক্‌টেশন বা রোয়েদাদ ভারত মেনে নিতে নারাজ। পাকিস্থান যদি মীমাংসার কথা ভাবে তবে ওসব বাদ দিয়েই ভাবতে হবে।

ভারত-পাকিস্তান বিরোধের পূর্ব অধ্যায় কংগ্রেস-লীগ বিরোধ। তারও পূর্ব অধ্যায় হিন্দু-মুসলিম বিরোধ। গোড়ার কথাটা হলো মুসলমানরা যদি কিছু পায় তবে সেটা যেন হিন্দুদের বঞ্চিত করে না পায়। পিটারের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে পলকে দেওয়া, এই ছিল তৃতীয় পক্ষের নীতি। এইখানেই হিন্দুদের আপত্তি। মীমাংসা যদি কাম্য হয় তবে এ নীতির বদলে অন্য কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে। যাতে পিটারেরও ক্ষতি না হয়, পলেরও লাভ হয়। পিটারকে ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য করা উচিত নয়, তবে সে যদি স্বেচ্ছায় ক্ষতি স্বীকার করে সেটা তার মহত্ত্ব। পল্ যদি মহত্ত্ব প্রত্যাশা করে তবে মহত্ত্ব দেখাতে প্রস্তুত হোক। শত্রুদের শিবিরে যোগ দেওয়া বন্ধ করুক, চিরস্থায়ী বন্ধুতার জন্যে তৈরি হোক। বিশ্বাসী বন্ধুর জন্যে মানুষ অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে রাজী হয়। কিন্তু যে প্রতিবেশীকে বিশ্বাস নেই তার জন্যে কে কবে নিজের পাওনা ছেড়ে দেয়?

শেষ পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে, ভারত ও পাকিস্তান পরস্পরের বন্ধু না শত্রু? শত্রু হয়ে থাকলে এতদিনে পুরোদস্তুর যুদ্ধ বেধে গিয়ে থাকত। না, শত্রু নয়।

বন্ধু হয়ে থাকলে এতদিনে একসঙ্গে বসে মীমাংসা হয়ে থাকত। না, বন্ধুও নয়। ভবিষ্যতে কী হবে, বন্ধু না শত্রু? কেউ বলতে পারে না। তবে একটা কথা ক্রমে পরিষ্কার হয়ে আসছে। পূর্বপাকিস্তান আর বেশীদিন পশ্চিমপাকিস্তানের ছোট তরফ হয়ে থাকতে ইচ্ছুক নয়। তার ভৌগোলিক অবস্থান, তার বৈষয়িক স্বার্থ, তার সাংস্কৃতিক প্রয়োজন তাকে ভারতের সঙ্গে মীমাংসা করতে বাধ্য করবে। তা হলে শত্রুতা করার জন্যে বাকী থাকবে পশ্চিমপাকিস্তান। পূর্বপাকিস্তান বেরিয়ে গেলে পশ্চিমপাকিস্তানের অন্তঃপরিবর্তন ত্বরান্বিত হবে। মীমাংসার দিন আগত হবে।

মীমাংসা যে সূত্রেই হোক না কেন, দেশভঙ্গ রদ হবে না। দুটো রাষ্ট্রই থাকবে। সুতরাং মাঝখানকার সীমারেখাও থাকবে। সতেরো বছর আগে আমরা যা আশা করেছিলুম তা পূর্ণ হবে না। দুই রাষ্ট্র এক হয়ে যাবে না। সে লাইনে চিন্তা করা নিষ্ফল। হলাণ্ড-বেলজিয়াম এখনো এক হয়নি। কেটে গেছে চারশ' বছর। কিন্তু ওরা অধিকাংশ ব্যাপারে একাত্ম।

কারো পৌষ মাস

"দেশের আজ চরম দুর্দিন," বললেন একজন বিখ্যাত নেতা ও কর্মযোগী, "আপনারা দেশের সাহিত্যিকরা কিছু করুন।" তিনি রুশোর দৃষ্টান্ত দিলেন।

আমরা সাহিত্যিকরা যে কিছুই করছিনে তা নয়। আমরা আমাদের আপনার আপনার চরকায় তেল দিচ্ছি। বলা বাহুল্য সেটা সরষের তেল নয়। আমরা গল্প উপন্যাসের সুতো কাটছি। কবিতার তুলো ধুনছি। প্রবন্ধের কাপড় বুনছি। আমরা কিছু না করে চুপ করে বসে থাকলে প্রকাশকরা দেউলে হতেন, সম্পাদকরা বেকার হতেন, মুদ্রাযন্ত্র অচল হতো, পাঠকরা পাঠ্যের অভাবে পড়াশুনা ভুলে যেতেন। আমরা দেশের সংস্কৃতিকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, থামতে দিচ্ছিনে।

মানুষ কেবল রুটি দিয়ে বাঁচে না। অন্নের উপরেও আরো কিছু চাই। সেটার সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে সভ্যতা লোপ পেয়ে যায়। ইতিহাসে দেখা যায় মাঝে মাঝে সেরকম হয়েছে। সাহিত্যিকেরা সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, সঙ্গীতকারেরা সঙ্গীত সৃষ্টি করেননি, চিত্রকরেরা চিত্র সৃষ্টি করেননি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কয়েকটা শতাব্দী একেবারে ফাঁকা। সম্ভবত দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না, কৃষি ও শিল্প সকলের অভাব পূরণ করছিল না, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছিল, পান্তা আনতে নুন। সাহিত্যিকরাও হা অন্ন হা অন্ন করে রাজারাজড়ার দরবারে কাঙালের মতো ঘুরছিলেন। ভাববেনই বা কখন, লিখবেনই বা কখন!

সাহিত্যিকরা যদি কোনো মতে সাহিত্যের কাজ চালিয়ে যেতে পারেন তা হলে আর কিছু না হোক অন্তত এইটুকু হবে যে ইতিহাসের একটা অধ্যায়ে নাম করবার মতো কিছু সাহিত্যকীর্তি থাকবে। নয়তো একটা যুগ একেবারেই ফাঁকা যাবে! দেশের প্রাণশক্তি অত সহজে নিঃশেষ হবে না, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেলেও কোটি কোটি মানুষ বেঁচে থাকবে। কিন্তু দেশের সৌন্দর্যসাধনা যদি সাধকের অভাবে স্তব্ধ হয় তা হলে এক পুরুষ কি দু'পুরুষ ধরে সাহিত্যের সঙ্গীতের ও অন্যান্য কলার বন্ধ্যাত্ব ঘটবে।

আমাদের প্রথম কর্তব্য সৌন্দর্যের প্রতি, সাহিত্যের প্রতি। জননীর প্রথম কর্তব্য যেমন সন্তানের প্রতি। একে অবহেলা করে আর কোনো

কাজে হাত দেওয়া উচিত নয়। হাত দিলেই যে সেকাজ ভালো হবে তাও নয়। সাহিত্য ছেড়ে দেশের কাজে যাঁরা ঝাঁপ দিয়েছেন দেশ তাঁদের ক'জনকেই বা মনে রেখেছে? ক'জনকেই বা মূল্য দিয়েছে? সাহিত্যে স্থির থাকলে হয়তো তাঁরা দেশের সাহিত্যিক সম্পদ বাড়িয়ে দিয়ে যেতে পারতেন।

তবে সাহিত্যিকরাও নাগরিক, নাগরিক হিসাবে আর সকলের মতো তাঁদেরও কিছু করণীয় আছে। দেশ বিপন্ন হলে দেশরক্ষার কাজে সবাইকেই ডাক পড়ে। কে সাহিত্যিক কে সাহিত্যিক নন সেটা ক্ষণকালের জন্যে গৌণ হয়। আপৎকালে মুখ্য হয় সকলের নাগরিক কর্তব্য। এদিক থেকে বিচার করলে আপৎকালে সাহিত্যিককেও এমন কিছু করতে হয় যা ঠিক সাহিত্যের কাজ নয়।

কিন্তু সেটা যদি ক্ষণকালের না হয়ে দীর্ঘকালের হয় তা হলে সাহিত্যের ক্ষতি অনিবার্য। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর সাহিত্যিক যদি সাহিত্যচর্চা না করে অন্য চর্চা করেন তা হলে তাঁর লেখার হাত নষ্ট হয়ে যায়। যেমন গাইয়ের গলা বা নাচিয়ের পা। যে সঙ্কট অল্পদিনের তার জন্যে নাচ গান কবিতা স্থগিত রাখা চলে, কিন্তু যে সঙ্কট দীর্ঘমেয়াদী তার খাতিরে ওসব স্থগিত রাখা মানে সরস্বতীকে বঞ্চনা করা, দর্শক পাঠক সাধারণকে বঞ্চিত করা।

এখন কথা হচ্ছে আমাদের আজকের এই সঙ্কট কি ক্ষণকালের না দীর্ঘকালের? এটা যদি সাময়িক একটা উৎপাত হয়ে থাকে তবে সাহিত্যিক এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে সমাজের উপকার করতে পারেন, তাতে তাঁর নিজেরও উপকার। কিন্তু এটা যদি দু'চার মাসের মধ্যে মিটে না যায় তা হলে তিনি কতকাল এই নিয়ে সময়ক্ষেপ করবেন! তাতে কার কী উপকার! আজকের জগতে অর্থনীতির ঘোরপ্যাঁচ বোঝা সাধারণ সাহিত্যকের কর্ম নয়। বড়ো বড়ো অর্থনীতিকরাই হালে পানী পাচ্ছেন না। তাঁদেরও নানা মুনির নানা মত। বিপরীত মতও দেখতে পাওয়া যায়। অর্থনীতি না হয় কোনো মতে আয়ত্ত করা গেল কিন্তু প্রশাসনের দোষত্রুটি সারানোর উপায় কি আমাদের হাতে? প্রশাসন এমন একটা যন্ত্র যাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে সব সময়ে তার পিছনে লেগে থাকতে হয়। বাইরের লোক তা পারে না। তাকে ভিতরে ঘেঁষতে দেওয়া হয় না।

বাইরে থেকে যতদূর অনুমান করতে পারি অর্থনীতির দিক থেকে ভুলভ্রান্তি ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনের দিক থেকে বিশৃঙ্খলা। যখন প্রশাসন ব্যবস্থার ভিতরে ছিলুম তখন দেখেছি কর্তারা চান ইয়েস-ম্যান। যে সব কথায় 'হাঁ-জী' হাঁ-জী' বলবে। যেটা সম্ভব নয় সেটাকেও বলবে সম্ভব। যেটা সঙ্গত নয় সেটাকেও বলবে সঙ্গত। যারা 'না-জী' বলবে তারা পাজী। তাদের যেমন করে হোক তাড়াতেই হবে। তারা যদি পদত্যাগ করে তা হলে আনন্দে হরির লুট পড়ে যায়। দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর যেভাবে প্রশাসনকে বাস্তবতাবর্জিত করা হয়েছে তার প্রতিশোধ তুলছে বাস্তব। সেক্রেটারিয়াটের বাইরের বাস্তব। মন্ত্রীমণ্ডলীর বাইরের বাস্তব। রাজা ক্যানিউট ও তাঁর সভাসদদের হুকুম মানতে চাইছে না সমুদ্রের ঢেউ। সে তো কারো ইয়েস-ম্যান নয়।

বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হতে হলে মফঃস্বলে বসবাস করতে হয়। কিন্তু মন্ত্রী হলে দিল্লী কিংবা কলকাতা হয় বারো মাসের কেন্দ্র। মাঝে মাঝে একবার বেড়িয়ে আসা ছাড়া জনগণের সঙ্গে আর কোন যোগাযোগ ঘটে না। অন্তত পাঁচটি বছর তো জনগণের কাছ থেকে অনুপস্থিত থাকা হয়ই, কারো কারো বেলা পাঁচ হয়ে দাঁড়ায় পনেরো। মন্ত্রীদের ওয়াকিবহাল করে রাখা যাঁদের কাজ তাঁরাও অনেক সময় কলকাতায় বা দিল্লীতে কাটান। কারো কারো অধিষ্ঠান রাজধানীতেই। নির্বাচনকেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু দরকারের সময় বা বিল তৈরির সময়। সরকারী কর্মচারীরাও যে বাস্তবনিষ্ঠ হবেন তারই বা অবসর কোথায়! আগেকার দিনে কোনো কর্মচারীকেই তিন বছরের বেশী কলকাতায় বা দিল্লীতে রাখা হতো না। আজকাল যিনি একবার কলকাতা বা দিল্লীতে বদলি হন তিনি সাধারণত সেখান থেকে বদলি হন না। মফঃস্বলে ফিরে যাবার রেওয়াজ উঠে গেছে। হয় বিমানযোগে নয় মোটরযোগে কয়েক ঘণ্টা চক্কর দিয়ে আসার নাম বাস্তবের নাড়ীতে হাত রাখা নয়। যেমন বিশ হাজার লোকের সভায় বক্তৃতা দেওয়া নয় জনতার নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা।

যাঁদের উপর ভার দিয়ে দেশের লোক নিশ্চিন্ত তাঁদের ক'জনেরই বা দেশের বাস্তব অবস্থার উপর 'গ্রিপ' আছে। স্বাধীনতার আগে ছিল। তারই জের চলেছে এতকাল। কামরাজ এই সমস্যার একটা সমাধান চেয়েছিলেন। কামরাজ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল রাজনীতিকদের বাস্তবের অভিমুখীন করা।

দিল্লীর বা কলকাতার অভিমুখীন যেন অল্প কয়েকজনই হন। আর সকলে মফঃস্বলের অভিমুখীন। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে কি? যাঁরা সরকার থেকে সরে গেছেন তাঁরাও সরকারকেই ঘিরে ঘিরে ঘুরছেন। জনগণকে নয়। পাঁচটা বছরও তাঁরা বাইরে থাকবেন না। তা হলে বাস্তবজ্ঞান হবে কী করে? বিমানে-বা মোটরে ঘোরাফেরা করে?

আমরা আজ যা দেখছি তাকে বলতে পারি ক্রাইসিস অফ রিয়ালিটি। কলকাতা দিল্লী প্রভৃতি স্থানের বাতায়ন খুলে রিয়ালিটিকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাওয়া ও ব্যর্থ হওয়া। আঁধারে একটার পর একটা ঢিল ছোঁড়া চলেছে। লেগেও যেতে পারে এক আধটা। কিন্তু আঁধার তাতে যাবে না। ঢিল ছোঁড়াও থামবে না। কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ! এই যে পৌষমাস এটা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে ভয় হয়। তা বলে যাঁরা মনে করেছেন এটা বিপ্লবের পূর্বলক্ষণ তাঁরা অকারণে আতঙ্কিত। গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে। লোকের গায়ের জ্বালা জুড়োবার জন্যে নির্বাচনের বৈতরণী থাকতে লোকে কেন প্লাবন কামনা করবে? তার মাশুল তো বড়ো কম নয়।

বিপ্লব সেইসব দেশেই ঘটে যেসব দেশে গণতন্ত্র নেই কিংবা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। আমাদের দেশে গণতন্ত্র আছে। তা হলে প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা কি জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন বা সেই পথে চলেছেন? তাই যদি হতো তবে জবাহরলাল যখনি যেখানে যেতেন তখনি তাঁকে দেখতে রথযাত্রার ভিড় হতো না। তাঁর আকস্মিক প্রয়াণের পর কোটি কোটি মানুষ আত্মীয়বিয়োগের শোকে মুহ্যমান হতো না। তিনি নেই, কিন্তু তাঁর আসনে যিনি বসেছেন তিনিও জনগণের বিশ্বাসভাজন। যেখানে লোকপ্রতিনিধিদের উপর লোকের আস্থা আছে সেখানে বিপ্লবের কথা ওঠে না। আস্থা যদি চলে যায় তবে সময়মতো নির্বাচন করলে অপর একদল লোকপ্রতিনিধি অধিকসংখ্যকের ভোটে রাষ্ট্রপরিচালনার ভার নেন। জোর করে গদী দখল করতে হয় না।

কিন্তু সময়মতো নির্বাচন যদি না হয়, নির্বাচনকে যদি একটা না একটা অজুহাতে বার বার পিছিয়ে দেওয়া হয়, নির্বাচনের নিয়মগুলো যদি পাকিস্তানের মতো বদলে দেওয়া হয়, গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে যদি ভোট আদায় করা হয়, অন্যান্য দলের প্রার্থীদের যদি ধরে ধরে জেলে দেওয়া হয় তা হলে

নির্বাচনের ফলাফলের উপর জনগণের কোনো আস্থা থাকে না। দক্ষিণ আমেরিকায় এর দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু বিপ্লব হলেই যে লোকে পরমার্থ পায় তাও নয়। বিপ্লবের পর ক্ষমতা যাদের হাতে পড়ে তারাও জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে, এ রকম হামেশা দেখা যায়। এসব ক্ষেত্রে গণতন্ত্র যেমন একটা মুখোশ বিপ্লবও তেমনি একটা মুখোশ। জনগণ যে তিমিরে জনগণ সেই তিমিরে। সব চেয়ে ভালো গণতন্ত্রকে ঠিকমতো চালু রাখা ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন পরিচালনা করা। অপক্ষপাত অবাধ নির্বাচন।

তার মানে যে-দলই ক্ষমতা লাভ করুন নির্বাচন যথাকালে ও বিধিমতো হবে। নতুন একদল ক্ষমতার আসনে বসে চিরস্থায়ী হবার জন্যে নির্বাচন প্রথাটাই রদ করবেন না, কিংবা তার নিয়ম কানুন বদলে দেবেন না। তা যদি তাঁরা করেন তবে সেটাও হবে বিশ্বাসঘাতকতা। অন্যান্য দেশের ইতিহাসে তারও নজীর আছে। ক্ষমতা একবার পেলে সহজে হাতছাড়া করতে কেউ চায় না। বলপরীক্ষার দরকার হয়। পরিস্থিতি বৈপ্লবিক আকার নেয়। পরিস্থিতির সুযোগ যে বামপন্থীরাই নেবেন এমন কোনো ঐতিহাসিক নিয়ম নেই। দক্ষিণপন্থীরাও নিতে পারেন। সামরিক নেতারাও। মিলিটারি ডিকটেটরশিপ একাধিক দেশে দেখা গেছে। বিপ্লবের উপর বরাত দিয়ে যাঁরা খোশমেজাজে আছেন তাঁরা জানেন না যে লাল বিপ্লব ঘটার আগেই হয়তো কালো বিপ্লব ঘটবে, আর নয়তো সামরিক একনায়কত্ব। সেটাও অভ্রান্ত অথবা নিখুঁৎ নয়। সেটাও অনন্ত অথবা চূড়ান্ত নয়। একদিন না একদিন গণতন্ত্রেই ফিরে আসতে হবে।

কিন্তু গণতন্ত্রেরও একটা প্রচ্ছন্ন শর্ত আছে। সে কেবল স্বশাসন নয়, সে সুশাসন। রাজতন্ত্রেরও প্রচ্ছন্ন শর্ত সুশাসন। মোগলরাজত্ব যে দু'শো বছর স্থায়ী হলো তার কারণ মোগল বাদশারা ছিলেন মোটের উপর সুশাসক। ইংরেজ রাজত্বও যে দু'শো বছর স্থায়ী হলো তার কারণ ইংরেজ বড়লাটরা ছিলেন মোটের উপর সুশাসক। তাঁরা ভালো করেই জানতেন যে তাঁরা লোকপ্রতিনিধি নন, লোকের সম্মতি পেতে হলে সুশাসনই তাঁদের একমাত্র নির্ভর। তাঁরা গায়ের জোরে ছিলেন বা ভেদনীতির সাহায্যে ছিলেন এটা স্থূল দৃষ্টির কথা। তাঁরা ভারতবর্ষকে ঐক্য দিয়েছিলেন, আইন আদালত দিয়েছিলেন, প্রশাসনিক শৃঙ্খলা দিয়েছিলেন, বৈদেশিক আক্রমণ ও

আভ্যন্তরিক যুদ্ধবিগ্রহের হাত থেকে শান্তি দিয়েছিলেন ও আধুনিক জগতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন বলেই এতকাল ছিলেন।

কিন্তু সুশাসনের চেয়ে বড়ো কথা হলো স্বশাসন। পরের ছেলে সাবালক হলে তাকে তার ইচ্ছামতো চলতে দেওয়াই ভালো। সে হয়তো বিপথে যাবে ও সম্পত্তি খোয়াবে। তবু তাকে সুশাসনের নামে নাবালক করে রাখতে নেই। ইংরেজরা এটা যথাসময়ে বুঝতে পারলে সত্যাগ্রহের আবশ্যক হতো না। ত্রিশ বছর লেগে গেল তাদের সত্যাগ্রহের দ্বারা বোঝাতে। আজকাল যার খুশি সেই সত্যাগ্রহ ঘোষণা করে, যেন ওটা সদ্যফলপ্রদ একটা মন্ত্র। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের পিছনে জীবনব্যাপী প্রস্তুতি ছিল। তার প্রথম পর্বটা দক্ষিণ আফ্রিকায়। অধিকাংশ ভারতীয় সে বিষয়ে অজ্ঞ। তার অনিবার্য আনুষঙ্গিক ছিল গঠনমূলক কর্ম। অধিকাংশ রাজনীতিক সে বিষয়ে উদাসীন। চরকা বললেই তাঁদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়। অথচ সত্যাগ্রহ শুনলেই তাঁরা লাফিয়ে ওঠেন। চরকা হচ্ছে পায়ের তলার মাটি। মাটি তৈরি না হলে লাফ দেওয়া যায় না। শূন্যে লাফ দিলে হাত পা ভাঙে। বিনোবাজী কোনো দিন সত্যাগ্রহের ডাক দেবেন কি না বলতে পারব না। এইটুকু বলতে পারি যে তিনি তার জন্যে মাটি তৈরি করে চলেছেন এক মনে, অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং বৈজ্ঞানিকভাবে।

সুশাসন আমাদের জনসাধারণের জানা ছিল। তারা ওটা ভুলে যায়নি। ওটাও তারা চায়। না পেলে অশান্ত হয়। মাঝে মাঝে নির্বাচন দিয়ে তাদের সমঝানো হয় যে তাদের ভাগ্য তাদেরি হাতে। তারা সাবালক। তারা স্বশাসিত। কিন্তু সুশাসনের অভাব তাতে মেটে না। বরং বাড়ে। কারণ নাবালক যেমন অল্পে সন্তুষ্ট সাবালক তেমন নয়। আগেকার দিনে প্রশাসন ঢের সহজ ছিল, লোকে ধরে নিত যে অল্পই পরাধীনদের পাওনা। এখন তারা অধিকের ধ্যান করে। ফলে প্রশাসন ঢের কঠিন হয়েছে। সুশাসনের অভাব মেটানো দিন দিন জরুরি হয়ে উঠছে। শুধুমাত্র স্বশাসনই যথেষ্ট নয়। তা বলে স্বশাসনকে ধ্বংস করলেই যে সুশাসন আসমান থেকে পড়বে, এটা মূঢ়তা। স্বশাসন বহু কষ্টে অর্জন করা গেছে, তাকে ধ্বংস করলে আবার পরাধীনতা। তাকে অক্ষত রেখে তারই ভিত্তির উপর গড়তে হবে সুশাসন।

বিখ্যাত নেতা ও কর্মযোগী বললেন, "এ রকম যদি চলে তবে হয় মিলিটারি ডিকটেটরশিপ, নয় অরাজকতা ও কেওস, নয় বৈদেশিক অকুপেশন।" এমন

কিছু নতুন কথা নয়। অনেকেই বলাবলি করছেন। জবাহরলাল চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ধান চাল গম আটা তেল নুন মাছ ইত্যাদি উধাও দেখে অনেকেরই মাথায় আকাশ ভেঙে পড়েছে, পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে। কাল সন্ধ্যাবেলা গ্রামের লোক ভাদুর গান শুনিয়ে গেল। "স্বাধীন ভারতে, ভাদু, বড়ো কষ্ট হয়েছে।" গানের অন্যান্য কথাগুলি আমি রিপোর্ট করব না। সিডিশন আইন আছে কি না জানিনে, ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আইন তো আছে। গ্রামের লোককে ধরিয়ে দিয়ে আমার কী লাভ! বেচারিদের কেউ শিখিয়ে দেয়নি। রুশপন্থী বা চীনপন্থী কমিউনিস্টরাও তাদের শেখায়নি। সমস্তটাই অশিক্ষিতপটুত্ব। সবাই ভুক্তভোগী, কেউ বা কম কেউ বা বেশী। কী দারুণ অনর্থের পটভূমি প্রস্তুত হচ্ছে।

বিখ্যাত নেতাকে আমি বললুম, "আপনি তিনটি বিকল্পের উল্লেখ করলেন। আরো একটির করেননি। সেটি হচ্ছে আবার ভারত বিভাজন।" তিনি চমকে উঠলেন। সকলেরই এটা মনে রাখা উচিত যে সারা ভারতের শাসনভার এখন একটিমাত্র পার্টির হাতে আছে। কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে তারাই সংখ্যাধিক। সুতরাং ক্ষমতা ও দায়িত্ব তাদের কাঁধেই ন্যস্ত। কিন্তু এমন যদি হয় যে কোনো পার্টিই কোনোখানে সংখ্যাধিক নয়। সর্বত্র গোঁজামিল, সর্বত্র কাঁধবদল। তখন ক্ষমতার সঙ্গে দায়িত্বের সমতা থাকবে না। গণতন্ত্রের বিচারে সেটা বেআইনী নয়। জনগণের প্রতি সেটা বিশ্বাসঘাতকতা নয়। অথচ অচল অবস্থা। কংগ্রেস ও লীগ গোঁজামিল দিয়ে দেশ শাসন করতে পারত না বলেই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়াকে দুটি কেন্দ্রের মধ্যে ভাগ করে দিতে হলো। এক ভাগ পুরোপুরি কংগ্রেসশাসিত। অপর ভাগ পুরোপুরি লীগশাসিত। ভবিষ্যতে কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, স্বতন্ত্র, সোশিয়ালিস্ট, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি বারো রাজপুত যদি গোঁজামিল দিয়ে দেশ শাসন করতে না পারে তবে তেরো হাঁড়ির নজীর তো আমাদের ইতিহাসেই রয়েছে। এর জন্যে দাঙ্গাহাঙ্গামার দরকার করে না। অচল অবস্থাই যথেষ্ট।

রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই। ভারত পাকিস্তানও একদিন জুড়ে যেতে পারে। তেমনি পাকিস্তান দু'ভাগ হয়ে যেতে পারে, ভারত তিন ভাগ হয়ে যেতে পারে। ভালো মন্দ বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত কত কী সম্ভবপর। যাঁরা প্রাজ্ঞ তাঁরা বাহ্য ঘটনার উপরে দেশের ভাগ্য ছেড়ে না দিয়ে নিজেরাই হাল ধরবেন ও প্রাণপণে দেশের ভাগ্যনির্ণয় করবেন। সরকারের বাইরে

থেকেও হাল ধরা যায়। ভাগ্যনির্ণয় করা যায়। গন্ধীজী বাইরে থেকেও হাল ধরেছিলেন, বিনোবাজীও তাই করছেন। কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা কাম্য সেবিষয়ে নিশ্চিত হয়ে একমনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যেতে হবে। বিভ্রান্ত জনতা তখন আলোর জন্যে সেইদিকেই তাকাবে।

আমরা সাহিত্যিকরাও শক্ত হাতে হাল ধরতে পারি। ঘটনার স্রোতে ভেসে না গিয়ে প্রাণপণে গতিনির্ণয় করতে পারি। কিন্তু তার আগে আমাদের নিশ্চিত হতে হবে ভারতের জনগণের পক্ষে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা কাম্য। যাঁরা এবিষয়ে নিশ্চিত নন তাঁরা যদি নিছক সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে থাকেন তবে তাঁদের দোষ দেওয়া উচিত নয়। অর্থনীতির এলাকায় নিয়ন্ত্রণ ভালো কি অনিয়ন্ত্রণ ভালো, পরিকল্পনা ভালো কি অপরিকল্পনা ভালো এ নিয়ে গুরুতর মতভেদ রয়েছে। অন্য কোনো কোনো দেশে এসব ইস্যুতে শ্রেণীসংঘর্ষ বেধে গেছে। যে মূলধন জোগায় তার স্বার্থ আর যে শ্রম জোগায় তার স্বার্থ, আর যে উৎপাদন করে তার স্বার্থ ও যে উপভোগ করে তার স্বার্থ কেমন করে ব্যালান্স করা যায় এ নিয়ে গবর্ণমেণ্টের ভিতরেই গভীর মতানৈক্য। ব্যালান্স হারালে গবর্ণমেণ্ট ভেঙে যেতে পারে, পার্টি ভেঙে যেতে পারে। এমন কি রাষ্ট্র ভেঙে যেতে পারে।

তারপর দুর্নীতি নিয়ে যদিও প্রত্যেকে ক্রুদ্ধ তবু সে ক্রোধকে হিংসাত্মক কার্যকলাপের পথ নির্দেশ করা যায় না। কেউ যদি দুর্নীতি দূরীকরণের কোনো অহিংস উপায় জানেন তো দেশবাসীকে জানাতে পারেন, নয়তো দুর্নীতি দমনের ভার সরকারের উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি দুর্নীতির উর্ধ্বে থাকতে পারলেই যথেষ্ট। ঈশ্বর সব মানুষের কাছে অসাধ্য সাধন দাবী করেন না। যিনি যেটুকু সাধন করতে পারেন সেইটুকুতেই ভগবানের সন্তোষ। যীশু বা গান্ধীর মতো প্রাণদান করা সকলের সাধ্য নয়। লিঙ্কন বা কেনেডির মতো মৃত্যুও সকলের জন্যে নয়। কিন্তু যাঁরা রাজনৈতিক দায়িত্ব নিয়েছেন বা প্রশাসনের উপর মহলে রয়েছেন তাঁদের কাছে সৎসাহস প্রত্যাশা করা অহেতুক নয়। শিরদার তো সরদার। কড়া কড়া আইন করে কঠোরভাবে প্রয়োগ না করলে দুর্নীতি দূর হবে না। আর দুর্নীতি যদি দূর না হয় তো লোকের মনোবল নষ্ট হবে। ডিমরালাইজেশনের উৎপত্তি হবে। জার্মানীতেও এই জিনিস হয়েছিল। জার্মান জাতিকে এর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্যে হিটলারের অভ্যুদয় হয়। সোশিয়াল ডেমক্রাট-

দের উপর লোকের অরুচি ধরে যায়। সোশিয়াল ডেমক্রাটরা নিজেরাই ডিমরালাইজড হন।

কিছুদিন থেকে ভারতেও ডেমক্রাটিক সোশিয়ালিজমের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। অতি মিষ্টি আওয়াজ। কিন্তু কোমলের সঙ্গে সঙ্গে কড়িও চাই। আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কাজও চাই। তবে দুর্নীতির কারণগুলো যদি থেকে যায় মানুষগুলোকে মারধর করে খুব বেশী ফল হবে না। প্রলোভন আজকের দিনে যত বৃহৎ হয়েছে কোনো কালেই এত বৃহৎ ছিল না। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলেও না। দুর্নীতির উৎসমূলে যেতে হবে। প্রলোভন যাতে না ভোলায় তার উপায় বার করতে হবে। চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। বিড়ালের সামনে থেকে শিকে সরাতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে অত্যধিক প্রলোভন সেসব ক্ষেত্রে অত্যধিক সতর্ক হতে হবে। আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।

চক্রাবর্তন

বিশ একুশ বছর আগে যে মন্বন্তর হয় সে সময় খাদ্যসমস্যা নিয়ে নিবিড়ভাবে চিন্তা করেছি। সরকারী পোড়ামাটি নীতি, বেসরকারী মজুতদারি ইত্যাদি সব রকম কারণ একে একে পরীক্ষা করে দেখার পর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছই যে কলকাতার লোকের ক্রয়শক্তির তুলনায় সাধারণ গ্রামবাসীর ক্রয়শক্তি অকিঞ্চিৎকর এবং কলকাতার বড়লোকদের ক্রয়শক্তির তুলনায় সাধারণ কলকাতাবাসীর ক্রয়শক্তি অতি অল্প। খাদ্যের জন্যে কাড়াকাড়ি পড়লে যার ক্রয়শক্তি যত বেশী সে তত বেশী পাবে, যার ক্রয়শক্তি যত কম তার ভাগে তত কম পড়বে। এক্ষেত্রে রেশন ব্যবস্থা ছাড়া গতি নেই। শেষ পর্যন্ত তাই হলো, কিন্তু ততদিনে ত্রিশ লক্ষের উপর মানুষ কিনে খেতে না পেরে মারা গেছে। ইংরেজ রাজত্বের এই অন্ধকূপ হত্যা আমার চোখে দেখা। কোথায় লাগে সিরাজউদ্দৌলা!

চাকা ঘুরতে ঘুরতে আবার ঠিক সেইখানটিতে এসে পৌঁছেছে। এবার জাপানী আক্রমণ নয়, এবার চীনা আক্রমণ। দিন দিন সৈন্যসংখ্যা বাড়ছে, তাদের জন্যে খোরাক চাই। কলকারখানা বাড়ছে, কলমজুরদের জন্যে খোরাক চাই। সেবার ছিল ছোট একটি কলকাতা, এবার বড় একটা কলকাতা, তার সঙ্গে আসানসোল অঞ্চলের পাঁচ ছয়টি শিল্পনগর। সেবার শুধু বাংলাদেশে অন্নাভাব, এবার সারা ভারত জুড়ে অন্নাভাব, কারণ ছোট ছোট শিল্পনগরের সংখ্যা ও সমস্যা সর্বত্র একই রকম। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন জোর কদমে চলেছে, মনে হয় আরো জোর কদমে চলবে। হলদিয়াতে বন্দর চাই, ফারাক্কাতে বাঁধ চাই, বোখারোতে ইস্পাত কারখানা চাই, এমনি কত জায়গায় কত কী চাই, সব জুড়লে যে ছবিখানি হয় সেখানি যেমন লোভনীয় তেমনি ভয়াবহ। কারণ তার সঙ্গে বহু কোটি মানুষের অনাহার ও অল্পাহার জড়িয়ে রয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার দুর্ভিক্ষের কথা বোধহয় কারো কারো স্মরণ আছে। যার থেকে এলো কালেক্টিভাইজেশন। কুলাকদের লিকুইডেশন ইত্যাদির জন্যে দোষ দিতে হলে দিতে হয় রাতারাতি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকে ও তাল সামলাতে না পেরে রাতারাতি কালেক্-

ক্টিভাইজেশনকে। চীনও সেই পথে চলেছে, কিন্তু সে বড়ো বড়ো শহর-গুলোকে portable আকার দিচ্ছে।

ইংলণ্ডের একটা সাম্রাজ্য ছিল, সেখান থেকে সে সস্তায় খোরাক কিনে বা কেড়ে নিয়ে আসত ও তা দিয়ে কলকারখানার মজুরদের পেট ভরাত। ফলে আয়ারল্যাণ্ড উজাড় হতে বসল, ভারতের লোক আধপেটা খেয়ে বাঁচল। ইংলণ্ডের ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন রাতারাতি হয়নি, হলে তার সাম্রাজ্যে মহামারী বেধে যেত, কিংবা তার নিজের ঘরেই মহামারী বাধত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সুবিধা এই যে তার লোকসংখ্যা কম, জমির পরিমাণ প্রচুর, সাম্রাজ্যের দরকার হয় না। তবু সেও ল্যাটিন আমেরিকায় প্রচ্ছন্নভাবে ক্ষমতাবিস্তার করেছে। সেও রাতারাতি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজ করেনি। অনেক সময় নিয়েছে।

জার্মানীর ও জাপানের হাতে অত সময় ছিল না। অত জায়গাজমিও ছিল না। সাম্রাজ্যের জন্যে তারা পাগল হয়ে ওঠে। কারণ খোরাক না হলে কলকারখানা চালু রাখা যাবে না। বাড়িয়ে তোলা যাবে না। জাপানী বা জার্মান কেউ স্বভাবত রাক্ষস নয়। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন এমন এক প্রোসেস যাকে ত্বরান্বিত করতে গেলে সাম্রাজ্যের প্রয়োজন হয়। যুদ্ধ না করে সাম্রাজ্যলাভ হয় না, নিষ্ঠুর না হয়ে যুদ্ধ জেতা যায় না। মানবই দানব হয়ে ওঠে। অবশ্য দানব হয়ে যে শেষপর্যন্ত জিতবেই এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। হারতেও পারে, হারাতেও পারে। জার্মানী ও জাপান এখন মণিহারা ফণী। সাম্রাজ্য গেছে, কিন্তু প্রয়োজন যায়নি। তবে ইদানীং একটা সুলক্ষণ দেখা যাচ্ছে। পুঁজিবাদী দেশগুলো পরস্পরের সঙ্গে হাত মিলিয়ে প্রতিযোগিতার বদলে সহযোগিতায় লাভবান হচ্ছে। লাভের টাকা এত বেশী যে বাইরে থেকে বেশী দাম দিয়ে খোরাক কিনে নিয়ে আসতে তাদের বাধছে না। যে কিনে খেতে পারে সে লুট করবে কেন?

এখন ভারতের কথায় ফিরে আসি। ভারতের সাম্রাজ্য নেই, সে সস্তায় কিনে খেতে পারে না, লুট করে আনা তো অসম্ভব। তাকে কিনতে হচ্ছে চড়া দরে। আর নয়তো ধার করতে হচ্ছে, ভিক্ষা নিতে হচ্ছে। এ ভাবে কেউ কখনো রাতারাতি ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজড হয়নি, হলে হয়েছে রয়ে সয়ে। সুতরাং রাতারাতি আলাদীনের প্রদীপ দিয়ে দেশকে কলকারখানায় ছেয়ে ফেলার তাগিদ থাকলে তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম কালেক্টিভাইজেশন।

রুশ যে পথে গেছে, চীন যে পথে গেছে, ভারতও সেই পথে যাবে। অথবা জার্মানী বা জাপানের মতো ফাসিস্ট মার্গ ধরবে।

পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী কাজ দেবে না। শাসন ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কেন্দ্রীভূত হয়েছে। আরো কেন্দ্রীভূত হবে, যখন খাদ্য চলে যাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

এতে যদি লোকের আপত্তি থাকে তবে এর বিকল্প হচ্ছে সোজাসুজি কোনো একটা গোষ্ঠীতে ভর্তি হওয়া। বলা বাহুল্য সেটা চীনা গোষ্ঠী নয়। রুশ গোষ্ঠী নিজেই গম কিনে খাচ্ছে। কে কাকে খাওয়াবে? তা হলে বাকী থাকে—যাক, নাম করব না। চাকা ঘুরতে ঘুরতে আবার কি সেই গর্তেই পড়বে, যার থেকে উদ্ধার পেয়েছিল ১৯৪৭ সালে?

কন্‌ফেডারেশন

সেদিন এক সর্বোদয়বাদী বন্ধু এসেছিলেন নিমন্ত্রণ করতে। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, কন্‌ফেডারেশন যদি হয় তা হলে কাশ্মীরও তার অঙ্গ হবে, তখন আর কোনো বিরোধ থাকবে না।

আমি বললুম, কনফেডারেশন কোনো দেশেই সফল হয় নি। এ দেশে হবে কি?

একথা যখন বলি, তখন সুইটজারল্যাণ্ডের কথা আমার মনে ছিল। কন্‌ফেডারেশন সেদেশে সফল হয়েছে বইকি, ওটা কিন্তু নামেই কন্‌ফেডারেশন, আসলে ফেডারেশন। অর্থাৎ সুইটজারল্যাণ্ডের কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দুটি তিনটি বিভাগ নয়, প্রায় সবরকম বিভাগই আছে। যথা, পররাষ্ট্র, বিচার, স্বরাষ্ট্র, সৈন্য, অর্থ, পাবলিক ইকনমি, রেলওয়ে, পোস্ট অফিস।

ভারত সরকার কি এতগুলো এত রকম বিভাগ কন্‌ফেডারেশনের হাতে তুলে দিতে রাজী হবেন? পাকিস্তান সরকারও কি তুলে দিতে রাজী হবেন? অন্তত একটা বিভাগের নাম করা যাক, যা নিয়ে কন্‌ফেডারেশনের হাতেখড়ি হতে পারে। সেই বিভাগটি কি পোস্ট অফিস? সেটি কি রেলওয়ে? সেটি কি পাবলিক ইকনমী, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক ইনসিওরান্স?

কন্‌ফেডারেশন যদি কোনো দিন কার্যকর হয় তবে যেটি সবচেয়ে নির্বিরোধ, সেই বিভাগ দিয়েই আরম্ভ করতে হবে। গোড়া থেকেই সৈন্য বা পররাষ্ট্র দিয়ে আরম্ভ করা যাবে না। তা যদি সম্ভব হতো তবে ক্যাবিনেট মিশনের প্ল্যান গ্রহণ করে ১৯৪৭ সালেই কন্‌ফেডারেশন ভূমিষ্ঠ হতো। দেশ ভাগ, প্রদেশ ভাগ করতে হতো না।

কন্‌ফেডারেশন কথাটার সার হচ্ছে এই যে রাষ্ট্র একাধিক হলেও মাথার উপরে একটাই অথরিটি। সেই অথরিটিকে সবাই মিলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অন্তত একটি বিষয়ে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছে। সে ক্ষমতা ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই। দরকার হলে সরকার বদল করতে পারা যাবে, কিন্তু হাকিম নড়লেও হুকুম নড়বে না। সরকার বদলালেও ক্ষমতা কম হবে না। তা যদি হয় তবে কন্‌ফেডারেশন টিকবে না।

ইতিহাসে দেখা যায় যে নিতান্ত বিপন্ন না হলে কোনো রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলে কনফেডারেশন রচনার জন্যে ক্ষমতার একাংশ উর্ধ্বতন অথরিটির হাতে তুলে দেয় না। বিপদটা বাইরের থেকেও আসতে পারে, ভিতরের থেকেও উঠতে পারে অর্থাৎ যুদ্ধ বা বিপ্লব বা বিদ্রোহ—এর কোনো একটা বিপদ দু'তিনটে রাষ্ট্রকে একজোট হতে বাধ্য করে। তখন ওরা সাধারণত সৈন্য ও পররাষ্ট্র বিভাগ সর্বস্বীকৃত উর্ধ্বতন অথরিটির হাতে তুলে দেয়। তারই নাম কনফেডারেশন কর্তৃপক্ষ।

কনফেডারেশন একবার সৃষ্টি হলে শুধু যে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতার একাংশ উপরে চলে যায় তাই নয়, সোভরেনটিও খর্ব হয়। সোভরেনটি খর্ব হোক এটা কারো কাম্য নয়। সুতরাং পরবর্তীকালে এই নিয়ে ঝগড়া বাধে। ঝগড়া করতে করতে কনফেডারেশন ভেঙে যায়। আর নয়তো ফেডারেশনে রূপান্তরিত হয়। তখন ফেডারেশন কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাহুবলে বা আদালতের আজ্ঞাবলে বিদ্রোহ দমন করেন।

ভারত-পাকিস্তানের সামনে এমন কোনো বিপদ আজ এই মুহূর্তে নেই যার ভয়ে যে যার ক্ষমতার একাংশ ছেড়ে দিয়ে মাথার উপরে একটা অথরিটি সৃষ্টি করবে। সেই অথরিটিকে সোভরেন বলে স্বীকার করবে। পরে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইবে না। করলে তার হাতে বিদ্রোহ দমনের জন্যে যথেষ্ট ক্ষমতা থাকবে।

না, এই মুহূর্তে তেমন কোনো বিপদের উপলব্ধি নেই। চৈনিক আক্রমণের ভয়ে ভারত এতদূর ভীত নয় যে পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কনফেডারেশন গড়ে তার হাতে সোভরেনটি তুলে দেবে। পাকিস্তান চৈনিক আক্রমণের ভয়ে ততদূর ভীত নয়। তার কথা সত্য হলে সে একটুও ভীত নয়। বরং উল্লসিত।

ভারতে বিপ্লব ঘটলে পাকিস্তান প্রতিবিপ্লবের ঘাঁটি হবে, এটা অবধারিত। সুতরাং কেনই বা সে কনফেডারেশনে রাজী হবে? একই সময়ে দুই রাষ্ট্রে বিপ্লব ঘটলে অন্য কথা। তার নিকট সম্ভাবনা নেই, কারণ সাধরণত বিপ্লব আসে যুদ্ধের মাঝখানে বা পরাজয়ের পরে। ভারত ও পাকিস্তান যুদ্ধকে এড়িয়ে চলেছে। বাইরে থেকে একটা যুদ্ধ ভারতের ঘাড়ে চাপতে পারে, কিন্তু পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপার লক্ষণ নেই। তার মিতারা তাকে যুদ্ধে জড়াতে পারে, তা ঠিক। কিন্তু তার নেতারা অত সহজে জড়িয়ে পড়তে চান না।

ভারত-পাকিস্তান কন্‌ভেডারেশনের সম্ভাবনা একান্ত সুদূর। যদি কোনদিন সে প্রশ্ন জরুরি হয় তবে সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্নও জরুরী হবে। ঊর্ধ্বতন শাসকমণ্ডলীতে অধিকাংশ ভোট কার আয়ত্তে থাকবে—ভারতের না পাকিস্তানের? পাকিস্তান ছোট, তাকে অধিকাংশ ভোট দেওয়া যায় না। কিন্তু পাকিস্তান কি ভারত বড় বলে ভারতের আয়ত্তে অধিকাংশ ভোট থাকতে দেবে?

পাকিস্তান সৃষ্টির মূলেও ছিল ওই প্রশ্ন। যে কোনো বিচারে অধিকাংশ ভোট কংগ্রেসের পাওনা। লীগ তাতে রাজী নয়। উভয়কে সমান সমান ভোটাধিকার দিতে হবে, কাস্টিং ভোট থাকবে বিদেশী বড়লাটের হাতে। ওভাবে মিটমাট হতে পারে না বলেই পাকিস্তান বলে আলাদা একটা রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে দিতে হলো। অবশ্য মিটমাট যা হলো তা ইংরেজের সঙ্গেই। লীগের সঙ্গেও হয়নি। পাকিস্তানের সঙ্গেও না। কন্‌ফেডারেশন সুদূরপরাহত।

স্বধর্ম ও স্বদেশ

মানুষের যেমন পিতার প্রতি কর্তব্য আছে তেমনি মাতার প্রতি কর্তব্য। যেমন ধর্মের প্রতি মমতা আছে তেমনি জন্মভূমির প্রতি মমতা। যে দেশে জন্ম সে দেশের সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন হওয়া কি ধার্মিকের কাজ? তার স্বার্থের প্রতি বিমুখ হওয়া কি ধর্মপ্রাণতার পরিচায়ক? যে নৌকায় আমরা সকলে ভাসছি সে নৌকা যদি ডোবে তা হলে কি আপনি আপনার ধর্ম নিয়ে বাঁচবেন, না আমি আমার ধর্ম নিয়ে বাঁচব?

ধর্মকে তার প্রাপ্য দিতে হবে। এ বিষয়ে হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলে একমত। আমাদের এ দেশে কেউ কম ধার্মিক নয়। ধর্মের উপর ভারতের সাধারণ লোকের আন্তরিক টান। সেকুলার স্টেট বলতে এ বোঝায় না যে মানুষ নিজের ধর্ম ভুলে যাবে। ধর্ম বিসর্জন দিয়ে শুধু রাজনীতি বা অর্থনীতি নিয়ে জীবন যাপন করা যায় না। কেউ যদি বলেন যে একতার খাতিরে সবাইকে আপন-আপন ধর্ম ত্যাগ করতে হবে, নতুবা একতা হবে না, তবে তাঁর সেটা অসঙ্গত প্রত্যাশা। মাতার খাতিরে যেমন পিতাকে দূর করে দেওয়া যায় না তেমনি জন্মভূমির খাতিরে ধর্মকে।

অপর পক্ষে পিতার খাতিরে মাতাকে দূর করে দেওয়াও অসঙ্গত প্রত্যাশা। সেকালের মুসলিম নেতাদের অনেকে বিশ্ব ইসলামের খাতিরে ভারতবর্ষকে তুচ্ছ মনে করতেন, তার স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রামীদের এক কথায় উড়িয়ে দিতেন এই বলে যে ওরা হিন্দু। শেষে যখন দেখা গেল যে সংগ্রামীদের ত্যাগস্বীকারের ফলে দেশ স্বাধীন হবার মুখে তখন তাঁরাও বলতে আরম্ভ করলেন যে, "হাঁ, আমাদেরও একটা দেশ আছে, সেটা হিন্দুস্থান নয়, পাকিস্তান।"

হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান সকলের তপস্যার ফলে দেশ স্বাধীন হয়। সঙ্গে সঙ্গে অধিকাংশ মুসলমানের ইচ্ছায় ও অধিকাংশ হিন্দুর সম্মতিতে দেশ দু'ভাগ হয়। এখন তো আর দেশকে অস্বীকার করে ধর্মকেই একমাত্র আপনার বলে ভাববার ও ভালোবাসবার হেতু নেই। হিন্দুস্থানকে যাঁরা স্বদেশ বলে ভাবতে ও ভালোবাসতে নারাজ তাঁরা পাকিস্তানকে স্বদেশ বলে ভাবতে ও ভালোবাসতে পারেন। পাকিস্তানকে যাঁরা স্বদেশ বলে ভাবতে ও

ভালোবাসতে নারাজ তাঁরা হিন্দুস্থানকে স্বদেশ বলে ভাবতে ও ভালোবাসতে পারেন। আমার মতো যাঁরা দুই দেশকেই স্বদেশ বলে ভাবতে ও ভালোবাসতে চান তাঁদের কর্তব্য হবে দুই দেশের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধন করা। ভুল বোঝাবুঝি যথেষ্ট হয়েছে। এবার সে অধ্যায়ের অবসান হোক। এক দেশকে আপনার মনে করলে আরেক দেশকে পর মনে করতে হবে এমন কোনো সুযুক্তি নেই।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাস্তববাদীও হতে হবে। পাকিস্তান একটি বৈদেশিক শক্তিজোটের সঙ্গে সামরিক চুক্তিবদ্ধ। তা ছাড়া চীনের সঙ্গে তার যে সীমান্ত চুক্তি হয়েছে তাতে একটি গোপনীয় ধারা আছে, সে ধারা ভারতবিরোধী। বার বার আহ্বান করা সত্ত্বেও পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তিতে সই করতে রাজী হয়নি। বিশ্বযুদ্ধ বাধলে পাকিস্তান হবে এক পক্ষের ঘাঁটি। চীন-ভারত যুদ্ধ বাধলে পাকিস্তান হবে চীনের দোসর। কাশ্মীরকে উপলক্ষ করে পাক-ভারত যুদ্ধ বাধাও বিচিত্র নয়। যেখানে এতরকম দুঃসম্ভাবনা রয়েছে সেখানে দুই দেশের হিতৈষীদেরও সতর্ক থাকতে হয়। এমন লোকও আছে যারা আমাকে 'পাকিস্তানের দালাল' বলে গালাগালি দিয়ে চিঠি লেখে। আমারই যখন এই দশা তখন কাজী আবদুল ওদুদ বা হুমায়ুন কবিরের অবস্থা অনুমেয়।

ওদিকেও নিশ্চয় এমন লোক আছে যাদের চোখে আমরা 'হিন্দুস্থানের দালাল'। সেইজন্যে ইচ্ছা থাকলেও আমি পাকিস্তানে যাইনে। এবারেও যাবার প্রস্তাব উঠেছিল। আমি "না" বলে দিয়েছি। সেতুবন্ধনের চেষ্টা তা বলে ছেড়ে দিইনি। আপাতত আমার কাজ এই প্রান্তেই। সেতু তো প্রথমে এক প্রান্ত থেকেই আরম্ভ করতে হয়। ওদিকেও কেউ কেউ এক প্রান্ত থেকেই আরম্ভ করবেন। হয়তো ইতিমধ্যেই আরম্ভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের কাজ আরো শক্ত। পাকিস্তান গোড়া থেকেই একটা ইসলামিক স্টেট আর ইসলামের সঙ্গে হিন্দুত্বের নাকি চিরন্তন শত্রুতা। কাশ্মীর দান করলেও যে আমরা পাকিস্তানের শাসকচক্রের মন পাব তার উপায় নেই। ইসলামিক স্টেট তার পরেও তেমনি ইসলামিক রয়ে যাবে। ইসলামের সঙ্গে হিন্দুত্বের তথাকথিত শত্রুতাও তেমনি চিরস্থায়ী।

পাকিস্তানের চিত্ত পরিবর্তন তার ভিতর থেকেই ঘটবে। তার জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। ইতিমধ্যে এদিকটা সমলাতে হবে। যাতে শান্তি অব্যাহত

থাকে। যাতে সদ্‌ভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ কাজ আগে যত কঠিন ছিল এখন তার চেয়ে আরো কঠিন হয়েছে। কারণ পাকিস্তান থেকে অবিরাম জনস্রোত বয়ে আসছে। তার প্রতিক্রিয়া কি সিকিভাগও হবে না? এবার তো পাশপোর্ট বা মাইগ্রেশন সার্টিফিকেটেও বাগ মানছে না। এইভাবে যদি আরো কিছুদিন চলে তবে এসব বিধিনিষেধ আপনি উঠে যাবে। মাল পাচার তো হামেশা চলেছে। বাধ্য হয়ে দুই রাষ্ট্রকে একমত হতে হবে। সেটা বার বার পেছিয়ে যাচ্ছে বলে হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সবুরে মেওয়া ফলে।

ঝগড়া বন্ধ করার জন্যেই দুটো দেশ মেনে নিতে হয়েছিল। ঝগড়া চালিয়ে যাবার জন্যে নয়। ঝগড়াটে মনোভাব সাধারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে নেই। জনগণ চায় শান্তি, মৈত্রী। ধর্ম নিয়ে শত্রুতার যুগ গেছে। রাজনীতি নিয়ে শত্রুতার যুগও যাবে। তার পরে আসবে অর্থনীতি নিয়ে সংহতির যুগ। নইলে কেউ সমৃদ্ধ হবে না। না পাকিস্তান, না ভারত।

॥ ২ ॥

"স্বধর্ম ও স্বদেশ" প্রবন্ধটিতে "হিন্দুস্থান" কথাটি উল্লেখ দেখে শ্রীরবীন্দ্র গুহ ব্যথিত হয়েছেন। তিনি প্রশ্ন করেছেন, "ভারত" নয় কেন? তিনি যদি লেখাটি শেষ পর্যন্ত পড়ে থাকেন তা হলে তাঁর উত্তর তিনি হাতে হাতে পেয়ে গেছেন। কারণ তাতে "ভারত"ই শেষ কথা। লেখকের নিজের উপর ছেড়ে দিলে লেখক "ভারত" কথাটিই ব্যবহার করে যেতেন। কিন্তু প্রবন্ধের এক জায়গায় কোটেশন আছে। তার পরের ধাপগুলো সেই কোটেশনের অনুবৃত্তি। "হিন্দুস্থান" কথাটি মুসলমান মহলে এখনো বহুল প্রচলিত।

এই সেদিন অবধি যার নাম ভারতবর্ষ তারই নাম ইণ্ডিয়া ও তারই নাম হিন্দুস্থান ছিল। এখনো এগুলি পরস্পরের প্রতিশব্দস্বরূপে ব্যবহার করা হয়। তার জন্যে গুহ মহাশয়কে ভিলাই থেকে বাঙ্গালোরে যেতে হবে না। হিন্দুস্থান স্টীল, হিন্দুস্থান এয়ারক্রাফট ইত্যাদি ছ'সাতটা সরকারী প্রতিষ্ঠানের নাম কে না জানে? সরকারকেই প্রশ্ন করা যেতে পারে, ভারত নয় কেন?

এর উত্তরে তাঁরা হয়তো বলবেন যে বার বার ইণ্ডিয়া ও ভারত ব্যবহার করে তাঁরা প্রমাণ দিয়েছেন যে তাঁরা সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে। কিন্তু পাকিস্তানীরা যে শব্দটির মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাচ্ছে সে শব্দটি তা বলে তামাদি হয়ে যায়নি বা তার প্রকৃত অর্থ হারায়নি।

কাজী আবদুল ওদুদের "ব্যবহারিক শব্দকোষ" দেশ বিভাগের পরে প্রকাশিত। "হিন্দুস্থান" শব্দটির অর্থ কাজী সাহেবের মতে "ভারতবর্ষ, উত্তর-ভারত (হিন্দুস্থানী মওলানা, হিন্দুস্থানী মেয়ে)"। তাই যদি হয় তবে হিন্দুস্থানের একাংশ বিচ্ছিন্ন হওয়া সত্বেও শব্দটির বিলোপ বা অর্থান্তর ঘটেনি। ভারতের বাইরে এদেশের নাম হয় ইণ্ডিয়া নয় হিন্দুস্থান। ভারত নামটিই অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত। ইসলাম প্রবর্তনের পূর্বেও পারস্যের লোক এদেশকে বলতেন হিন্দুস্থান যেমন খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তনের পূর্বেও গ্রীকরা বলতেন ইণ্ডিয়া। ধর্মের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। যাঁরা হঠাৎ সেদিন এর মধ্যে ধর্মের গন্ধ আবিষ্কার করেন তাঁরা কি মহাকবি ইকবালের "হিন্দুস্তান হামারা" গানটিকেও সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে খারিজ করবেন ?

তা ছাড়া আরো একটি কথা। এটি ব্যক্তিগত। আমি বাংলা সাহিত্যের লেখক। আমি যখন লিখি তখন আমার চোখের সামনে থাকে কেবল ভারতের বাংলা সাহিত্যের পাঠক নয়, পূর্ব পাকিস্তানেরও বাংলা সাহিত্যের পাঠক। কায়িক বিচ্ছেদ আমি মেনে নিয়েছি কিন্তু মানসিক বিচ্ছেদ আমি মেনে নিইনি। বাচনিক বিচ্ছেদ আমি মেনে নিতে পারিনে। কোন শব্দের ব্যবহারে কে অপ্রসন্ন হবে সেটা অবশ্য একটা মনে রাখবার মতো কথা, কিন্তু মনটাই আমার এই একটি বিষয়ে পরিবর্তন-বিমুখ। আমি তার উপর ভায়োলেন্স খাটাতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ দেশবিভাগসত্বেও আমি যেখানে ছিলুম সেইখানেই আছি। এই একটি বিষয়ে। বাংলা ও বাঙালীর সংজ্ঞা ও সীমা ইতিহাস ও ভূগোল যেভাবে নির্দেশ করে দিয়েছে আমার কাছে সেটা অপরিবর্তনীয়। বাস্তববাদ আমাকে স্বীকার করতে বাধ্য করছে যে ওটা এখন পাকিস্তান, কিন্তু ইতিহাসবোধ ও ভূগোলবোধ আমাকে স্থির থাকতে পরামর্শ দিচ্ছে! আমি স্থির আছি ও থাকব।

আমার মন বলে, এই বাস্তবটাই অবাস্তব। এর পিছনে অবশ্য দেদার শক্তি কাজ করছে। তাদের খবর রাখা দরকার। তাদের সঙ্গে পাঞ্জা কষারও দরকার আছে। সাহিত্য নিয়ে মগ্ন না থাকলে সেটাও আমি করতুম। কিন্তু

শেষপর্যন্ত জয় হবে যেসব শক্তির সেসব শক্তির সঙ্গে আমার পরিচয় এতকালের ও এত গভীর যে তাদের উপর বিশ্বাস হারালে আমি নিজেই বিড়ম্বিত হব। বাঙালী হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে রাজনীতি করতে পারল না এটা দুর্ভাগ্য। নিকট ভবিষ্যতে পারবেও না। কিন্তু একসঙ্গে সাহিত্য করতে পারবে না, সঙ্গীত করতে পারবে না, খেলাধুলা করতে পারবে না, এটা মিথ্যা। একসঙ্গে চাষবাস করতে পারবে না, লেনদেন করতে পারবে না, বসবাস করতে পারবে না, এসব মিথ্যার পরমায়ু হয়তো আরো পাঁচ দশ বছর। কিন্তু ইতিমধ্যে পঞ্চাশ ষাট লাখ লোকের জীবন এর দ্বারা দুর্বহ হয়েছে, তছনছ হয়েছে। আর কত হবে তাই ভাবি। যখন ভাবি তখন পূর্ব পাকিস্তানকেও জড়িয়ে ভাবি। সেখানকার হিন্দু মুসলমানকেও জড়িয়ে ভাবি। এখানকার হিন্দু মুসলমান কাউকে বাদ দিয়ে ভাবিনে।

আমার ইতিহাসবোধ আমাকে বলে যে হিন্দু মুসলমানের তত্ত্বের মামলা তিন চার শ' বছর আগেই মিটে গেছে। আলাওল প্রমুখ কবিদের রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। এখন যেটা আমরা দেখছি সেটা স্বত্বের মামলা। অর্থাৎ এটা পলিটিকস। পাওয়ার পলিটিকস। এটাও বহুদিন পূর্বে মিটে যেত, যদি না সুদূর কাশ্মীর নিয়ে ভারত পাকিস্তান বিক্ষুব্ধ হতো। নিকট ভবিষ্যতে সে বিক্ষোভ দূর হবে কি ? যদি না হয় তবে স্বত্বের মামলা বহুদূর গড়াবে।

গণতন্ত্রের মর্ম

গণতন্ত্রে যে দুটি জিনিস একান্ত আবশ্যক —যে দুটি না হলে ওটা গণতন্ত্রই নয়—সে দুটির একটি হচ্ছে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সাধারণ নির্বাচন, অপরটি নির্বিবাদে ক্ষমতা হস্তান্তর। এই সেদিন ইংলণ্ডে ওই দুটি জিনিস দেখা গেল। এদেশেও দেখা যেতে পারে যদি বর্তমান সংবিধান অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়। ইতিমধ্যে কয়েকবার সাধারণ নির্বাচন স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন হয়েছে, কোনো কোনো রাজ্যে নির্বিবাদে ক্ষমতা হস্তান্তরও হয়েছে। যেমন কেরলে, নাগাল্যাণ্ডে, গোয়াতে। ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যেও হতে পারে। কেন্দ্রেও হতে পারে। লোকে যদি কংগ্রেসের চেয়ে অন্য কোনো দলকে বেশী বিশ্বাস করে ও ব্যালট বাক্সে গোপনে ভোট দেয় তাহলে অন্য দলটির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে কংগ্রেস বিরোধীপক্ষের ভূমিকা নেবে। কংগ্রেস যে কোনো দিন ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এমন নয়। স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন যে কোনো দিন আর অনুষ্ঠিত হবে না এমন নয়। বিরোধী পক্ষে যেতে কংগ্রেস যে অনিচ্ছুক এমনও নয়।

আসলে কংগ্রেসের দিক থেকে গণতন্ত্রের ভয় করবার কিছু নেই। দেশের লোক বিশ্বাস করে না যে কংগ্রেস একদিন গণতন্ত্রের পাট উঠিয়ে দিয়ে সরাসরি ডিক্টেটরশিপ কায়েম করবে, নাৎসী, ফাসিস্ট বা কমিউনিস্টদের মতো। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অভিযোগ জমতে জমতে পাহাড় হলে কংগ্রেস ভোটে হেরে গিয়ে বিরোধীদের আসনে বসবে, ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের মতো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এদেশে লেবার পার্টির ভূমিকা নেবে কে? এমন দল কোথায় যার হাতে ক্ষমতা সঁপে দিয়ে দেশের লোক নিশ্চিন্ত হবে? এমন দল কোনটি যে দল সিংহাসনে বসে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান করবে, হেরে গেলে ভদ্রভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে? এখন পর্যন্ত আমরা দেখছি বেআইনীভাবে ক্ষমতা অধিকার করতে প্রায় সব ক'টি বামপন্থী তথা দক্ষিণপন্থী দল মনে মনে তৈরি। সম্পত্তির ওপর হাত পড়লে দক্ষিণপন্থীরা হাতিয়ার ধরবেন। আর বামপন্থীরা হাতিয়ার ধরবেন ভাতকাপড়ে বা মজুরিতে টান পড়লে।

গণতন্ত্রের দুর্বলতা হচ্ছে এইখানে যে সব ক'টা দল যদি খেলার নিয়ম না মানে, কয়েকটা দল যদি খেলায় ফাউল করতে বদ্ধপরিকর হয়, জনগণ যদি

উদাসীন বা বিভ্রান্ত হয়, নির্বাচনে যদি জনগণের ইচ্ছা প্রতিফলিত না হয়, অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যদি নির্বাচন স্থগিত থাকে, সাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে যদি শাসক দল গড়িমসি করে, জনপ্রিয়তা হারাবার ভয়ে যদি নেতারা ভুল নেতৃত্ব দেন, তাহলে মানুষ তিক্তবিরক্ত হয়ে বলে, কী হবে এমন গণতন্ত্র নিয়ে? ডিক্টেটরশিপও এর চেয়ে শ্রেয়। এমনি এক পরিস্থিতি দেখা দিয়েছিল ফ্রান্সে। রাজনৈতিক দলগুলো বিশ বছর কোনো সাহসিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। শেষে দরকার হলো আলজিরিয়া সম্বন্ধে এক অসমসাহসিক সিদ্ধান্ত। সেটা কেবল দ্যগলের মতো অসমসাহসী ব্যক্তিই নিতে পারেন। সৈন্যরা বিদ্রোহের ভয় দেখিয়ে দ্যগলকেই চাইল। রাজনীতিকরা মানে মানে তাঁর খাতিরে সরে গেলেন। তাঁর নিজের শর্তে তিনি কর্তা হয়ে বসলেন। গণতন্ত্রকে খুশিমতো শুধরে দিলেন। এখন বোঝা শক্ত সেটা গণতন্ত্র না কর্তৃতন্ত্র।

ফ্রান্সের মতো বনেদী গণতন্ত্রে যদি এরূপ ব্যাপার ঘটতে পারে, তবে আমাদের বেলা কী যে ঘটবে তা ইতিহাসবিধাতাই জানেন। সর্বপ্রকার ঘাতসহ গণতন্ত্র পৃথিবীতে দু'চারটি মাত্র আছে। এমন কি ইংলণ্ড সম্বন্ধেও ইংরেজদের অনেকের ভয় ছিল যে সেখানেও রক্তাক্ত বিপ্লব ঘটবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর লেবার পার্টি নির্বিবাদে যেসব সংস্কারমূলক পরিবর্তন ঘটায় সেসবও এক প্রকার বিপ্লব। সম্মতিসূত্রে বিপ্লব। পরবর্তী নির্বাচনে লেবার পার্টি পরাজিত হলেও শ্রমিক শ্রেণী পরাজিত হয়নি। ওদের শক্তি সেই যে বেড়ে যায় তার পর আর কমেনি। যখন পর্লামেণ্ট ওদের হাতে থাকে না তখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থাকে। আর ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস একাই সৈন্যদলের মতো শক্তিশালী। রক্ষণশীলরা ওকে যমের মতো ভয় করে।

ইংলণ্ডের মতো ভারতে পোলারাইজেশন হয়নি। রক্ষণশীল দলও নেই, শ্রমিক দলও নেই। কংগ্রেস রক্ষণশীলদের দল নয়। কংগ্রেস বরং চেষ্টা করছে যাতে পোলারাইজেশন না হয়। গান্ধীজীর আগে যে কংগ্রেস ছিল সে কংগ্রেস থাকলে রক্ষণশীল না হোক উদারনৈতিক দলে পরিণত হতো। কিন্তু গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব হাতে নেবার সঙ্গে সঙ্গেই তার অর্থনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেন। ঝোঁক পড়ে মিলের ওপর নয় চরকার ওপর। বড়লোকের ওপর নয় গরিব লোকের ওপর। চরকা একটা প্রতীক মাত্র। আসল কথাটা হলো ওদের হাতে শুধু একটা ভোট ধরিয়ে দিলেই ওদের পেট ভরবে না। একটা চরকাও ধরিয়ে দিতে হবে। যাতে ওরা নিজেদের পরিশ্রমের দ্বারা নিজেদের

পেট ভরায়। মার্ক্সপন্থীদের যেমন কাস্তে হাতুড়ি, গান্ধীপন্থীদের তেমনি চরকা। আক্ষরিক অর্থে কেউ কাস্তে হাতুড়ি ধরে না। আক্ষরিক অর্থে কেউ হয়তো চরকাও ধরবে না। কিন্তু দীনতম মানুষটিকেও শ্রমের সুযোগ দিতে হবে। কেউ বেকার বসে থাকবে না। গান্ধীজীর এনে দেওয়া ভোট এখন কংগ্রেসকে রাজা করে দিয়েছে, কিন্তু গান্ধীজীর দিয়ে যাওয়া চরকা এখন মথুরাপতির ভুলে যাওয়া ব্রজগোপী।

কংগ্রেস এখনো দীনতম মানুষটিকে শ্রমের সুযোগ দেয়নি। শুধু তার ভোটটির জন্যে তার কাছে দৌড়াদৌড়ি করে। পাঁচ বছরে একবার, তবু তো একবার। কমিউনিস্ট দেশগুলিতে কেউ কি গরিবের দোরে একবারও যান? যেখানে ভোট নেওয়া হয় সেখানেও সরকারী দল ছাড়া আর কারো মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেবার স্বাধীনতা নেই। কমিউনিস্ট রাজ্যে শ্রমের সুযোগ মেলে, কিন্তু বেছে বেছে যার ওপর আস্থা আছে তাকে ভোট দেবার সুযোগ মেলে না। সে হয়তো সরকার গঠন করবে না, বিরোধী পক্ষে থাকবে। তার বিরোধিতাও মূল্যবান। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে বিরোধী পক্ষে যাওয়া বারণ, বিরোধিতা করা বারণ, বিরোধী প্রার্থীকে ভোট দেওয়া অসম্ভব। শ্রমের সুযোগই সব নয়। মানুষের জন্মগত অধিকার বলতে বিরোধী পক্ষকে ভোট দেবার অধিকারও বোঝায়। কংগ্রেস যাদের শ্রমের সুযোগ দেয় নি বা দিতে পারে নি তাদের শাসক নির্বাচনের তথা বিরোধী নির্বাচনের অধিকার দিয়েছে। একদিন বিরোধীও শাসক হতে পারে। সুতরাং উভয় পক্ষের রথের দড়ি লোকের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তারা জিতিয়ে দিতেও পারে, হারিয়ে দিতেও পারে।

দেশের পক্ষে যেমন স্বাধীনতা, ব্যক্তির পক্ষে তেমনি ভোট। এই অমূল্য অধিকার দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের নেই, শ্বেতাঙ্গদের আছে। এই অমূল্য অধিকার পাকিস্তানের হিন্দু-মুসলমানের হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। একে ফিরিয়ে আনার জন্যে কুমারী ফাতেমা জিন্নার অভিযান আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তানকে এর জন্যে কতকাল তপস্যা করতে হবে কে জানে। এই অমূল্য অধিকার আমাদের দীনতম নাগরিকেরও আছে। কী করে এর সদ্ব্যবহার করতে হয় সেটা ওরা এখনো ভালো করে শেখেনি। ওদের ভালো করে শেখানো হয় নি। ইংলণ্ডেও সময় লেগেছে শিখতে। এ জিনিস দেখে শেখা যায় না। ঠেকে শিখতে হয়। ভুলভ্রান্তি হবেই। কিন্তু কংগ্রেস

যতদিন আছে ততদিন এটুকু নিশ্চয়তা আছে যে ভারতীয় নাগরিকদের ভোট দেবার অধিকার কেউ কেড়ে নেবে না। কংগ্রেস যদি শাসক পক্ষ ছেড়ে বিরোধী পক্ষে দাঁড়ায়, তা হলেও আশা থাকে যে ভোটের অধিকার বাতিল হবে না। কিন্তু কংগ্রেস যদি শূন্য হয়ে যায় তবে বিশ্বাস করা কঠিন যে গণতন্ত্র বা ভোটাধিকার অবিকৃত থাকবে। আমার আশঙ্কা কংগ্রেসের শূন্যতা পূরণ করা আর কোনো পার্টির একার সাধ্য নয়। এমন কি পাঁচটা পার্টি মিলে কোয়ালিশন করলেও না। তখন হয় দেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে, নয় দেশজুড়ে মিলিটারি ডিকটেটরশিপ হবে। দ্বিতীয়টার সম্ভাবনাই বেশী। একবার ও-জিনিস হলে গণতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন সুদূরপরাহত। যেমন দেখছেন পাকিস্তানে। একই জাতি আমরা। আমাদের এমন কোনো বিশেষ গুণ নেই যে আমরা ডিকটেটরকে হটিয়ে দিয়ে আবার গণতন্ত্র ফিরে পাব। হয়তো এক প্রকার ডিকটেটরশিপের জায়গায় আরেক প্রকার ডিকটেটরশিপ হবে। মিলিটারির জায়গায় কমিউনিস্ট বা ফাসিস্ট। নয়তো সেই আয়ুব-মার্কা ছদ্মবেশী 'বেসিক ডেমোক্রাসী'। গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে হলে আবার গণসত্যাগ্রহ করতে হবে। কোথায় সেই নেতা, সেই তপস্যা, সেই ত্যাগশক্তি আর সেই ইংরেজ লিবারেল প্রতিপক্ষ!

এই হলো একটা কথা। আর একটা কথা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিরোধের মতো শ্রেণীবিরোধও একটা এলিমেণ্টাল ব্যাপার। ভারতে যদি সে ব্যাপার ঘটে তবে কংগ্রেসকে দোষ দিয়ে কোনো সান্ত্বনা মিলবে না। যেসব দেশে কংগ্রেস নেই সেসব দেশেও তো মহামারী বেধে গেছে। বরং গণতন্ত্র সেটাকে কতক পরিমাণে বাগ মানাতে পারে। যেমন পেরেছে ইংলণ্ডে। গণতন্ত্র যেখানে কাজ করছে না সেখানে শ্রেণীবিরোধ এক কোপে একটা শ্রেণীকে একদম ছেঁটে ফেলতে পারে। রুশ চীনে আমরা তার নমুনা দেখেছি। যেসব শ্রেণী কাটা পড়বে তারা যদি গণতন্ত্রের ঢালের আড়ালে দাঁড়িয়ে আত্মরক্ষা করতে চায় আমি তাদের সুবুদ্ধিকে সাধুবাদ দেব। বলা বাহুল্য তারা সন্ধি করতে সর্বদা প্রস্তুত থাকবে। জনগণের জন্যে ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী থাকবে। গণতন্ত্রে এটা মানে মানে হতে পারে।

আঠার বছর পরে

একজন লোক ঘটনাচক্রে একটি হীরা পেয়েছিল। একদিন ঘটনাচক্রে সেটি খোওয়া গেল। কী করবে! ঘটনাচক্রের উপর হাত নেই। অসহায়!

আমাদের স্বাধীনতা কি ঘটনাচক্রে পাওয়া হীরা? তা যদি হয়ে থাকে তবে আবার একদিন ঘটনাচক্রে হারিয়ে যেতে পারে। ঘটনাচক্র কখন অনুকূল হয়, কখন প্রতিকূল হয়, কেউ বলতে পারে না। ইতিহাস দীর্ঘ। তার কাছে এক আধ শতাব্দী কিছু নয়। তার হাতে কত পাকা ঘুঁটি কেঁচে গেছে।

না, আমাদের স্বাধীনতা ঘটনাচক্রে পাওয়া হীরা নয়। একে আমাদের বহু দুঃখে অর্জন করতে হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে বহু বৎসরের তপস্যা ও ত্যাগ। লক্ষ লক্ষ নরনারীর উদ্যোগ ও অধ্যবসায়।

নিজেদের যারা সাহায্য করে বিধাতা তাদের সাহায্য করেন। বিধাতার সেই সাহায্য হঠাৎ একদিন ঘটনাচক্ররূপে আবির্ভূত হয়। যে ইংরেজকে "ভারত ছাড়ো" বলে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল সেই ইংরেজই নোটিশ দেয় সে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারত ছাড়বে। রাশিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জার্মানীর একাংশ অধিকার করতে হলে সৈন্যের দরকার। সে অধিকার পাঁচ সাত বছরের জন্যে নয়। কে জানে কতকালের জন্যে। ইউরোপের ব্যালান্স অফ পাওয়ার বজায় রাখতে হলে সৈন্য চাই। সুতরাং ভারত থেকে সৈন্য অপসারণ না করে উপায় নেই। ঘটনাচক্র রাশিয়াকে জার্মানীর মাঝখানে টেনে এনে ভারতকে সাহায্য করে। ভারত ইংরেজ অধিকার থেকে মুক্ত হয়।

মহাযুদ্ধের ফলাফল অন্যরকম হলে ইংরেজ অত সহজে সাম্রাজ্য গুটিয়ে নিত না, হয়তো আরো একবার গণসত্যাগ্রহ করতে হতো। গান্ধীজী তার জন্যে আরো অনেকদিন বাঁচতে চেয়েছিলেন। অনেকেরই ধারণা ছিল যে, ১৯৪৬ সালের "অন্তর্বর্তী সরকার" ধোপে টিকবে না, এক আধ বছর বাদে ইস্তফা দেবে। তখন আবার অচল অবস্থা। আবার সংগ্রাম। পরিশেষে আমেরিকার স্বাধীনতার মতো ভারতের স্বাধীনতা স্বীকার।

ঘটনাচক্র আমাদের সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু না করলেও আমরা নিজেদের চেষ্টায় স্বাধীন হতুম। কয়েকজন নেতা হয়তো ক্লান্ত হয়ে

পড়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন অক্লান্ত। দেশের যৌবন ছিল অক্লান্ত। দেশের জনগণ ছিল অক্লান্ত। কয়েকজন নেতার তথাকথিত ক্লান্তি এত বড়ো একটা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত না। অন্য কারণ ছিল। সে কারণ ঐতিহাসিক। ও রকম একটা পরিস্থিতি অভূতপূর্ব ও অভাবনীয়।

ইতিমধ্যে সারা দেশের উপরে একপ্রকার অবসাদের ছায়া নেমেছে। এ অবসাদ সংগ্রাম করতে করতে ক্লান্ত হওয়ার দরুন নয়। এর সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের কোনো সম্পর্ক নেই। তা হলে কী এর কারণ?

এখনো এ দেশে যথেষ্ট লোক আছে যারা ত্যাগ করতে তপস্যা করতে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক। কিন্তু কার নেতৃত্বে করবে? কেন করবে? কার বিরুদ্ধে করবে? এসব প্রশ্নে কেউ কারো সঙ্গে একমত নয়। সংগ্রাম একবার আরম্ভ হলে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে। তাকে অহিংস আকার দিতে চাইলেও সে হিংসায় ফেটে পড়বে। আর সেই হিংসা পরস্পরকে এমনভাবে ক্ষতবিক্ষত করবে যে, পরে আর একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে পারা যাবে না। আমাদের ঘরোয়া বিভেদের সুযোগ নেবে বিদেশী শত্রু। আমরা তাদের রুখতে গিয়ে দেখব যে, পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে নেমে আমরা বলক্ষয় করে বসে আছি।

চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে যে সংহতি চাই সেই সংহতির দাবী আমাদের অন্য কোনো প্রকার সংগ্রামে লিপ্ত হতে দেবে না। মাঝে মাঝে নির্বাচন দ্বন্দ্ব হবে। সংগ্রাম করতে চাইলে নির্বাচন সংগ্রামে যোগ দিতে পারা যাবে। বলা বাহুল্য, এর সঙ্গে ত্যাগ বা তপস্যার সম্পর্ক নেই।

যারা পেশাদার সৈনিক তাদের কথা আলাদা। কিন্তু যারা এককালে জাতীয় সংগ্রামে যোগ দিত সে রকম লোক এখন কেবলমাত্র গঠনের কাজ করে সন্তুষ্ট নয়। নির্বাচনেও তাদের তৃপ্তি নেই। হিংসাবাদীদের তবু একটা নির্গমনের পথ আছে। কেউ ট্রাম বাস পোড়ায়, কেউ সংখ্যালঘুদের মারে, কেউ থানা বা ডাকঘরের উপর হামলা করে। কিন্তু অহিংসাবাদীদের হাত-পা বাঁধা। ওরা এখন আর সংগ্রামের কথা বলে না।

আমার এক স্নেহের পাত্র এখন সর্বোদয় নেতা। তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা, তোমরা কি কোনো ইস্যুতেই লড়বে না? ধরো, যদি কনস্ক্রিপশন প্রবর্তিত হয়, যদি যুবকদের ধরে নিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করতে বলা হয়—"

"যার বিবেকে বাধবে সে ব্যক্তিগতভাবে প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্র যদি পার্লামেণ্টে আইন পাশ করে কনস্ক্রিপশন চালায় তবে আমাদের গণসত্যাগ্রহ করা চলবে না। করলে ওটা হবে গণতন্ত্রবিরুদ্ধ কাজ।"

জিজ্ঞাসা করিনি পার্লামেণ্ট যদি মদ্যপান নিবারণ না করে অবাধে প্রচলন করে তা হলে কী কর্তব্য। সম্ভবত একই উত্তর পেতুম। গণতন্ত্র থাকতে গণসত্যাগ্রহ সুদূরপরাহত। ওই নির্বাচন দ্বন্দ্বই একমাত্র অহিংস সংগ্রাম যাতে লক্ষ লক্ষ লোক যোগ দিতে পারে।

অস্তেয়

একজন মানুষ আরেকজন মানুষের ধন অপহরণ করলে তার নাম হয় চুরি। চুরির জন্যে কঠিন সাজা দেওয়া হয়। চোরকে সকলেই নিন্দা করে। যে সমাজে চুরি নেই সেই সমাজকে সকলেই প্রশংসার চোখে দেখে।

একজন মানুষ আরেকজন মানুষের শ্রম অপহরণ করলে তার নাম কী? তার নামও চুরি। কিন্তু তার জন্যে কঠিন সাজা দেওয়া হয় না। তার বদলে দেওয়া হয় পুরস্কার। সমাজের সব চেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তি এঁরাই। সাধুসন্ন্যাসীদেরও দেখা যায় এঁদের আশে পাশে ঘুরতে। চোরাই শ্রমের একাংশ সাধুকে দিলে সাত খুন মাফ। আরেক অংশ দিতে হয় রাজাকে, রাজপুরুষদের। করহিসাবে, উৎকোচ হিসাবে। তা হলে আর ওটা চৌর্য নয়। আইনকর্তারাও আইন করে দিয়ে চোরাই শ্রমের সম্পদকে উত্তরাধিকারীসূত্রে হস্তান্তরের ব্যবস্থা করে দেন। বাপের চুরির ফল ভোগ করে ছেলে। স্বামীর চুরির ফল ভোগ করে স্ত্রী।

ফল ভোগ এতকালপর্যন্ত ছিল সুফল ভোগ। কিন্তু জমানা বদলে গেছে। এখন এসেছে কুফল ভোগের পালা। দেশকে দেশ লাল হয়ে যাচ্ছে কেন? কারণ কৃষক আর সহ্য করতে চায় না যে তার শ্রম চুরি করে জমিদার বা মহাজন বংশানুক্রমে ফুলে ঢোল হবে। শ্রমিকও আর সহ্য করতে চায় না যে তার শ্রম চুরি করে কলওয়ালা বা সওদাগর বংশানুক্রমে বড়লোক হবে। বিপ্লব যাকে বলা হয় সেটা ওই চোরাই শ্রমের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তির সঙ্গে প্রতিবাদ। প্রতিবাদ যে সব ক্ষেত্রে সফল হবেই এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু যতদিন না সফল হয়েছে ততদিন তার সম্ভাবনা থেকে যাবে।

স্বাধীন দেশগুলোতেও বিপ্লব ঘটছে দেখে কী মনে হয়? এই মনে হয় যে স্বাধীন দেশগুলোতেও শ্রমচুরি অব্যাহত। ইদানীং মধ্যবিত্তদের শ্রম চুরি যাচ্ছে মুদ্রাস্ফীতি তথা বর্ধিত মূল্য আকারে। কখনো আইনসঙ্গতভাবে, কখনো আইনকে কলা দেখিয়ে এই যে শ্রম চুরি চলেছে এই হরির লুট মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজেদের অভ্যস্ত শ্রম চুরির চেয়ে আরো সাংঘাতিক। অথচ এর জন্যে কারো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হচ্ছে না, কাউকে উত্তরাধিকারের থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে না। চুরি করে দিব্যি হস্তান্তর করে চলে যাচ্ছে

শ্রমচোর। কিছু দিচ্ছে পার্টিদের তহবিলে, কিছু সাধুদের আশ্রমে, কিছু মধ্যবিত্তদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে। কিছু খবরের কাগজের মুখ বন্ধ করতে। কিছু শ্রমিকদের ধর্মঘট বন্ধ করতে।

স্বাধীনতার পরবর্তী অবস্থাটা আগে থেকে অনুমান করে গান্ধীজী অহিংসার সঙ্গে সঙ্গে অহিংসারই সমতুল্য আরো একটি নীতির উপর অতখানি জোর দেন। সেই নীতির নাম অস্তেয়। কেউ কারো ধন অপহরণ করবে না। কেউ কারো শ্রম অপহরণ করবে না। জীবনের শেষদিন এক মার্কিন মহিলা সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখেন তিনি চরকা নিয়ে বসেছেন, সযত্নে সুতো কাটছেন। এর তাৎপর্য তিনি যে কেবল অহিংসাবাদী তাই নয়। তিনি অস্তেয়বাদী। তিনি কারো শ্রম চুরি করবেন না। তাঁর ওই চরকা তাঁকে প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয় যে তিনিও একজন দিনমজুর।

তাঁর খাদির পরিকল্পনাও এমন যে তাতে শ্রম চুরির অবকাশ নেই। শেষবয়সে তিনি সে পরিকল্পনা আরো সংশোধন করেন। খাদি নিয়ে ব্যবসাদারি যাতে সঙ্কুচিত হয়। স্বাধীনতার পরে যাঁরা বড় বড় পরিকল্পনা করছেন তাঁরা কি ঠিক জানেন যে তাতে ধন চুরি তথা শ্রম চুরির সহস্র ছিদ্র রুদ্ধ? তা যদি না হয় তো অমঙ্গলের সহস্র ছিদ্র মুক্ত হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা হলেও লোকে ধন চুরি তথা শ্রম চুরি সহ্য করবে না। একদিন ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়বে। এখন থেকেই যেন তাঁরা সহস্র ছিদ্র রুদ্ধ করেন। তা যদি না পারেন তবে বড় বড় পরিকল্পনা ছেড়ে যেন ছোট ছোট পরিকল্পনায় হাত দেন। তাতে ধন চুরি তথা শ্রম চুরির ছিদ্র সংখ্যায় অত বেশী নয়, রোধ করাও অত শক্ত নয়।

পরিকল্পনা যত বড়ই হোক আর যত ছোটই হোক তাকে অস্তেয় নামক নীতির আমলে আনতে হবে। ধন চুরি তথা শ্রম চুরি বরদাস্ত করা চলবে না। সবাইকে এবিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে। কর্তাদের, কর্মীদের, জনসাধারণের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে ধন চুরি যেমন একটা জঘন্য অপরাধ শ্রম চুরিও তেমনি জঘন্য, এমন কি তার চেয়েও বেশী জঘন্য। আফ্রিকার নিগ্রোদের শ্রম চুরি করার জন্যে তাদের ক্রীতদাস করে আমেরিকায় চালান দেওয়া হয়েছিল, সেই পাপে আমেরিকা গত শতাব্দীতে গৃহযুদ্ধে জর্জর হয়। এখনো তার জের মেটেনি। আমাদের অস্পৃশ্যতার মূলেও সেইরকম কিছু ছিল। সাম্প্রদায়িক সমস্যার মূলে তো ছিলই।

পূর্ববঙ্গের মুসলমান চাষীদের শ্রম চুরি করেছিল বহুকাল ধরে বহু হিন্দু জমিদার ও মহাজন। সাজা পাওনা ছিল। ইতিহাসে অনেক সময় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়ে। সাধারণ হিন্দু যদিও শ্রম চুরি করেনি তবু শ্রমচোরদের পাওনা সাজা সাধারণকেও পেতে হয়েছে।

ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজমের বিরুদ্ধে অবশ্য আরো একটা অভিযোগ আছে। সেটা খাদির বিরুদ্ধে করবার জো নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিজম হচ্ছে অশ্বিনী-কুমারের মতো যমজ। ওর অপর ভ্রাতার নাম মিলিটারিজম। ইতিমধ্যে ইনিও পৌঁছে গেছেন।

সেকুলারিজম

সঙ্কটকালে সৈনিকের কর্তব্য যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়া নাগরিকের কর্তব্য যেমন যে যার জায়গায় স্থির থেকে নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদন করা, ইন্‌টেলেক-চুয়ালের কর্ম তেমনি প্রত্যেকটি বিষয় পরিচ্ছন্নভাবে চিন্তা ও প্রকাশ করা। মানসিক বিশৃঙ্খলাও দেশের পক্ষে অহিতকর।

এই সঙ্কটে ভারতের আভ্যন্তরিক দুর্বলতা হচ্ছে, সাধারণ লোক বোঝে না সেকুলার স্টেট বলতে কী বোঝায়। যাঁরা সাধারণ নন, অসাধারণ, তাঁরাও সেকুলার শব্দটির বিভিন্ন অর্থ করেন। তার ফলে সাধারণের মনে ধাঁধা লাগে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে সব দেশেই রাজতন্ত্রের সঙ্গে পুরোহিততন্ত্রের বা সন্ন্যাসীতন্ত্রের মাণিকাঞ্চনযোগ ছিল। তখনকার দিনে কল্পনাই করতে পারা যেত না যে রাষ্ট্র আর ধর্ম দুই স্বতন্ত্র সত্তা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ধর্মের হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ অন্যায়, ধর্মীয় ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশ অন্যায়।

আমেরিকার তেরোটি ব্রিটিশ উপনিবেশ যখন স্বাধীনতা লাভ করে রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করে তখন তাদের সেই প্রজাতন্ত্রে রাজতন্ত্রের সাথী পুরোহিততন্ত্র বা সন্ন্যাসীতন্ত্রের ঠাঁই হয় না। মণির সঙ্গে সঙ্গে কাঞ্চনও বাদ যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি আছেন, কিন্তু তাঁর যে কী ধর্ম তার উল্লেখ নেই। গবর্ণমেণ্ট আছে, কিন্তু তার যে কী ধর্ম তারও সন্ধান নেই। কংগ্রেস আছে, কিন্তু তার যে কী ধর্ম তারও ঠিকানা নেই। অর্থাৎ যাঁর যে ধর্মে রুচি সে ধর্মে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি খ্রীস্টান না ইহুদী, খ্রীস্টান হয়ে থাকলে ক্যাথলিক না প্রোটেস্টাণ্ট, প্রোটেস্টাণ্ট হয়ে থাকলে লুথারপন্থী না ক্যালভিনপন্থী না কোয়েকার না মেথডিস্ট না অন্যান্য শাখার অন্তর্ভুক্ত কেউ তা জানেও না, জানতে চায়ও না। মনে রাখবেন "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে।" সামাজিক ক্রিয়াকর্মের বেলা জানতে চায়, জানে। হয়তো বাছবিচার করে। কিন্তু সংবিধান সে বিষয়ে নীরব।

আমেরিকার বিপ্লবের পর এই যে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের বিয়োগ এটা ফরাসী বিপ্লবেরও অন্যতম বৈশিষ্ট্য হয়। ফরাসীরা আরো এক পা এগিয়ে গিয়ে রাজার ও চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে। একদল তো ঈশ্বরকে পর্যন্ত অস্বীকার করে। আমেরিকানরা নাস্তিককে সহ্য করে না। কিন্তু ফরাসীরা করে।

তারপর একে একে অনেকগুলি দেশ রাজতন্ত্র ছেড়ে প্রজাতন্ত্র গ্রহণ করেছে। কিন্তু মার্কিন বা ফরাসীর মতো রাজার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় হস্তক্ষেপ বা অনুপ্রবেশকে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার থেকে বিদায় দিতে হবে এটা অনেকেই মানে না। সেইজন্য প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেও সংবিধানের ললাটে এঁকে দিয়েছে "ক্যাথলিক" বা "ইসলামী" বা "ইহুদী" বা "বৌদ্ধ"। আমাদের প্রতিবেশী বর্মা প্রথমে হয়েছিল আমাদেরি মতো সেকুলার-স্টেট। কিন্তু সুবুদ্ধি থাকিন নু-র কুবুদ্ধি হল। তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সাহায্যে ভোটযুদ্ধে বিজয়ী হবার পর তাদের সহায়তার মূল্য দেবার জন্যে "বৌদ্ধ রাষ্ট্র" প্রবর্তন করেন। সঙ্গে সঙ্গে খ্রীস্টধর্মী কারেন, কাচিন, শানরা পৃথক শাসন দাবী করে। তা দেখে সেনাপতি নে উইন ক্ষমতা হাতে নেন। থাকিন নু এখনো বন্দী। বর্মা এখন আবার সেকুলার স্টেট। ভোটের বালাই নেই বলে বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও রাজনৈতিক ওজন নেই।

দূরদর্শী নেহেরু এইসব কারণেই হিন্দু রাষ্ট্র প্রবর্তন করেননি। তখন গান্ধীজী জীবিত ছিলেন। তিনিও পরামর্শ দেন সেকুলার স্টেট সংস্থাপন করতে। "আমাদের সংখ্যার জোর বেশী। আমরা আমাদের খুশিমতো হিন্দু রাষ্ট্র প্রবর্তন করব," এই যাদের যুক্তি তাদের হাতে পড়লে এদেশ বেশীদিন সংহতিরক্ষা করতে পারবে না। খ্রীস্টধর্মী নাগারা তো স্বাধীনতার জন্যে লড়বেই। লড়বে বৌদ্ধধর্মী সিকিম, ভুটান। লড়বে পাঞ্জাবের শিখরা, কেরলের খ্রীস্টানরা ও সর্বোপরি কাশ্মীরের মুসলমানরা। হিন্দুদেরও তো বারো রাজপুতের তেরো হাঁড়ি। একবার ভাঙন ধরলে এ রাষ্ট্র চৌচির হয়ে যাবে।

সুতরাং সেকুলার স্টেট হচ্ছে সেই ভিত্তি যা আমাদের রাষ্ট্রকে ধারণ করে আছে। যে ধারণ করে আছে তাকেও ধারণ করা অত্যাবশ্যক। এটা একজনের একটা খেয়াল নয় যে একে বিসর্জন দিলেও চলে। অথচ এরকম বিপরীত বুদ্ধি আমাদের দেশে অতি সুলভ। হিন্দুরাই যেন এদেশের মালিক, আর সকলে হিন্দুদের কৃপায় বাস করছে। প্রকৃত সত্য তা নয়। হিন্দুরাও আর সকলের কৃপায় বাস করছে। তারা যদি বিমুখ হয় তবে রাষ্ট্র ভেঙে যাবে, শিখরা প্রাণ দিয়ে লড়বে না, পার্শীরা সেনা পরিচালনা করবে না, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানরা শত্রুবিমান ভূতলে নামাবে না, খ্রীস্টানরা নার্স হয়ে রণাঙ্গনে যাবে না। আর মুসলমানরা প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলে অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবে।

অর্থনীতির বিভিন্ন ধাপ তাদের উপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুর চেয়ে মুসলমান কম দরকারী নয়। এখানে মানুষ হিসাবে বিচার করতে হবে। টিকি দেখে বা দাড়ি দেখে নয়। ঘরে আগুন লাগলে যারা নিবিয়ে ফেলতে ছুটে আসে তারা কে কোন ধর্মের লোক কোন সমাজের লোক এটা মূর্খের গণনা। তেমনি শিল্পে বাণিজ্যে কৃষিতে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যার কর্ম তারে সাজে। তাকে পরম সমাদরে তার স্বস্থানে নিযুক্ত রাখতে হবে। তাকে ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দেওয়া চলবে না। তাকে কথায় কথায় সন্দেহ করাও নির্বুদ্ধিতা। কোটি কোটি নাগরিককে সন্দেহ করলে মানুষ বিশ্বাস করবে কাকে? শেষকালে নিজের সম্প্রদায়কেও অবিশ্বাস করে বসবে।

সঙ্কটকালে শুভবুদ্ধি জাগ্রত থাকলে সঙ্কট পার হওয়া তত কঠিন হবে না, যত কঠিন হবে ঘরে-বাইরে সর্বত্র জুজু দেখলে। সেকুলার স্টেটের বিরোধী যাঁরা তাঁরা এতকাল বলে এসেছেন লোক বিনিময় করা উচিত। তাঁদের মতে সব মুসলমানই কালো সব হিন্দুই সাদা। মানুষকে অমন করে সাদায় কালোয় ভাগ করা যায় না। সেটা যে আমরা করিনি এর জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ। পূর্ব পাঞ্জাবে মুসলমান নেই, সুতরাং সেখানকার জনগণের উপর বোমা ফেলতে পাকিস্থানী বোমারু বৈমানিকদের বাধে না। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান আছে। এখানকার জনগণের উপর বোমা ফেললে মুসলমানেরাও মরবে। তাই পশ্চিমবঙ্গের উপর পাকিস্থানী বোমারু বৈমানিকরা বোমা বর্ষণ করছে না। লোকবিনিময়বাদীরা যদি পশ্চিমবঙ্গকে নির্মুসলমান করতেন তবে তাঁরাই বোমার বলি হতেন।

হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে থাকা কেন প্রয়োজন, একথা হাজার তর্ক করেও বোঝানো যায়নি। এতদিনে ওটা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হবে। তাই যদি হয় তবে মুসলমানকে ধরে রাখাই প্রাণে বাঁচার উপায়। যাকে রাখ সেই রাখে। একথা ওপারের হিন্দুদের বেলাও খাটে। ওখানকার মুসলমানরা এবার হিন্দুদের প্রাণপণে রক্ষা করেছে। হিন্দুরা থাকলে এপারের বৈমানিকরা বোমা বর্ষণ করবে না। মুসলমানদেরও প্রাণরক্ষা হবে। এর থেকে একদিন আসবে ইসলামী রাষ্ট্রে অরুচি ও সেকুলার রাষ্ট্রে রুচি। তর্ক করে যেটা বোঝানো যায়নি সঙ্কটের লজিক সেটা বোঝাবে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের অন্তঃপরিবর্তন যখন আরো গভীর হবে তখন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হতে পৃথক হয়ে যেতে পারে। আর যদি পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম

পাকিস্তানের মুসলমানরাও উপলব্ধি করে যে বিপৎকালে অপর সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলে মিশে থাকাই শ্রেয় তা হলে তাদেরও অন্তঃপরিবর্তন ঘটবে। তখন পাকিস্তান আর ইসলামী স্টেট বলে অহঙ্কার বোধ করবে না। বরং পূর্ব পাকিস্তানকে সঙ্গে রাখার জন্যে সেকুলার মতবাদ অবলম্বন করতে চাইবে।

একদিন ক্লাসের পরে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে আমার প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক নিশিকান্ত সান্যাল মহাশয় বলেন, "অশোকের ওই বিশাল সাম্রাজ্য পরে ভেঙে পড়ল কেন, তার আসল কারণ জানো? বৌদ্ধধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব। যেদেশে বহু ধর্ম সেদেশে একটি ধর্ম যদি রাজধর্ম হয় ও সেই ধর্মটির প্রতি যদি রাজ আনুকূল্য বর্ষিত হয় তবে সে রাজ্য টেকে না।"

আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করি। আমার মনে হয়েছিল তিনি নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব বলেই অমন উক্তি করলেন। তিনি আমাকে বোঝান যে তিনি বৌদ্ধ-ধর্মের বিরুদ্ধে নন, বৌদ্ধধর্মের রাজধর্ম হওয়ার বিরুদ্ধে। আশোকের বৌদ্ধ হওয়াটা ভুল নয়, বৌদ্ধধর্মকে রাজধর্ম করাটাই ভুল।

তেতাল্লিশ বছর পরে তাঁর সঙ্গে আমি একমত। ব্যক্তিগত মুক্তি বা নির্বাণ বা পরিত্রাণের জন্যে যে-কোনো ব্যক্তি যে-কোন ধর্মে বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু রাজা তাঁর নিজের ধর্মকে রাজধর্ম করবেন ও আর-সব ধর্মের উপর অগ্রাধিকার দেবেন এটা হয়তো সেই ধর্মটির দিক থেকে সুবিধের, রাজ্যের দিক থেকে সুবুদ্ধি নয়। বৌদ্ধধর্মেরও শেষপর্যন্ত এতে লাভ হয়নি। বিস্তার ঘটেছে, কিন্তু শিকড় ক্ষয়ে গেছে।

প্রত্যেক রাষ্ট্রের একটা কাঠামো থাকে। সেটা যদি মজবুৎ হয়ে থাকে তবে বহিঃশত্রুর আক্রমণ, ক্ষমতা নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রজাদের অসন্তোষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নেপোটিজমের অবশ্যম্ভাবী কুফল ইত্যাদি বহু শতাব্দী ধরে সে পোহাতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রের কাঠামো মোটের উপর শক্ত ছিল। সেটা ছিল ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রাজা ক্ষত্রিয়, মন্ত্রী ব্রাহ্মণ। সামরিক ক্ষমতা ক্ষত্রিয়ের, অসামরিক ক্ষমতা ব্রাহ্মণের। ক্ষত্রিয় শব্দটির সংজ্ঞা যথেষ্ট উদার ছিল। গায়ের জোরে যে জবর দখল করত সেই ক্ষত্রিয় হতে পারত। কে মনে রাখতে যাচ্ছে যে তার গর্ভধারিণী শূদ্রাণী? চন্দ্রগুপ্তের জননী যেমন শূদ্রাণী অশোকের তেমনি ব্রাহ্মণী। আর ব্রাহ্মণ শব্দটির সংজ্ঞাও যথেষ্ট উদার ছিল। শকদের সঙ্গে তাদের পুরোহিতরাও

আসেন ও পরে ব্রাহ্মণ বলে গণ্য হন। যেমন একালের নমঃশূদ্রদের পুরোহিতরাও ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দিচ্ছেন ও ব্রাহ্মণের পদবী নিচ্ছেন।

চন্দ্রগুপ্ত ব্যক্তিগত জীবনে জৈন হলেও ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। ক্ষত্রিয় সমাজই তাঁর সমাজ। তেমনি অশোকও ব্যক্তিগত জীবনে বৌদ্ধ হলেও ক্ষত্রিয়ই ছিলেন। বৌদ্ধদের গ্রন্থে এর স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয় সমাজই তাঁর সমাজ। তবে শেষের দিকে তিনি বোধহয় বৌদ্ধদের সঙ্ঘে যোগ দেন। সঙ্ঘে যারা যোগ দিত তারা জাত দিত। সমাজে যারা থাকত তারা জাত রাখত। অমুক ব্যক্তি জৈন বা বৌদ্ধ বা শিখ বললে এমন কথা বোঝায় না যে অমুক ব্যক্তি জাতে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র নন ; জাতি ও ধর্ম এদেশে একার্থক নয়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও চেয়েছিলেন যে ব্রাহ্ম হবার পরেও লোকে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ বা নাপিত বা মুচি থাকে। এটা কেশবচন্দ্র প্রভৃতির অসহ্য হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই যে বিদ্রোহ সে বিদ্রোহ ইতিহাসে অপূর্ব। জাতিভেদের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে এখন আর কাউকে সন্ন্যাস নিতে বা সঙ্ঘে যোগ দিতে হয় না। সমাজে থেকে ও গৃহস্থ হয়েও এখন জাত দেওয়া যায়। নতুন একটা জাত তৈরি করারও দরকার হয় না।

চন্দ্রগুপ্ত জৈন হবার দরুন বা অশোক বৌদ্ধ হবার দরুন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। সামরিক ক্ষমতা, শাসকের ক্ষমতা ক্ষত্রিয়দের হাতেই রয়ে গেছে। অসামরিক ক্ষমতা, মন্ত্রীর ক্ষমতা ব্রাহ্মণদের হাতছাড়া হয়নি। এসব সাধারণত বংশানুক্রমিক। জাত জিনিসটা আসলে পেশার ধারাবাহিকতা। যার যেমন পেশা তার তেমন জাত। পরে, যার যেমন জাত তার তেমন পেশা। সাধারণত সেটা বংশানুক্রমিক ছিল। কেউ একজন বৌদ্ধ বা কোনো একটি পরিবার জৈন হলেই অমনি তার বা তাদের পেশা বদলে যেত না। তাই জাত বদলে যেত না। ধর্ম নিয়ে দ্বন্দ্ব বলতে একালে যা বোঝায় প্রাচীন ভারতে তা বোঝাত না। তার সূচনা মুসলমান আগমনের পর থেকে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সেই প্রথম আঘাত পড়ে। মুসলমান হলেই সব রকম পদে অধিকার বর্তায়। যে চণ্ডাল মুসলমান হয়েছে সে রাজাও হতে পারে, মন্ত্রীও হতে পারে, সেনাপতিও হতে পারে, সওদাগরও হতে পারে। চিরন্তন কাঠামোটাকে বিপর্যস্ত করে দিতে পারে।

মুসলমানী আমলের গোড়ার দিকে ইসলামী রাষ্ট্রের কাঠামো আমদানীর

চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু এদেশের মাটিতে ও জিনিস টেকে না। বহু অঞ্চল হিন্দুদের দখলে থেকে যায়, যেসব অঞ্চলে পুরাতন বন্দোবস্ত। মুসলমান অধিকৃত অঞ্চলেও হিন্দুদের সঙ্গে একটা নয়া বন্দোবস্ত হয়। সাধারণত দেওয়ানী হিন্দুদের হাতে, ফৌজদারী মুসলমানদের হাতে। তার মানে সেই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়। তবে ঠিক সাবেক অর্থে নয়। জাতে ব্রাহ্মণ নন এমন বহু লোক মুসলমান সরকারে অসামরিক পদ পান, পরে জমিদারি পান। ক্ষত্রিয় নন এমন বহু লোক সামরিক পদ পান, সামন্তরাজা হন। ওদিকে সৈয়দরা বা মৌলানারা ব্রাহ্মণের মর্যাদা পান। ক্ষত্রিয় মর্যাদা পান। ক্ষত্রিয় মর্যাদা যে সব মুসলমানকেই দেওয়া হয় তা নয়। আভিজাত্যের সৃষ্টি হয়। মুসলমান সমাজ আর ডেমোক্রাটিক থাকে না।

ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি হিন্দুতে মুসলমানে নয়, হিন্দুতে হিন্দুতে, মুসলমানে মুসলমানে। সব উপরের স্তরে। নিচের স্তরে কারো সামনে কোনো লোভনীয় পদ বা মর্যাদা ছিল না। যে ভিস্তি সে ভিস্তিই। যে দর্জি সে দর্জিই। তেমনি যে তাঁতী সে তাঁতীই। যে কামার সে কামারই। নিচের স্তরে যেটা ছিল সেটা গোহত্যা নিয়ে দাঙ্গা বা সেই জাতীয় ব্যাপার। ধর্মের লড়াই বলতে মধ্যযুগের ইউরোপের ইতিহাসে যা বোঝায়, যার জন্যে বহু লোক আমেরিকায় চলে গিয়ে স্বাধীনভাবে বিশ্বাস করতে চাইল, সে জিনিস ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে অনুপস্থিত। বিশ্বাসের স্বাধীনতা এখানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতো নিত্য প্রবাহিত ছিল। মুসলমানরা বিশ্বাসের স্বাধীনতায় যেটুকু হস্তক্ষেপ করেছিল সেটুকু মানুষকে দেশছাড়া বা ঘরছাড়া করবার মতো নয়। হিন্দু রাজাদের উৎপীড়নে হিন্দুরা হিন্দুরাজ্য ছেড়ে পালিয়েছে, আবার ফিরে এসেছে। তেমন উৎপীড়নকে ধর্মের উৎপীড়ন বলে না। মুসলমান রাজারাই এদেশে ইসলামী রাষ্ট্র প্রবর্তনে আপত্তি করেন। রাজা মুসলমান হলেই রাষ্ট্র ইসলামী হয় না। দেশটাও তার উপযোগী হওয়া চাই। অধিকাংশ মুসলমান রাজার সেটুকু বাস্তবজ্ঞান ছিল। যাঁদের ছিল না তাঁদের বুদ্ধির ভুলে তাঁদের ধর্ম অশোকের আমলের বৌদ্ধধর্মের মতো রাজ আনুকূল্য পেয়ে রাজ্যের স্থায়িত্বের অন্তরায় হলো। ধর্মের বিস্তার ঘটল, কিন্তু রাজ্যের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যেতে লাগল। ফলে পলাশীতে পরাজয়।

আমি ইসলামের বিরুদ্ধে নই, ইসলামকে রাজধর্ম করার বিরুদ্ধে। তেমনি

হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে নই, হিন্দুত্বকে রাজধর্ম করার বিরুদ্ধে। মারাঠাদের আমলে রাজধর্ম দস্যুধর্মে পরিণত হয় ও স্বধর্মীকে রক্ষণের নামে ভক্ষণ করে। বর্গীর হাঙ্গামায় যত লোক পালিয়েছে তুর্কের হাঙ্গামায় তত লোক নয়। ইংরেজরা যে অত সহজে এদেশ করায়ত্ত করে তার প্রধান কারণ তারা তাদের ধর্মকে কোনো রকম বিশেষ মর্যাদা বা অগ্রাধিকার দেয় না। প্রথম থেকেই এই নীতি স্থির হয় যে ইংরেজ সরকার সব ধর্মকে সমান মর্যাদা দেবে, কোনো ধর্মে হস্তক্ষেপ করবে না। এটার নজীর আকবর দেখিয়েছিলেন, তাঁর আগেও এর নজীর খুঁজলে পাওয়া যায়, কিন্তু এবার সমসাময়িক ইউরোপের নতুন সুরে বাধা। ইউরোপে ওটার নাম এন্‌লাইটেনমেণ্টের যুগ। লণ্ডন থেকে যাঁরা নীতি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন তারা ধর্মের যুগ পেরিয়ে এসেছেন, মধ্যযুগ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। এদেশে যেটা কোনো একজন রাজার বা সম্রাটের ব্যক্তিগত উদারতা হিসাবে গণ্য ছিল সেটা এখন থেকে রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক ভিত্তিশিলা হিসাবে পুরুষানুক্রমিক হলো। একজন রাজা পরধর্মসহিষ্ণু হন তো তাঁর বংশধর পরধর্ম অসহিষ্ণু হন। কিংবা তিনিই এক এক বয়সে এক এক মূর্তি ধরেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান এক একজন রাজার এক এক নীতি। পাকাপাকিভাবে রাষ্ট্রের নৈর্ব্যক্তিক নীতি তা নয়। সেইজন্যে উদারচরিত রাজন্যদের সংখ্যা যত বেশীই হোক না কেন তাঁদের কারো রাষ্ট্রকেই ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায় না। সেকুলার বলা যায় না।

কেউ কেউ সেকুলারের অর্থ করেন ধর্মে নিরপেক্ষতা। সেটা ঠিক নয়। যে মানুষ ধর্মে নিরপেক্ষ তারও একটা নিজের ধর্ম থাকে। কিন্তু এমন তো হতে পারে যে তার কোনো ধর্মে বিশ্বাস নেই, সে অজ্ঞেয়বাদী বা নাস্তিক। ইংরেজ আমলে ধর্মে নিরপেক্ষতা ছিল, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল না। নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীকে ইংলণ্ডের সিংহাসনে বা বিশিষ্ট রাজপদে অধিষ্ঠান করতে দেওয়া হতো না। শপথ নিতে হতো ভগবানের নামে। এমন কি পার্লামেণ্টেও ব্র্যাডলকে বসতে দেওয়া হয়নি, তিনি শপথ নিতে রাজী হলেও তাঁকে নিতে দেওয়া হয়নি। যেহেতু তিনি ঈশ্বরবিশ্বাসী নন। সেই ইংরেজই তো ছিল এদেশের হর্তাকর্তা বিধাতা।

ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন ইতিহাসের প্রাচীন বা মধ্যযুগে তো নয়ই, ইংরেজ আমলেও নয়। এটা কংগ্রেস আমলেরই বিশেষত্ব। এর জন্যে আমরা গর্ব অনুভব করতে পারি। আমাদের হাত দিয়েই বা ভোট দিয়েই

এটা সম্ভব হয়েছে। একে রক্ষা করা আমাদের পরব দায়িত্ব। ধর্মের জন্যে কেউ যদি এ রাষ্ট্রে ছেড়ে পালায় তবে সেটা আমাদের কলঙ্ক। আমাদের উপর অনাস্থাসূচক।

এই নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তিশিলা সর্ব ধর্ম সহিষ্ণুতা তো বটেই, তার চেয়েও কিছু বেশী। এ রাষ্ট্র ধর্মের এলাকার বাইরে যারা থাকবে তাদের প্রতিও সহিষ্ণু। না, তার চেয়েও বেশী। এ রাষ্ট্র তাদের নাস্তিক হবার, অজ্ঞেয়বাদী হবার অধিকারও মেনে নেয়। তারা যে যার নিরীশ্বরতায় অবিচল থেকে ধাপে ধাপে রাষ্ট্রীয় পদে আরোহণ করতে পারে। একদিন হয়তো দেখা যাবে যে রাষ্ট্রপতি নিরীশ্বরবাদী। তিনি না হিন্দু, না মুসলমান, না খ্রীস্টান, না শিখ, না পার্সী, না বৌদ্ধ, না ইহুদী, না জৈন। হয়তো আরেকটি লেনিন কি স্টালিন। তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন কোনো শপথবাক্য আমাদের সংবিধানে নেই।

আজকালকার পরিভাষায় যাকে কনস্টিটিউশন বলা হয় আগেকার যুগে সেরকম কিছু বিবর্তিত হয়নি এদেশে। কিন্তু সেই যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সেটাও একহিসাবে একটা অলিখিত সংবিধান। মুসলমান আমলে সেটার অদলবদল হয়, কিন্তু পুরোপুরি রদ হয় না সেটা। ইংরেজ আমলে সেটা পাকাপাকিভাবে রদ হয়। তার বদলে দেখা দেয় আরেক রকম বন্দোবস্ত। একজিকিউটিভ, জুডিসিয়াল, লেজিসলেটিভ, এই তিন অঙ্গ। সব ক'টাই ইংরেজদের মুঠোর মধ্যে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে মুঠোর ভিতর থেকে বেরোয়। যাঁদের হাতে একটু একটু করে যায় তাঁরা প্রধানত হিন্দুসমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উচ্চশিক্ষিত স্তরের ব্যক্তি। তাঁদের প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুচ্চশিক্ষিত স্তরের ব্যক্তি। সরাসরি প্রতিযোগিতায় না পেরে এঁরা ধর্মের নামে দাবী করতে শুরু করেন ও প্রশ্রয় পান। এইভাবে যে ঝগড়ার সূচনা তা ক্রমশ নিচের স্তরে সঞ্চারিত হয়, উপরের স্তরেও সংক্রামিত হয়। অভিজাতদের মধ্যে কোনো কালেই ধর্ম নিয়ে বিরোধ ছিল না। অন্তত মোগল আমলে তো নয়ই। এই সেদিন দেখা গেল। ইংরেজ চলে গেলে তার উত্তরাধিকারী কে হবে, এই নিয়ে বেধে গেল দুই শরিকের লড়াই। কিছুতেই মিটমাট হলো না। উপর থেকে নিচে অবধি ফাটল। প্রত্যেকটি বিভাগ দু'ফাঁক। সৈন্য, পুলিশ, পেয়াদা, কেরানী, হাকিম।

আমরা স্বচক্ষে দেখলুম যে আমাদের দেশ দু'চির হয়ে গেল। যে ফাটল তাকে দু'চির করতে পারল সেই ফাটলের মতো আরো দু'চারটি ফাটল কি তাকে চৌচির করতে পারত না? হিন্দুরাষ্ট্র হলে শিখরা কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে শিখিস্থান? নাগা খ্রীস্টানরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে নাগাল্যাণ্ড? সিকিমের বৌদ্ধরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে স্বাধীন সিকিম? কাশ্মীরের মুসলমানেরাও কি বলত না, লড়কে লেঙ্গে স্বাধীন কাশ্মীর?

যে যার ধর্মকে রাজধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম করতে চাইলে এ দেশ দু'চির কেন, চৌচির হবে, চৌচির কেন, ছ'চির হবে। এই সর্বনাশা ফাটল দিয়ে আবার বাইরের শত্রু ঢুকবে। স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। স্বাধীনতার জন্যে এতকালের তপস্যা ব্যর্থ হবে। এসব কথা চিন্তা করেই ভারতীয় ইউনিয়নের কন্‌স্টিটিউশনে হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম করা হয়নি। হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং অধিকাংশের ভোটে হিন্দুরাষ্ট্র পত্তন করা অনায়াসেই সম্ভব ছিল। কিন্তু ওটা একটা ফাঁদ। ওতে পা দিলে মৌর্য সাম্রাজ্য বা গুপ্তসাম্রাজ্য বা হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ফিরে পাওয়া যেত না। মাঝখান থেকে হারিয়ে যেত ভারতীয় জাতীয়তাবাদ, জাতীয়তাবাদী মুক্তিসংগ্রাম, জাতীয় মুক্তি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। জাতীয়তার অর্থ এখানে হিন্দু জাতীয়তা নয়, হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান পার্শী নির্বিশেষে ও সবাইকে সমমূল্য দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তা। যে জাতীয়তা শিখকে বলে এটাও তোমারই স্থান, আলাদা একটা স্থান নিয়ে কী করবে? যে জাতীয়তা নাগা খ্রীস্টানকে বলে, এটাও কি তোমার ল্যাণ্ড নয়? স্বাধীন নাগাল্যাণ্ড নিয়ে কী করবে? যে জাতীয়তা কাশ্মীরী মুসলমানকে বলে, এটা হিন্দুস্তান নয়, এটা ইণ্ডিয়া, এখানে তুমি চিরকাল ছিলে, চিরকাল থাকবে। স্বাধীন কাশ্মীর নিয়ে কী করবে, কেনই বা পাকিস্তানে যোগ দেবে?

সেকুলারিজম ভারতের সীমান্ত রক্ষা করছে। শুধুমাত্র বন্দুক কামান যা না পারে একটি কলমের খোঁচা তা পারে। একটি শব্দ তা পারে। সেকুলারিজম তেমনি একটি কলমের খোঁচা। তেমনি একটি শব্দ। একে ওলটপালট করে দাও, দেখবে সীমান্তবর্তী অহিন্দু অঞ্চলগুলি এক এক করে খসে যাবে, যারা ছিল ঘরের লোক তারাই হবে বাইরের শত্রু। হিন্দুরাষ্ট্র অনায়াসেই সম্ভব, পার্লামেন্টের দুই-তৃতীয়াংশ ভোট তাকে যে-কোনোদিন সম্ভব করতে পারে। কিন্তু তার পরের দিন তার সীমান্তগুলিতে ভাঙন ধরবে। হিন্দুরাষ্ট্র নিজেই নিজেকে কোণঠাসা করবে। অভ্যন্তরে অহিন্দু যারা থেকে যাবে

তারাও অশান্ত হবে। তারা দাবী করবে চাকরিবাকরিতে আনুপাতিক অংশ ও তার উপর ওয়েটেজ। তার পর দাবী করবে স্বতন্ত্র নির্বাচন, সেক্ষেত্রেও ওয়েটেজ। তার পর দাবী করবে মন্ত্রীমণ্ডলীতে স্থান, কংগ্রেসী হিসাবে নয়, কংগ্রেস ভিন্ন অন্য এক সাম্প্রদায়িক দলের সদস্যরূপে। এক্জিকিউটিভ, জুডিসিয়াল, লেজিস্‌লেটিভ, সর্বত্র ফাটল ধরবে। দেশ অরাজক হবে। পুলিশ বা মিলিটারি যা না পারে সেকুলার স্টেট তা পারে। সীমান্ত রক্ষা তথা শান্তিরক্ষা।

সেকুলার স্টেট ভারতের ইতিহাসে একটি নতুন এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট। এ যদি হিন্দুদের মনে না বসে, যদি শুধু মুখের বুলি হয়, যদি তাদের মনের কথাটা হয় হিন্দু আধিপত্য, যার অন্য নাম ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেনিয়া মনোপলি, তা হলে ভিতরের সত্যটা একদিন না একদিন বাইরে ফুটে বেরোবে। কী করে মনে বসবে, যদি যুগ সম্বন্ধে কোনো ধারণা তাদের না থাকে? যুগটাই ফরাসী বিপ্লবের সময় থেকে রাজতন্ত্র তথা ধর্মতন্ত্র তথা উভয়ের মণিকাঞ্চনযোগে বিশ্বাস হারিয়েছে। ইংরেজ চলে গেছে বলে যুগটা তো চলে যায়নি। যুগের হাওয়া থেকে কোনো দেশই মুক্ত নয়। ভারতের স্বাধীনতার অর্থ যুগের হাত থেকে মুক্তি নয়। আমরা বরং আমাদের যুগের সঙ্গে আরো অবাধে যুক্ত হবার সুযোগ পেয়েছি। এ হাওয়া যে বার্তা বহন করে এনেছে তার অনুরূপ অতীতের আর কোনো যুগে শোনা যায় নি। না মহাভারতের যুগে, না মৌর্যযুগে, না গুপ্তযুগে, না মুঘল যুগে। যাকে আমরা ব্রিটিশ যুগ বলে জানি সেটা একটা বৃহত্তর যুগের অঙ্গ। এ যুগ ভারতকে বিশ্বের মধ্যে ও বিশ্বকে ভারতের মধ্যে সঞ্চারিত করেছে। আমাদের অতীত বিচ্ছিন্ন হতে পারে, বর্তমান বিচ্ছিন্ন নয়, ভবিষ্যৎ বিচ্ছিন্ন থাকবে না। এ যুগের যা শিক্ষা তাকে অন্তর থেকে গ্রহণ করতে হবে।

একদিন পাকিস্তানের মুসলমানরাও করবে। তার জন্যে ধৈর্য ধরতে হবে। ওরা যদি সেকুলার নাও হয় তবু আমরা হব। সেইভাবে আমরা অন্যান্য অগ্রসর দেশগুলি সঙ্গে পা মিলিয়ে নেব। পাকিস্তানের অনুকরণে ধর্মরাষ্ট্র প্রবর্তন নয়, আমেরিকা রাশিয়া ও ফ্রান্সের অনুসরণে সেকুলার স্টেট প্রবর্তন এই হচ্ছে অগ্রগতির শর্ত।

সম্পাদকের সঙ্গে আমি একমত নই যে পশ্চিমবঙ্গে সেকুলার মানসিকতা বিরাজমান। সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র কিসের সাক্ষ্য দেয়? বারোয়ারি

দুর্গাপূজা, কালীপূজা, বিশ্বকর্মাপূজা এমন কি শীতলাপূজার এমন উৎকট প্রাদুর্ভাব ইংরেজ আমলেও তো দেখিনি। সরকারী অফিসে ও থানাতেও আজকাল পূজাপার্বণ হয়। রাষ্ট্রের যাঁরা কর্ণধার তাঁরা তাঁদের কর্ণ গুরু মহারাজদের হাতে সঁপে দিয়েছেন দেখা যায়। দিল্লীতে নাকি হেন মন্ত্রী নেই যাঁর জ্যোতিষী নেই। বছরের ক'টা দিন কাজকর্ম হয়? সম্প্রদায়ের—প্রধানত হিন্দুদের—ধর্মকর্মের জন্যে ছুটি। সরকারী কর্মচারীরা ভুলে যান যে তাঁদের মাইনে জোগায় সব সম্প্রদায়ের লোক। কালীপূজার উদ্বোধন কি বেসরকারী ব্যক্তিদের দিয়ে হোত না? সম্পাদকের প্রশ্নের উত্তরে বলি, কাশ্মীরের বোমাবর্ষণ বিমানবন্দর প্রভৃতি সামরিক লক্ষ্যবস্তুর উপর নিবদ্ধ ছিল বলেই জানি। অসামরিক জনতার উপর দুটো একটা বোমা পড়ে থাকলে সেটা আকস্মিক। জনতা যেখানে মিশ্র সেখানে বিপদ অপেক্ষাকৃত কম।

রাষ্ট্রগঠনের সেকুলার ভিত্তি

দেশ যদি দুই ভাগে বিভক্ত না হতো তা হলে "সেকুলার স্টেট" এই কথাটি কারো মুখে শোনা যেত না! দেশ ভাগ হওয়ার আগে তো এটি শোনা যায়নি। ইংরেজ রাজত্বের সময়ও কি শাসনতন্ত্র ছিল না? কই, তার বেলা তো কেউ "সেকুলার" শব্দটির আবশ্যকতা অনুভব করেননি।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজকীয় ঘোষণাই ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরবর্তী ভারতশাসনের মূলনীতি। রাজশক্তি কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাত দেখাবে না, কোনো ধর্মের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করবে না, সকলের সঙ্গে সদ্‌ভাব রক্ষা করবে। তবে রাজার ও বড়ো বড়ো রাজপুরুষদের ধর্ম ছিল খ্রীস্টধর্ম। তাঁদের প্রয়োজনে ভারতবর্ষে ইংলণ্ডীয় চার্চের জন্যে একটা সরকারী বিভাগ ছিল। সেটার খরচ জোগাত ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান। এটুকু বাদ দিলে আর কোনো আপত্তির কারণ ছিল না। হিন্দু মুসলমানের মুখরক্ষার জন্যে পুলিশ লাইনে মসজিদ ও মন্দিরও থাকত দেখেছি। তার খরচ জোগাত সরকার। তার মানে প্রজাসাধারণ। প্রজাসাধারণের মধ্যে পার্শী, জৈন, বৌদ্ধ এরাও তো ছিল। এদের টাকা নিয়ে মন্দির মসজিদের খরচা জোগানো হতো। আপত্তির কারণ ছিল বইকি। তবে সেটা এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

এদেশের জনসাধারণ সম্প্রদায়নির্বিশেষে ধর্মপ্রাণ। একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান একজন ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে যেমন বোঝে তেমন একজন নাস্তিককে বা অজ্ঞেয়বাদীকে নয়। একবার আমার এক মুসলমান বন্ধু আমার ভুল শুধরে দিয়ে বলেন, "মিস্টার গান্ধী কেন বলছেন? বলুন মহাত্মা গান্ধী। বরাবরই তিনি একজন প্রেরণাময় নেতা। মিঃ জিন্না সে রকম নন।" অথচ এই বন্ধুই তখন থেকে পাকিস্তানের পক্ষে। ইসলামের উপর তাঁর গভীর অনুরাগ। তার থেকে এলো পাকিস্তানের প্রতি। তা বলে হিন্দুদের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল না। হিন্দু মুসলমানে সমভাব ছিল। তিনি একবার আমাকে বলেন, "গীতা যখন পড়বেন তখন আগে একটি শ্লোক সম্পূর্ণভাবে আত্মসাৎ করবেন, তারপরে আরেকটি শ্লোক, এমনি করে অগ্রসর হবেন।" ইনি নিজে চরকা কাটতেন, খাদি পরতেন, বেগমকেও বাধ্য করতেন। পরে পাকিস্তান থেকে আমাদের চমৎকার এক থান খদ্দর পাঠিয়ে দেন। প্রীতির দান।

ইংরেজ চলে গেলে কে রাজা হবে এই নিয়ে ঝগড়া করতে করতে হিন্দু মুসলমান দেশ ভেঙে দিল। এটা ঠিক ধর্মের লড়াই নয়। যদিও দেখলে সেই রকম মনে হয়। আসলে এটা রাজনীতির খেলা। এর পিছনে অর্থনীতিও ছিল। হিন্দু মহাজন বনাম মুসলমান খাতক। হিন্দু জমিদার বনাম মুসলমান প্রজা। হিন্দু হাকিম বনাম মুসলমান নাগরিক। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এসব বৈষম্য ধর্ম থেকে আসেনি। এসেছে ইংরেজী শিক্ষা বা ইংরেজ সরকারের জমিদারি বন্দোবস্ত বা সেই রকম কোনো সেকুলার কারণ থেকে। তা ছাড়া মহাজনি করাটা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ বলে হিন্দু মহাজনদের কোনো প্রতিযোগী ছিল না। প্রতিযোগিতায় যে যে ক্ষেত্রে হিন্দুরা সুযোগ পেয়েছে সে সে ক্ষেত্রে মুসলমানদের নিজেদের দিক থেকেও উদ্যোগের অভাব ঘটেছে। যেখানেই মুসলমানরা উদ্যোগী হয়েছে সেইখানেই তারা প্রতিযোগিতায় দাঁড়িয়েছে, সফল হয়েছে। চাষবাস ও ছোট বড় বিস্তর ব্যবসা মুসলমানদের উদ্যোগের সাক্ষ্য তখনো বহন করত, এখনো করে। বঙ্গের মুসলমানরা কারো চেয়ে কম ভাগ্যবান নয়।

দেশ অবিভক্ত থাকলে আমরা খুব সম্ভব মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-পত্রকেই অখণ্ড ভারতবর্ষের সংবিধানের ভিত্তিশিলা করতুম। এদেশ হতো সর্ব ধর্মের সমান অধিকারের ভিত্তিতে শাসিত। সকলের মত নিয়ে রাষ্ট্র হয়তো কোনো স্থলে মন্দির মসজিদের গির্জার ব্যয় বহন করত। তেমনি জৈন বৌদ্ধ শিখদের ধর্মস্থানের জন্যেও সকলের মত নিয়ে খরচপত্র করত। রাষ্ট্রের চরিত্র হতো ধর্মনির্বিশেষ নয়, সর্বধর্মীয়। যাঁদের আদর্শ সমন্বয় তাঁরা সুখী হতেন।

কিন্তু দেশ ভাগের পরে ও দেশ ভাগের দরুণ এখন যা হয়েছে তা আমাদের ভাগে ধর্মনির্বিশেষ। ইচ্ছা করলেই আমরা এটিকে ধর্মবিশিষ্ট করতে পারতুম। কিন্তু তা হলে ওপারের ইসলামী রাষ্ট্রের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সেটা হয়ে দাঁড়াত হিন্দু রাষ্ট্র। তাতে এপারের মুসলমানদের অসন্তোষ বাড়ত বই কমত না। সর্বত্র শিবমন্দির বা কালীমন্দির উঠত। তাতে অন্যান্য সম্প্রদায়ের হিন্দুদেরও অসন্তোষ জন্মাত। হিন্দুদের মধ্যেও আর্য-সমাজীদের মতো নিরাকারবাদী আছেন। ব্রাহ্মসমাজও তো নিরাকারবাদী। রাষ্ট্রের আনকূল্য না নিয়ে যদি কেউ মন্দির গড়ে তবে কেউ আপত্তি করবে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি গড়ে দেয় আপত্তি করবে। তখন যতগুলো শিবমন্দির

উঠত ততগুলো বিষ্ণুমন্দির উঠত, যতগুলো রামমন্দির ততগুলো কৃষ্ণমন্দির, যতগুলো কার্তিকপূজার মণ্ডপ। রাষ্ট্র কোনো মতেই সাম্য রক্ষা করতে পারত না। বৈষম্যের দরুন ভারত আবার খণ্ড খণ্ড হতো।

আমরা ধর্মের দ্বন্দ্ব এড়াবার জন্যেই "সেকুলার স্টেট" পত্তন করেছি। এই আমাদের মন্দির, এই আমাদের মসজিদ, এই আমাদের গুরুদ্বারা ও গির্জা। এর মধ্যে যদি ফাঁকি ঢোকে তা হলে আমরা যা গড়ছি তা ভেঙে পড়বে। তখন বিপদ। সবাইকে এ কাজে অন্তর থেকে হাত লাগাতে হবে।

কেন সেকুলার স্টেট

জীবনের কোনো অংশই কোনো অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটির অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। সেইজন্যে সাহিত্য আর অর্থনীতি আর বিজ্ঞান আর ধর্ম আর সমাজ আর রাজনীতি আর দেহতত্ত্ব আর মনস্তত্ত্ব কোনোটাকে কোনোটার থেকে বিচ্ছিন্ন করবার উপায় নেই। তা যদি করতে যাই তবে অঙ্গহানি হয়। পরিপূর্ণতার আদর্শের মধ্যে সবকিছুর স্থান আছে। যথাযোগ্য স্থান।

কিন্তু কথা হচ্ছে ব্যক্তির জীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শ কি সমষ্টির জীবনের পরিপূর্ণতার আদর্শ হবে? তা যদি মেনে নিই তা হলে সমষ্টিকে মানিয়ে নেবার দায়িত্ব কার? সমষ্টি যদি না মানে তা হলে তাকে মানাবার কোনো ন্যায়সঙ্গত বা আইনসঙ্গত বা যুক্তিসঙ্গত উপায় আছে কি? যেসব দেশে নানা মতবাদের লোক বাস করে সেসব দেশে সেকালের ঋষি বা প্রোফেটদের ধর্ম বা একালের মার্কস প্রভৃতি প্রবর্তকদের মতবাদ সমষ্টিগত সম্মতি কোনো যুগেই পায়নি। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ বা আত্মবাদের বিপরীত তত্ত্ব নিয়ে আরো কয়েকটি দর্শন অবতীর্ণ হয়েছিল। ছয়টি আস্তিক দর্শনের কথাই আমরা জানি, কিন্তু আরো ছয়টি নাস্তিক দর্শনও ছিল ও তাদের ধারা এখনো শুকিয়ে যায়নি। তেমনি খ্রীস্টধর্মের আদিকাল থেকে খ্রীস্টানের সঙ্গে খ্রীস্টানের তীব্র মতভেদ ঘটে আসছে। যে যাঁকে পারে পুড়িয়েছে। ইসলামের ইতিহাসও মুসলমানের সঙ্গে মুসলমানের ধর্মগত মতভেদে রক্তাক্ত। ইংরেজী "অ্যাসাসিন" কথাটা এসেছে ইসলামের এক সম্প্রদায়ের নাম থেকে। ওরা কত যে গুপ্ত হত্যা করেছে তার সংখ্যা নেই। ধর্মের সঙ্গে নরবলির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হিন্দুদের মধ্যেও ছিল। ইংরেজরা না এলে নরবলি এখনো সমানে চলত। এখনো দুটো একটা হয়। যারা করে তারা কালীভক্ত। ওটা তাদের ধর্মের অঙ্গ।

ইংরেজ অপসরণের পূর্বে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ নেতারা সকলেই স্বীকার করতেন যে ধর্মকে জাতীয় জীবনের মধ্যমণি করতে হবে। ধর্মহীন জীবন একটা জীবনই নয়। কিন্তু একে তো "ধর্ম" শব্দটার সংজ্ঞা নিয়ে প্রচণ্ড মতভেদ, তার উপর ধর্মের নামে ভোট সংগ্রহ করা সব চেয়ে সস্তা বলে অনেকেই ধর্মের ভেক ধরে নির্বাচনক্ষেত্রে আসর গরম করে তোলেন। তাদের মধ্যে সব চেয়ে

সফল বলতে হবে মুসলিম লীগকে। সে তার আপনার জন্যে একটা রাষ্ট্র আদায় করে নিল। তার মতো সফল যারা নয় তারাও আওয়াজ তুলল যে তাদেরও অমনি একটি ধর্মরাষ্ট্র চাই। তার নাম হিন্দুরাষ্ট্র। হিন্দুরাষ্ট্র হলে শিখরাষ্ট্রই বা হবে না কেন? তারপরে নাগাদের খ্রিস্টান রাষ্ট্র কী দোষ করল?

আমাদের মহান চিন্তানায়করা জানতেন না যে ধর্মকে জীবনের মধ্যমণি করতে গিয়ে স্বতন্ত্র নির্বাচক মণ্ডলী ও তারই জের টেনে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে। তেমনি করে ভারত বিভক্ত হবে। নয়তো যা হতো তার নাম গৃহযুদ্ধ। তাতে বিদেশীরাও হস্তক্ষেপ করত। সে যুদ্ধে জয়লাভ করা গান্ধী, নেহরু, পটেল প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী বা সাম্যবাদী বা সমাজতন্ত্রবাদীদের কারো সাধ্য ছিল না। গায়ের জোরে যে যতটা কেড়ে নিতে পারত সেই পর্যন্ত তার সীমানা। তার বাইরে মুসলিম লীগের বা তারই মতো স্বাতন্ত্র্যবাদী দলের আস্তানা। তাদের মধ্যে অকালী শিখ দলও পড়ে। ইংরেজ সৈন্য ও শাসক ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বিদায় নিলে দেশ কোনো মতেই একছত্রাধীনে আসতে পারে না এটা ধ্রুব। এই ধ্রুব সত্যের সঙ্গে সময় থাকতে আপস করলে আর কিছু না হোক দেশ মাত্র দুই ভাগ হয়। পঞ্চাশ ভাগ হয় না। পঞ্চাশ ভাগ হতো। হায়দরাবাদ, কাশ্মীর, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর কেউ কারো ক্ষমতা ছাড়ত না। ছেড়েছে বা ছাড়তে বাধ্য হয়েছে তার কারণ ইংরেজরা কেবলমাত্র দুটি রাজনৈতিক দলকেই তাদের উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তৃতীয় উত্তরাধিকারী স্বীকার করেনি।

এই যে ভারতীয় ইউনিয়ন এটি ইংরেজদের কাজ থেকে আপসে উত্তরাধিকারীসূত্রে হস্তান্তরিত। এর সংবিধান রচনার সময় যখন এলো তখন সব অঞ্চলের ও সব সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা একমত হয়ে এই স্থির করলেন যে এ রাষ্ট্র হবে সব ধর্মের লোকের ও যারা কোনো ধর্ম মানে না তাদের সকলের জাতীয় রাষ্ট্র, কারো সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র নয়। হিন্দুর একার নয়, মুসলমানের একার নয়, শিখের একার নয়, নাস্তিকের একার নয়, সকলের। তাই একে বলা হলো সেকুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র কোনো একটি ধর্মের সঙ্গে যুক্ত নয়। ধর্ম জিনিসটার সঙ্গেই যুক্ত নয়। অথচ ধর্মবিরোধীও নয়।

এই সিদ্ধান্ত যে ধার্মিকদের মনে লাগবে এটা তখন থেকেই আমরা জানি।

জীবনের পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের লবণ যে ধর্ম সেই লবণই যদি না থাকে তবে সব বিস্বাদ। কিছুই মুখে দেওয়া যায় না। এরকম একটা সিদ্ধান্ত কে চেয়েছিল? কবে চেয়েছিল? কিন্তু এ ছাড়া আর কোনো সিদ্ধান্ত সেদিন সম্ভব ছিল না। আজকের দিনেও সম্ভব নয়। এ বিষয়ে একটু দুর্বলতা দেখালে মাস্টার তারা সিং শিখিস্থান দাবী করবেন। নাগাদের বিদ্রোহ আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। কাশ্মীর তো হাতছাড়া হবেই।

সব ধর্মের লোক একমত হলে এ রাষ্ট্র ধর্মরাষ্ট্র হতে পারত, সেকুলার স্টেট হতো না। কিন্তু সেরূপ সিদ্ধান্ত অধিকাংশের ভোটে নেওয়া যায় না। গণতন্ত্রে অধিকাংশের ভোটই রীতি, কিন্তু ধর্মের বেলা ভাষার বেলা নয়। এ কথাটা হিন্দু ও হিন্দীওয়ালাদের সমঝানো শক্ত। মুসলমানরা তো অবুঝ। তার সাক্ষী পাকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্র।

ইসলামী রাষ্ট্র পত্তন করে বা পুনঃপ্রবর্তন করে আধ্যাত্মিক লাভ কতটুকু হয়েছে, জানিনে। রাজনৈতিক অনর্থ তার চেয়ে ঢের বেশী। হিন্দুদের বিতাড়ন করার পর আহমদিয়াদের পালা। তাদের নিপাত করার পর শিয়াদের পালা। এমনি করতে করতে একদিন সেনাপতির একনায়কত্ব ও রাজনীতিকদের অরণ্যবাস। পাকিস্তান 'ধর্ম' 'ধর্ম' করে এমন কিছু মহৎ দৃষ্টান্ত দেখায়নি যে আমরা সবাই ধর্মরাষ্ট্রের জন্যে ব্যাকুল হব। এই ব্যাকুলতাটা ঈশ্বরের জন্যে হলে অধ্যাত্মমার্গে অগ্রসর হওয়া নিশ্চিত। ঈশ্বরের জন্যে না হয়ে বিশেষ একটা ধর্মের জন্যে হলেও তবু কথা ছিল, কিন্তু বিশেষ একটা ধর্মের চেয়ে বড় হয়েছে তার দোহাই দিয়ে রাষ্ট্র ও তার আনুষঙ্গিক ক্ষমতা ও পৃষ্ঠপোষকতা। ধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে অধিকাংশের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার একটা ফন্দী। পাকিস্তানীরাও ক্রমে এটা বুঝছে। একদিন ওদের রাষ্ট্রও সেকুলার হবে। তা বলে ওরা ধর্মহীন হবে না।

রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলে মানুষ ধর্মহীন হবে, এটা ভ্রান্ত ধারণা। ধর্মহীনতার অন্ত অনেক কারণ আছে। আধুনিক যুগ রাষ্ট্রকে ধর্মের অচলায়তন থেকে উদ্ধার করে দেশ-বিদেশের মানুষকে মুক্তির স্বাদ দিয়েছে। কেউ কেউ স্বাধীনতাকে স্বেচ্ছাচারে পরিণত করেছে বলে স্বাধীনতা নিরর্থক হয়নি। স্বাধীনতাও একপ্রকার ধর্ম।

সমাজও সেকুলার হবে

সেদিন আমার এক ইংরেজ বন্ধু পূর্ব পাকিস্তানে ঘোরাঘুরি করে এসে বললেন, "ওখানকার মুসলমানদের মনোভাব যেমন সেকুলার এখানকার হিন্দুদের মনোভাব তেমন সেকুলার নয়। ভারত নামেই সেকুলার স্টেট। পাকিস্তান নামেই ইসলামিক স্টেট। নাম দেখব না কাম দেখব?"

আমি মেনে নিতে পারলুম না যে ভারত নামেই সেকুলার স্টেট। কিন্তু তর্ক করতে করতে একটা জায়গায় পৌঁছলুম যখন আমাকে মানতেই হলো যে আমাদের রাষ্ট্র সেকুলার হলেও আমাদের সমাজ সেকুলার নয়। তখন আমার বন্ধু আমাকে চেপে ধরলেন। বললেন, "সমাজ সেকুলার না হলে রাষ্ট্র সেকুলার হবে কী করে?"

কথাটা অযথা নয়। রবীন্দ্রনাথের বহু রচনায় রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। সামাজিক আচরণে যদি হিন্দু মুসলমান ভেদবুদ্ধি পরস্পরকে আঘাত করে, অপমান করে তা হলে রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি কোনো রকমে জোড়াতালি দিয়ে উপস্থিত কিছু কাজ হাসিল করলেও আখেরে ভেদবুদ্ধির কাছে পরাস্ত হবে।

হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীস্টান এক মায়ের সন্তান আমার কাছে এটা প্রত্যক্ষ সত্য। বার বার দাঙ্গা বাধলেও, বার বার পার্টিশন হলেও, লক্ষ লক্ষ মানুষ উচ্ছেদ হলেও এই প্রত্যক্ষ সত্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ সত্যই থাকবে। অসত্যে পরিণত হবে না। হয়তো সাময়িকভাবে অসত্যের জয় হবে। তার উপায় নেই। ভেদবুদ্ধির হাত থেকে উদ্ধার না পেলে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হয়, আপনার লোক পর হয়ে যায়। এর স্থায়ী প্রতিকার ভেদবুদ্ধিকে অতিক্রম করা। কে হিন্দু কে মুসলমান কে খ্রীস্টান কে শিখ মনে না আনা।

সামাজিক আচরণেও ভাই ভাই হতে হবে। আঘাত প্রত্যাঘাত ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমাদের সুদীর্ঘ ইতিহাসে কী না হয়েছে! অথচ যেখানে মুসলমানের সংখ্যা মুষ্টিমেয় সেখানেও হিন্দুর মন্দির ও মুসলমানের মসজিদ পাশাপাশি দেখা যায়। তেমনি যেখানে হিন্দুর সংখ্যা আঙুলে গোণা যায় সেখানেও মসজিদ ও মন্দির পাশাপাশি। হিন্দু সেবায়েৎ রসুলের কদম সযত্নে রক্ষা করছে, পীরের দরগায় চেরাগ দিচ্ছে এসব আমার স্বচক্ষে দেখা।

আর কালীভক্ত মুসলমান, কৃষ্ণভক্ত মুসলমানও বাংলা সাহিত্যে ও বাংলার জীবনে অনেক।

"রোটি আওর বেটি" নিয়ে কারো সঙ্গে কারো মিটমাট হয়নি। না মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর, না শূদ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মণের, না প্রজার সঙ্গে জমিদারের, না আশরাফের সঙ্গে আতরাপের। দেশকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত না করলে, আধুনিক শিল্পবাণিজ্যের দুরমুশ দিয়ে না পেটালে, হয়তো বিপ্লবের প্লাবনে না ভাসালে সামাজিক গোঁড়ামি সহজে যাবে না। তবে এটা একদিন যাবেই। সমাজও সেকুলার হবে।

খ্রীস্টানুসরণ

খ্রীস্টধর্মের প্রতি আমার একটা নাড়ির টান আছে। কারণ আমার নাড়ি কাটার সময় যিনি উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাদের রাজসরকারের লেডি ডাক্তার মিসেস অ্যাণ্ডারসন। ইনি রোজ আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে রাজবাড়ী যাওয়া আসা করতেন ও মাঝে মাঝে গাড়ী থামিয়ে আমাদের খোঁজ খবর নিতেন। এঁর স্বামীও কখনো কখনো আমাদের বাড়ী এসে বাবার সঙ্গে গল্প করতেন। আমরাও কখনো কখনো এঁদের বাংলায় গিয়ে তখনকার দিনে দুর্লভ কেক খেয়ে আসতুম।

এছাড়া ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী জন চৌধুরী। এঁদের বাড়ীর একটি ছেলেকে মনে আছে, তার নাম ললিত। আর একটু দূরে স্যামুয়েল মহাপাত্র। কিছুকাল আমাদের পোস্টমাস্টার ছিলেন সাইমন সাহু। আমার বাবা স্বয়ং নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব হলেও অন্যান্য ধর্ম সম্বন্ধে উদার ছিলেন। তাই আমাদের বাড়ীতে সব ধর্মের লোক সব সময় আসতেন যেতেন। বাবা একবার আমাকে বলেছিলেন, "এতগুলো জাত যদি এদেশে থাকতে পারে তবে ইংরেজরা কেন পারবে না? থাকুক না ওরা এদেশের লোক হয়ে। আর একটা জাত হিসাবে। ওদের যেতে বলছে কে? দেশ ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে না, রাজত্ব ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে।"

সর্ব ধর্ম সমন্বয় খুব বড়ো কথা। কিন্তু সর্ব ধর্মে আগ্রহ তেমন কিছু বড়ো কথা নয়। ছেলেবেলায় আমার এক কাকা আমাকে "যিশুখ্রীস্ট" উপহার দেন। আর এক কাকা আমাকে ব্যাপটিস্ট সম্প্রদায়ের গির্জায় নিয়ে যান। সেখানে আমরা উপাসনায় যোগ দিই, কমিউনিয়নের শরিক হই। বলতে গেলে খ্রীস্টের সঙ্গে একদেহ একপ্রাণ হয়ে যাই। এই কাকা পরীক্ষায় পাশ করে বাইবেল সোসাইটি থেকে একখানি 'হোলি বাইবেল' পেয়েছিলেন। বইখানি আমার কৌতূহল জাগিয়েছিল। কিন্তু ইংরেজীজ্ঞান তখন এতদূর ছিল না যে অর্থ বুঝি।

পরবর্তী বয়সে ইংরেজী সাহিত্যের ভিতর দিয়ে ইংরেজদের ধর্ম, ইউরোপীয় সাহিত্য ও ইতিহাস ও আর্টের ভিতর দিয়ে ইউরোপীয়দের ধর্ম আমার মর্মে প্রবেশ করে। তার সঙ্গে আমি একপ্রকার আত্মীয়তা অনুভব করি। তা

বলে আমি আমার ভারতীয় উত্তরাধিকার ভুলে যাইনে বা ত্যাগ করিনে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে আমি উপনিষদের মধ্যে আপনার ধর্ম খুঁজে পাই। সঙ্গে সঙ্গে সব ধর্মের থেকে সার সংগ্রহ করি। নিজের আত্মিক প্রয়োজনে। আমার স্বধর্ম বলতে এক কথায় কী বোঝায় তা এখনো স্থির হলো না। সাধারণ হিন্দুর সঙ্গে আমার মিলও আছে, অমিলও আছে। তেমনি সাধারণ খ্রীস্টানের সঙ্গে, মুসলমানের সঙ্গে, বৌদ্ধের সঙ্গে। প্রত্যেক ধর্মে আমি সত্যের মুখ দেখতে পাই, যেমন প্রত্যেক আর্টে সৌন্দর্যের মুখ। "এটা আপনার, ওটা পরের," এমন উক্তি যাদের মানায় তাদের মানায়, কিন্তু আমার মানায় না। সব ধর্মই কতক পরিমাণে আমার ধর্ম। হিন্দুধর্মের সবটাই যে আমার তাও নয়। দেবদেবীর পূজা আমি ছেলেবেলায় বিশ্বাসভরে করেছি। পরে তাতে অবিশ্বাস এসে যায়। তেমনি অবতারবাদ আমি পরবর্তী বয়সে বাদ দিই। গুরুবাদ পুরোহিতবাদ আমার কাছে পরিত্যক্ত হয়। জাতিভেদ আমি মানিনে। বিবাহের সময় ধর্মভেদও অতিক্রম করি। আমার সহধর্মিণী খ্রীস্টান কন্যা। বিয়ের পর যদিও পঁয়ত্রিশ বছর কেটে গেছে তবু আমরা কেউ কারো ধর্মে হাত দিইনি। তবে পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছি। ইচ্ছা থাকলেই উপায় থাকে।

খ্রীস্টের ধর্ম প্রেমধর্ম। তাঁর অনুজ্ঞা দুটি কথায় ব্যক্ত হয়েছে। ঈশ্বরকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে, সমস্ত মন দিয়ে, সমস্ত আত্মা দিয়ে ভালোবাসবে। আর প্রতিবেশীকে আপনার মতো ভালোবাসবে। প্রেমের দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই দেখিয়েছেন। সে দৃষ্টান্ত অনির্বাণ দীপশিখার মতো হাজার হাজার বছর ধরে জ্বলছে ও জ্বলতে থাকবে।

তারপর তাঁর অপর অনুজ্ঞা, ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ কর। আর সবই তোমার জুটে যাবে। ঈশ্বরের রাজ্য যেমন অন্তরে তেমনি বাইরে। এই পৃথিবীতেই সে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মানুষের উপরে যীশু বরাত দিয়ে গেছেন প্রেমরাজ্য স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নিয়ে আসতে। সকলেই যদি তাঁর মতো হতো তা হলে এই মর্ত্যই স্বর্গ হয়ে উঠত। সকলেই যদি তাঁর অনুসরণ করত তা হলে অন্তত খ্রীস্টীয় দেশগুলি এই দু'হাজার বছরে স্বর্গ হয়ে যেত। কিন্তু তেমন কিছু তো হয়নি। হবার সম্ভাবনা অবশ্য যায়নি। দু'হাজার বছরে যা সম্ভব হলো না পাঁচ হাজার বছরে হয়তো হবে। ইচ্ছা করলে এই শতাব্দীতেই হয়। যদি ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে অন্তঃপরিবর্তন ঘটে।

অন্তঃপরিবর্তন যে-কোনো দিন যে-কোনো লোকের ঘটতে পারে। এক একটা জাতির বা দেশেরও ঘটতে পারে। ঘটলে পরে দেখা যাবে যে প্রেমের পরশমণি লেগে সব কিছু সোনা হয়ে গেছে। আক্ষরিক অর্থে নয় অবশ্য। কন্‌ভারসন বলতে অন্তঃপরিবর্তনই বোঝায়, সেইসূত্রে জীবনের রূপান্তর। ব্যক্তিগত তথা সমষ্টিগত। সংখ্যাবৃদ্ধি বা শক্তিবৃদ্ধির জন্যে যে কন্‌ভারসন তাতে সংখ্যাও বাড়ে, শক্তিও বাড়ে, কিন্তু রূপান্তর ঘটে না। ভারতে বা ভারতের বাইরে ধর্মবিস্তার যতদূর সম্ভব ততদূর হয়েছে। আর হবে না। এখন থেকে খ্রীস্টানদের দৃষ্টি বহির্মুখী না হয়ে অন্তর্মুখী হোক। তাঁরা খ্রীস্টানুসরণ করে ঈশ্বরের রাজ্যকে আরো কাছে নিয়ে আসুন, যা দেখে আর সকলে তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে।

খ্রীস্টধর্মের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক পর্তুগীজ আগমনের বহুপূর্বে। শোনা যায় যীশুর সাক্ষাৎ শিষ্য সেণ্ট টমাস দক্ষিণ ভারতে এসে খ্রীস্টীয় উপাসনা প্রবর্তন করেন। অন্তত এটা তো ঠিক যে কেরলের খ্রীস্টীয় উপাসক মণ্ডলীর অবস্থিতি দেড় হাজার বছর ধরে। এদের সম্পর্ক ইউরোপের সঙ্গে নয়, সীরিয়ার সঙ্গে। আধুনিক যুগে ইউরোপ ও খ্রীস্টধর্ম এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে, লোকে খ্রীস্টানুসরণ বলতে বোঝে ইউরোপানুসরণ। এতে ভারতীয় খ্রীস্টানদের লাভ যত হয়েছে ক্ষতি তার চেয়ে কম নয়। ইউরোপ আমাদের তুলনায় দরিদ্র ছিল, এখন ধনবান হয়েছে। আমাদের তুলনায় দুর্বল ছিল, এখন বলবান হয়েছে। আমাদের তুলনায় অজ্ঞ ছিল, এখন জ্ঞানবান হয়েছে। এসব দেখে লোকে ইউরোপের অনুসরণ করতে চায়। সেটা কিন্তু খ্রীস্টানুসরণ নয়। ইউরোপের অনুসরণ একদিন শেষ হয়ে যাবে, তখন আরম্ভ হয়ে যাবে সোভিয়েট ইউনিয়নের অনুসরণ। তখন যারা ইউরোপবিমুখ তারা কি খ্রীস্টবিমুখ হবে না? সে আশঙ্কা খাস ইউরোপেই লক্ষিত হচ্ছে। কমিউনিজমের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করলে পূর্ব ইউরোপের মতো পশ্চিম ইউরোপও লাল হয়ে যেতে পারে। অথচ কমিউনিজমের উত্তর পরমাণু বোমা নয়, কন্‌স্‌ক্রিপশন নয়।

এদেশেই বরং কমিউনিজমের উত্তর দেবার একটি মহান প্রয়াস দেখা যায়। খ্রীস্টীয় প্রেরণা তার মূলে। অপ্রতিরোধ বা সাত্ত্বিক প্রতিরোধ খ্রীস্ট কেবল প্রচার করে ক্ষান্ত হননি, নিজের জীবনে ও নিজের মরণে প্রমাণ করেছেন। গান্ধীজীর পরিভাষায় এরই নাম সত্যাগ্রহ। তিনিও কেবল প্রচার করে ক্ষান্ত

থাকেননি, জীবনে ও মরণে প্রতিপন্ন করেছেন। খ্রীস্টের দৃষ্টান্ত ও বাণী গান্ধীজীকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর ঘরে একখানি মাত্র আলেখ্য দেখা যেত। সেখানি যীশুখ্রীস্টের। কথায় কথায় তিনি বাইবেল থেকে উদ্ধার করতেন। যদিও তাঁর আশ্রয়গ্রন্থ গীতা তবু বাইবেলের সঙ্গে সত্যাগ্রহ দর্শনের সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য আরো বেশী। টলস্টয়ের ব্যাখ্যা পড়ে তিনি অপ্রতিরোধ বা সাত্ত্বিক প্রতিরোধ তত্ত্বে বিশ্বাসী হন। পরে রাস্‌কিনের "Unto this Last" পড়ে নিজের জীবনযাপনের ধারা পরিবর্তন করেন। এ গ্রন্থের গান্ধীকৃত অনুবাদের নাম "সর্বোদয়"। সর্বোদয় আন্দোলন সত্যাগ্রহের দ্বিতীয় অধ্যায়রূপে গান্ধীশিষ্য বিনোবাজীর কল্যাণে ভারতব্যাপী হয়েছে। কিন্তু এর মূলেও খ্রীস্টীয় প্রেরণা। দীনতম জনেরও শ্রমে ও পারিশ্রমিকে সমান অধিকার আছে।

"I will give unto this last even as unto thee."

ভারতের মতো প্রাচীন ও বিরাট একটি ভূখণ্ড খ্রীস্টীয় প্রেরণায় খ্রীস্টান না হোক, সত্যাগ্রহী ও সর্বোদয়ী হতে পারে। বহুপরিমাণে হয়েছেও। এই যে হওয়া এটা বড়ো সামান্য কথা নয়। কই, আর কোনো ভূখণ্ড তো হয়নি। খ্রীস্ট তাঁর নিজের কাজ অপরের দ্বারা হচ্ছে দেখলে সানন্দে আশীর্বাদ করতেন। আমরা তাঁর প্রিয় কৃত্যই করছি।

খোলা মন ও খোলা দরজা

৩

ভাষা প্রসঙ্গে

আমি সংকল্প করেছি যে রাজনীতি নিয়ে লেখা আর নয়। এক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। এর উর্ধ্বে যদি না উঠতে পারি কোনো মহৎ কাজই আমার হাত দিয়ে হবে না। অবশ্য রাজনীতি বলতে এখানে বুঝতে হবে যা সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী নয়। একপ্রকার রাজনীতি আছে যা না থাকলে সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না। তার নাম চিন্তার স্বাধীনতা, বাক্যের স্বাধীনতা, বিশ্বাসের স্বাধীনতা, অপনার মতো করে বাঁচার স্বাধীনতা। যাকে বলে সিভিল লিবার্টি তা যদি কোনো দিন বিপন্ন হয় সাহিত্যও বিপন্ন হবে। তেমন দুর্দিন যদি আসে তা হলে আমি উদাসীন থাকব না।

তেমনি আর একপ্রকার রাজনীতি আছে যা মহাস্থবির বারট্রাণ্ড রাসেলকে জেলে নিয়ে গেছে। পরমাণবিক বোমায় মানুষের জীবন মানবজাতির জীবন বিপন্ন। তিনি এই বিপদের আসন্নতা সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করছেন, তাই সমস্ত সত্তা দিয়ে প্রতিরোধ করছেন। শুধু লেখা দিয়ে নয়। আমার কাছে এটা এখনো সত্য হয়নি, আমি বোমার মুখে বাস করছিনে এবং আমাদের দেশ পরমাণবিক বোমার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে এক হিসাবে রাসেলের কাজই করছে। ভারতবর্ষের মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিলে ভারতীয় সাহিত্যিককেও রাসেলের মতো সক্রিয় হতে হবে। তেমন অবস্থায় পড়লে আমাকেও রাজনীতি নিয়ে লিখতে হবে। কারণ এটাও সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী। মানুষই যদি না থাকল তবে সাহিত্য লিখবে কে? পড়বে কে?

আরো অনেক রকম রাজনীতি আছে। তার মধ্যে কোনোটি বুনিয়াদি, কোনোটি বুনিয়াদী নয়। দেশের লোক যদি জংলী বনে যায়, যে যার হাতে আইন কানুনের ভার নেয়, ধর্মের নামে বা ভাষার নামে হন্যে হয়ে ওঠে বা শ্রেণীসংঘর্ষে মাতে, তা হলেও সাহিত্যের গোড়া আলগা হয়ে যায়। যদি দক্ষিণ আফ্রিকার মতো বর্ণান্ধ হয়, যদি আইনকেও সেই বর্ণান্ধতার বাহন করে তা হলেও সাহিত্যের ভিত্তিমূল নড়ে। সাহিত্যিক তখন কার জন্যে কী সৃষ্টি করবে? সাহিত্যের দিক থেকে এগুলিও বুনিয়াদী।

আপনি আমার কাছে চেয়েছেন ভাষাসমস্যা নিয়ে লেখা। আমি তা নিয়ে বিস্তর লিখেছি। পুনরুক্তি সাহিত্যিকের ধর্ম নয়। কিন্তু আসল কথা হলো আমি বুঝতে পেরেছি যে ধর্মের মতো ভাষাও একপ্রকার রাজনীতি। অথচ

সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী রাজনীতি নয়। এ কথা ঠিক যে ভাষা না হলে সাহিত্য হয় না, আগে ভাষা তার পরে সাহিত্য। কিন্তু যা নিয়ে আমরা সকলে উত্তেজিত, যার জন্যে মাস্টার তারা সিং ত্রিশ দিনের উপর অনশন করছেন, তা সাহিত্যের দিক থেকে বুনিয়াদী নয়। বাংলা যখন সরকারী ভাষা ছিল না তখনো বাংলা সাহিত্য ছিল, যদি সরকারী ভাষা না হয় তা হলেও বাংলা সাহিত্য থাকবে। সরকারী ভাষা হওয়াটা জনসাধারণের পক্ষে দরকারী হতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকের দিক থেকে বুনিয়াদী নয়। সরকারী ভাষা হওয়ার সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দানাপানির প্রশ্নও। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টির দিক থেকে সরকারী ভাষার এমন কোনো সার্থকতা নেই যাকে বলা যেতে পারে বুনিয়াদী। বরং বিপরীতটাই সত্য বলে মনে হয়। এক কালে ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র ছিলুম, ইংরেজী ভাষায় সাহিত্যিক প্রবন্ধ লিখেছি। পরবর্তী কালে সরকারী চাকরিতে ঢুকে সরকারী ইংরেজী লিখেছি, সাহিত্যিক ইংরেজী ভুলেছি। হাত একবার নষ্ট হয়ে গেলে আর ফেরে না। এ দশা ঘটেছে বহু ইংরেজেরও। ইংরেজী যদিও তাদের মাতৃভাষা তবু সাহিত্যিক ইংরেজী ও সরকারী ইংরেজী বা সওদাগরি ইংরেজী এক নয়। একবার হাত খারাপ হলে আর ভালো হয় না। বাংলা যদিও সরকারী ভাষা বলে ঘোষিত হয়নি তবু গত দেড় শতাব্দী ধরে দ্বিতীয় সরকারী ভাষা বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। আদালতের ভাষা বলে মর্যাদাও পেয়ে এসেছে। ইংরেজ সিভিলিয়ান ইত্যাদিকে সেই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আমল থেকেই বাংলা শিখতে ও বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দিতে হতো। সরকার থেকে বিস্তর বাংলা পুস্তক পুস্তিকা প্রকাশিত হতো। বিজ্ঞপ্তি ও ঘোষণা প্রচারিত হতো। সরকারী ইংরেজীর মতো সরকারী বাংলা বলেও একটা পদার্থ ছিল। সে ভাষা এমন ভাষা যে তাতে একবার সিদ্ধহস্ত হলে আর আমাকে সাহিত্যিক হতে হতো না। সাহিত্যের হাত নষ্ট হয়ে যেত।

সারস্বত বংলা ও সরকারী বাংলা এক ভাষা হলেও একই জিনিস নয়। আমরা সাহিত্যসাধকরা রসের জন্যে সৌন্দর্যের জন্যে মানুষের মুখ থেকে কথা বেছে নিয়ে সাহিত্যের ভাষা গড়ি। আর ওঁরা সরকারী লোকরা বিষয়কর্মের জন্যে ইউটিলিটির জন্যে অভিধান থেকে আইনের বই থেকে শব্দ সংগ্রহ করে ভাষা গড়েন। এতদিন ইংরেজী ছিল বলে জোর কদমে হয়নি। এবার হিন্দীর সঙ্গে পা মিলিয়ে তড়িৎ গতিতে হবে। এতে নিরানন্দের কী আছে?

তবু আমি পুষ্পবৃষ্টি করতে পারছিনে। কারণ ইংরেজ আমলে সরকারী বাংলায় বাঙালী সাহিত্যিকদের দশটা পাঁচটা কলম পিষতে হয়নি। তাঁরা ইংরেজী ভাষায় দরকারী কাজ করে বাংলা ভাষায় সৃষ্টির কাজ করেছেন। এবার থেকে সরকারী বাংলার পেশাদার কলমচী হয়ে দরকারী কাজ করতে গিয়ে দেখবেন হাতটি খারাপ হয়ে গেছে। আর তা দিয়ে সৃষ্টির কাজ হচ্ছে না। যঃ পলায়তি স জীবতি। সারস্বত বাংলার জন্যে সরকারী বাংলা ও সরকারী বাংলো দুই ছাড়তে হবে। সে আর ক'জন পারবেন!

তা বলে আমি বাংলা ভাষার সরকারী মর্যাদাপ্রাপ্তির বিপক্ষে নই। স্বাধীন দেশে জনগণের ভাষাই সরকারী ভাষা হয়। ইংরেজরাও এটা মানত বলে বাংলাকে আংশিকভাবে সরকারী ভাষা করেছিল। জনগণের বেশীর ভাগ কাজই তো আদালতে। সেখানকার সরকারস্বীকৃত ভাষা ছিল বাংলা। এবার আমরা জনগণের ভাষাকে রাজ্যের যাবতীয় সরকারী কার্যের ভাষা করতে যাচ্ছি। এর পরের ধাপ রাষ্ট্রের কতক সরকারী কার্যের ভাষা করতে চাওয়া। তার পরের ধাপ প্রতিবেশী রাজ্যে যেসব বাঙালীর বাস তাঁদের উভয়সঙ্কটের সর্বসম্মত সমাধান আবিষ্কার করা। বোঝা যাচ্ছে এই শেষের ধাপটিই সব চেয়ে কঠিন। খবরের কাগজে গরম গরম প্রবন্ধ লিখে, আইন-সভায় গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে, তথাকথিত সত্যাগ্রহে নেমে গুলী খেয়ে একের ইচ্ছাকে অপরের উপর চাপিয়ে দেওয়া চলবে না। না, আমরণ অনশনেও কোনো ফল হবে না। একের ইচ্ছার সঙ্গে অপরের ইচ্ছার সামঞ্জস্যের সূত্র খুঁজে বার করতে হবে। আর নয় তো ভারতের বাইরে আর একটা পাকিস্তান রচনার জন্যে জান মাল কবুল করতে হবে। আশা করি তেমন দুর্বুদ্ধি কারো হবে না।

ভারতবর্ষ এমন একটি আইডিয়া যার তুলনা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। হেথায় আর্য হেথা অনার্য, হেথায় হিন্দু হেথা মুসলিম, হেথায় বাঙালী হেথা অসমীয়া এবং হেথায় হিন্দী হেথা ইংরেজী প্রাচীন ও আধুনিক বিভিন্ন ও বিরোধী ধাতু আছে ও থাকবে। সামঞ্জস্যের জন্যে কি কেউ জান মাল কবুল করবে না? কেন কাউকে বহিষ্কার করা হবে? কেন কেউ স্বেচ্ছায় বহিষ্কৃত হতে চাইবে? বহিষ্কার মানে ভারতবর্ষের ব্যর্থতা। আমি সার্থকতার স্বপ্নই দেখি। প্রেম যেদিন বলবান হবে সেদিন পাকিস্তানও সাড়া দেবে।

মাধ্যমের প্রশ্ন

আজকাল আমাদের স্কুলগুলোতে ইংরেজীশিক্ষকের অভাব। ছেলেদেরও ইংরেজীশিক্ষায় অরুচি। ফলে তারা এক ধার থেকে ফেল করে। কিংবা কলেজে গিয়ে হাবুডুবু খায়। তাদের দুর্দশা দেখে সহজেই এ কথা মনে আসে যে মাধ্যম যদি ইংরেজী না হয়ে মাতৃভাষা হয় তা হলেই তারা উদ্ধার পায়। একবার এ রকম একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হলে এর পক্ষে জোরালো ও জবরদস্ত যুক্তি খাড়া করা কঠিন নয়। ভোটের জোরে এ রকম একটা প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়াও দুরূহ নয়।

তা হলে আটকাচ্ছে কোথায়? প্রথমত আটকাচ্ছে এইখানে যে এরা কেউ কাব্যতীর্থ বা বিজ্ঞানবাচস্পতি উপাধি নিয়ে সন্তুষ্ট হবে না। এরা চাইবে বি. এ., বি. এসসি. এম. এ., এম. এস.সি. ডিগ্রী। এসব ডিগ্রীর একটা আন্তর্জাতিক মান ও মর্যাদা আছে। সেই মান সুরক্ষিত না হলে সেই মর্যাদাও থাকে না। সেই মান সুরক্ষিত হবে কি না এটা বিশেষজ্ঞরাই বলতে পারেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে। এর নিষ্পত্তি ভোটের জোরে হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত আটকাচ্ছে এইখানে। ভারতীয়মাত্রেরই অধিকার ভারতের সর্বত্র শিক্ষার সুযোগ লাভ। যারা ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তারা সর্বত্রচারী। যারা বাংলা বা অসমীয়া বা ওড়িয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তাদের দৌড় তত দূর নয়। তারা যদি স্বেচ্ছায় কোণঠাসা হয় তবে তাদের ভবিষ্যৎও কোণঠাসা হবে। অপর পক্ষে পশ্চিমবঙ্গে যেসব পাঞ্জাবী বা তামিল বা গুজরাতী ছাত্র আছে তারা দাবী করবে তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ। ভারতীয় সংবিধান অনুসারে তাদের দাবী অযথা নয়। এতদিন সবাইকে একসূত্রে গ্রথিত করার মতো একটা সূত্র ছিল। এখন এক এক কলেজে এক এক ভাষা হবে মাধ্যম। পরীক্ষারও মাধ্যম হবে এক আধ ডজন। হট্টগোল অনিবার্য।

তৃতীয়ত আটকাচ্ছে অদৃশ্য একটি জায়গায়। কলকাতার মতো সর্বভারতীয় নগরে যদি সাত আটটি মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া হয় ও তার ফলে যদি বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তবে লোকে একদিন অতিষ্ঠ হয়ে বলবে, "এর চেয়ে হিন্দী ভালো।" হিন্দীমাধ্যম কলেজগুলিতেই ছাত্রের ভিড় হবে। শেষে কেন্দ্রীয়

সরকার একটা হিন্দীমাধ্যম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করবেন। নিখিল ভারতীয় সংহতির ধুয়ো ধরে পার্লামেণ্ট তাঁদের সমর্থন করবেন। ইংরেজীর স্থান নেবে হিন্দী। অনেকের বিশ্বাস এতে সংহতিরই ক্ষতি হবে। সংহতির না হোক আধুনিকতার ক্ষতি হবে। হিন্দী এখনো আধুনিক চিন্তার বাহন হিসেবে দুর্বল।

জাতীয় সংহতি

স্বাধীনতার সংগ্রাম যতদিন চলছিল ততদিন আমরা আর কোনো দিকে দৃষ্টি দেবার সময় পাইনি। দিলে একাগ্রতা নষ্ট হতো। সংগ্রাম লক্ষ্যভ্রষ্ট হতো। যখনি যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তখনি তাকে স্থগিত রাখতে হয়েছে। কিংবা তার এমন একটা সমাধান খুঁজে বার করতে হয়েছে যার দ্বারা সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। এই যেমন গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলন।

স্বাধীনতার পরে এক এক করে পাওনাদার হাজির হচ্ছে। একজন পাওনাদার তো স্বাধীনতাপর্যন্ত সবুর করবে না। স্বাধীনতার আগেই তার পাওনা আদায় করে নেবে। ছলে বলে কৌশলে। বছর খানেক মারামারি করার পর এই স্থির হলো যে স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে তার পাকিস্তান দেওয়া হবে। দেরি করলে স্বাধীনতা মিলত, কিন্তু শান্তি মিলত না। গৃহযুদ্ধের ভিতর দিয়ে যেতে হতো। যুদ্ধমাত্রেরই পরিণাম অনিশ্চিত। গৃহযুদ্ধের পরিণাম সুনিশ্চিত নয় দেখেই নেতারা দেশ ভাগাভাগিতে রাজী হয়ে যান। তা হলে অন্তত কতক অংশ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব।

স্বাধীনতার পরে আরো এক ঝাঁক পাওনাদার এসে রাজ্য দাবী করে। বেশীদিন তাদের ঠেকিয়ে রাখা যায় না। তাই তেলেগুদের ঠাণ্ডা করার জন্যে অন্ধ্র, তামিলদের ঠাণ্ডা করার জন্যে মাদ্রাজ, কন্নাডিগদের ঠাণ্ডা করার জন্যে মৈশুর, মালয়ালীদের ঠাণ্ডা করার জন্যে কেরল ইত্যাদি রাজ্য গঠিত বা পুনর্গঠিত হয়। এতদিনে প্রায় সবাইকে সন্তুষ্ট করতে পারা গেছে, কেবল পাঞ্জাবী সুবার দাবীদারদের নয়। পাহাড়ী সুবার দাবীদারও জুটেছে দেখছি।

মনে করা গেছল এর পরে আর গোলমাল বাধবে না। কিন্তু মাদ্রাজ হঠাৎ একদিন তামিলকে তার সরকারী ভাষা বলে ঘোষণা করল। তার পর থেকে একে একে প্রত্যেকটি রাজ্যই একটি ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দিয়ে রাজ্যস্থিত অন্যান্য ভাষাকে উপেক্ষা করে আসছে। এই নিয়ে আসামে ঘোরতর হাঙ্গামা বেধে গেল।

তখন থেকেই জাতীয় সংহতির নামে হৈ চৈ শোনা যাচ্ছে। একটা চীনামাটির বাসনকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার পর জোড়া দেওয়া যেমন সংহতি এটাও তেমনি। ভাঙতেই বা বলেছিল কে? জুড়তেই বা কে

বলছে? এসব বিষয়ে আগে চিন্তা করা উচিত ছিল। কিন্তু ভাষাগত সংখ্যাগুরুদের দাপটে তা পারা যায়নি। একে তো তাদের হাতেই অধিকসংখ্যক ভোট। তার উপর তথাকথিত সত্যাগ্রহ নামক একটি অস্ত্র। একজন 'সত্যগ্রহী' তো অনশনেই মারা যান। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যায় রেললাইন ধ্বংস ইত্যাদি 'অহিংস' কার্যকলাপ। যার তালিম নেওয়া হয়েছিল ১৯৪২ সালের অগাস্ট মাসে।

এখন সংখ্যালঘুদের দিক থেকে ভাববার সময় এসেছে। তামিল যদি সরকারী ভাষা হয় তবে তার মানে দাঁড়ায় তেলেগুদের বাধ্য হয়ে তামিল শিখতে হবে, তামিল শিখে তামিলদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতে হবে, আর নয়তো মানে মানে মাদ্রাজ রাজ্য ত্যাগ করে অন্ধ্র প্রদেশে আশ্রয় নিতে হবে। বলা বাহুল্য সেখানে গিয়ে তারা চুপ করে বসে থাকবে না। কাঁদুনী গাইবে, প্ররোচনা দেবে, ঘরবাড়ী জ্বালাবে, তামিলদের ভাগাবে। এমনি করে লোকবিনিময় ঘটবে। একই ব্যাপার দেখা দেবে গুজরাতে ও মহারাষ্ট্রে, মহারাষ্ট্রে ও মৈশুরে, বিহারে ও পশ্চিম বঙ্গে। কোথাও এক জায়গায় দাঁড়ি না টানলে গুজরাত হবে মরাঠাশূন্য, মাদ্রাজ হবে তেলেগুশূন্য, অন্ধ্র প্রদেশ হবে তামিলশূন্য। এর নাম কি ভারত নামক এক নেশন? জাতীয়তাবাদের স্বরূপ কি এই? এই যদি হয় ভাবী ভারতের প্যাটার্ন তা হলে সৈন্যদলেও এর প্রতিফলন পড়বে। সৈন্যদল হবে স্বতোবিভক্ত ও দুর্বল। কেন্দ্রীয় সরকারকে পদে পদে ব্যালান্স করে পথ চলতে হবে। একটু এদিক ওদিক হলেই পদস্খলন। তার ফলে আরো একটা চীনামাটির বাসন পড়ে গিয়ে ভাঙবে। তার নাম ভারতীয় ইউনিয়ন।

সরকারী ভাষার পরের ধাপ শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজী মাধ্যম ইংরেজ থাকতেই যথেষ্ট সংকুচিত হয়েছিল। এই পনেরো বছরে আরো হয়েছে। স্কুলের পড়া সাধারণত মাতৃভাষার মাধ্যমেই হয়। কলেজের পড়াও বহু রাজ্যে মাতৃভাষার মাধ্যমে হতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু মাতৃভাষা বলতে বোঝায় সংখ্যাগুরুদের মাতৃভাষা। সংখ্যালঘুরা যেখানে দলে ভারী সেখানে তাদের নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত স্কুলও দেখা যায়। কিন্তু সে রকম কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় দুর্লভ। কারণ স্কুল চালাবার মতো ধনবল ও জনবল সংখ্যালঘুদের যদি বা থাকে বিশ্ববিদ্যালয় চালাবার মতো নেই। সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে ইংরেজী মাধ্যমই সুবিধের। কিন্তু সংখ্যাগুরুরা ইংরেজী

মাধ্যম বরদাস্ত করবার পাত্র নয়। সবাইকে জোর করে তাদের ভাষাতেই শিক্ষা দেওয়ার দিকে তাদের ঝোঁক। মাঝখান থেকে হিন্দী গিয়ে ঢুকে পড়ছে। তার বাসনা ইংরেজীর স্থান সে-ই নেবে। কিন্তু হিন্দীও তো মাতৃভাষা নয় সংখ্যালঘুদের। আইনে তাকে ভারত সরকারের সরকারী ভাষার মহিমা দেওয়া হয়েছে। সে বলে সে জাতীয় ভাষা।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রীর মুখে শোনা যাচ্ছে প্রত্যেক রাজ্যেই নাকি একটা করে ফেডারাল ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হবে। বলা বাহুল্য সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী। কিন্তু সংখ্যালঘুরা যদি বলে, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করা আমাদের জন্মগত অধিকার, সংবিধানেও এটা স্বীকৃত হয়েছে,হিন্দী আমাদের মাতৃভাষা নয়, আমরা আমাদের পাওনা এক পাউণ্ড মাংস চাই, যেমন চেয়েছে ও পেয়েছে সংখ্যাগুরুরা—তখন সেসব হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয় কার কোন্ কাজে লাগবে? মনে রাখতে হবে যে সংখ্যাগুরু হলেই একটা বিশেষ অধিকার জন্মায় না। আর সংখ্যলঘু হলেই ভারতীয় নাগরিকের সাধারণ অধিকার খর্ব হয় না। সব নাগরিকই ভারতীয় নাগরিক। সকলেই সমান অধিকারী। যথেষ্টসংখ্যক বাঙালী যদি বিহারে থাকে, তাদের নিয়ে একটা বিশ্ববিদ্যালয় যদি চলতে পারে তবে সেই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের ন্যায্য পাওনা ও তার মাধ্যম হবে বাংলা।

স্থানীয় বাঙালীদের এ দাবি যদি রাজ্য সরকার না মেটান, যদি কেন্দ্রীয় সরকার উপেক্ষা করেন তা হলে তারা পশ্চিমবঙ্গে এসে ভিড় করবেই। নয়তো হিন্দী সাহিত্যসম্মেলনের দেখাদেখি বঙ্গসাহিত্যসম্মেলনও দাবী করবে যে পার্লামেণ্টে আইন পাশ করিয়ে তাকে বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষা নেবার সনদ দেওয়া হোক, বি. এ., এম. এ. ইত্যাদি ডিগ্রী দেবার অধিকার দেওয়া হোক।

তখন হয়তো রব উঠবে, দেখ! দেখ! বাঙালীরা কেমন এক্স্‌ট্রাটেরিটোরিয়াল! কিন্তু হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনই বা এক্স্‌ট্রাটেরিটোরিয়াল নয় কেন? সংবিধানে হিন্দীকে অন্যতম আঞ্চলিক ভাষা বলেই তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যে কয়টি অনুচ্ছেদে তাকে সরকারী ভাষা করা হয়েছে সেই কয়টি নিতান্তই সরকারী কাজকর্ম সংক্রান্ত। শিক্ষা তার আমলে আসে না। সাহিত্যও না। হিন্দী সেই গণ্ডীর বাইরে আঞ্চলিক ভিন্ন আর কিছু নয়। হিন্দীর দাবী যতই সর্বগ্রাসী হবে নিছক আত্মরক্ষার খাতিরে মাতৃভাষার দাবীও ততই

নাছোড়বান্দা হবে। বিশেষ করে তামিলের ও বাংলার। বঙ্গসাহিত্যসম্মেলন সম্বন্ধে যা বলেছি তামিল সাহিত্যসম্মেলন বা সঙ্ঘম্ সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। বরং বেশী করেই খাটে। কারণ বাংলা হিন্দীর থেকে ততখানি দূরে নয় তামিল যতখানি। তামিল আর্যভাষাও নয়। কিন্তু বাংলাও যথেষ্ট দূরে। এর সাহিত্য অনেক বেশী আধুনিক। এ জগতে দেশই একমাত্র সত্য নয়। যুগও সত্য। হিন্দীর সঙ্গে বাংলার অন্তত আধ শতাব্দী ব্যবধান। যেমন জার্মানের সঙ্গে ফরাসীর। জার্মানদের সংখ্যা বেশী বলে যদি জার্মানকে করা হয় ইউরোপের সরকারী ভাষা তথা শিক্ষার মাধ্যম তা হলে ফরাসীরা মনের দিক থেকে বেশ কিছু দূর পেছিয়ে যাবে। ইউরোপের ঐক্য যেমন আবশ্যক প্রগতি তেমনি। একটার জন্যে আরেকটাকে বিসর্জন দেওয়া যায় না।

ইউরোপের সঙ্গে ভারতের তুলনা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। ইউরোপের ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, সুইটজারলণ্ড যেমন আমাদের বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসামও মোটামুটি তেমনি। ওরা যে কেন এক একটি নেশন হয়েছে, এরা যে কেন তা হয়নি, এর কারণ এরা এতদিন একছত্রাধীন ছিল, আর ওরা বহুদিন থেকেই বিভিন্ন ছত্রাধীন। মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর যদি ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হতো তা হলে এরাও এক একটি নেশন হয়ে উঠত। স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় শাসন যদি দুর্বল বা অপ্রিয় হয় তা হলে দেশ বহুভাগ হয়ে যেতে পারে। এক একটি রাজ্য এক একটি নেশন হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আমরা বহু সম্ভবপর নেশনকে একসূত্রে গেঁথে একটি মহাজাতি গঠনের ব্রত গ্রহণ করেছি। ব্রতসিদ্ধি আমাদের হবেই, যদি সংখ্যালঘুদের স্বার্থকে বলি না দিই। এই পশ্চিমবঙ্গে বহু নেপালী বাস করে, তারাও বাঙালীর সমান অধিকারী। বহু হিন্দীভাষী বাস করে, তারা বাঙালী না হলেও পশ্চিমবঙ্গীয়। ওড়িয়ার সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। তারাও ভোটদাতা, তারাও করদাতা, সরকার তাদেরও সরকার। কিন্তু তাদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সংখ্যাগুরুদের মাথাব্যথা কি দেখছেন? এই রকম সব ক'টি রাজ্যে। সংখ্যাগুরুর স্বার্থকে সংযত না করলে সংখ্যালঘু অশান্ত হবেই। সে অশান্তি রকমারি রূপ নেবে। তখন রব উঠবে, সংহতি গেল গেল!

যাঁহা মুশকিল তাঁহা আহসান।

সিঁদূরে মেঘ

অবশেষে এমন কথাও শুনতে হলো যে, দ্রাবিড়দের জন্যে দ্রাবিড়নাড বলে একটা স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম রাষ্ট্র চাই। তার মধ্যে থাকবে সিংহলেরও কতক অংশ।

হাসির কথা নয় কি? হাসতে চেষ্টা করছি। কিন্তু হাসি পাচ্ছে না। কারণ পনেরো বছর হাসাহাসি করার পর সামনে দেখি কান্নার নদী। রিভার অফ সরো। পাকিস্তান। সে নদী এখনো অতিক্রম করতে পারিনি।

হাঁ, বছর তিরিশ আগে কে একজন ছাত্র যখন ইংরেজী বর্ণমালার থেকে অক্ষর নিয়ে পাকিস্তান বলে একটি শব্দ বানায়, তখন হেসেছিলুম আমরা সবাই। মুসলমানরাও। ইকবাল মন থেকে স্বীকার করেননি, জিন্না ১৯৪০ সালেও উচ্চারণ করেননি, ১৯৪৬ সালে যখন "লড়কে লেঙ্গে" চলছে তখনো লীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলে দেখেছি সত্যি সত্যি কেউ অতখানি বিচ্ছেদ চান না, মুসলমান অফিসার বন্ধুরা তো ভাবতেই পারেন না। চাকা হঠাৎ ঘুরে যায় ১৯৪৭ সালের গোড়ায়। ততদিনে বোঝা গেছে ইংরেজের বিদায় আসন্ন। কে তার উত্তরাধিকারী হবে তা নিয়ে কংগ্রেস-লীগ একমত নয়। শাজাহান বাদশার পুত্রদের মধ্যে যেমন গৃহযুদ্ধ বেধেছিল তেমনি একটা গৃহযুদ্ধ বাধতে বাধ্য যদি না বানরকে দিয়ে পিঠে ভাগ করিয়ে নেওয়া হয়। পিঠে ভাগ যেই হয়ে গেল অমনি দিল্লীর জনতা হর্ষধ্বনি করে উঠল, "মহাত্মা মাউণ্টব্যাটেন কী জয়।" আসল মহাত্মা তখন অরণ্যে রোদন করছেন। গৃহযুদ্ধ রোধ করার শক্তি তাঁর ছিল না। ছিল একমাত্র ম্যাউণ্টব্যাটেনেরই।

অবশ্য পিঠের একটা উল্টো পিঠও ছিল। সেটা তখন কারো নজরে পড়েনি। শুরু হয়ে গেল পৃথিবীর ইতিহাসের বৃহত্তম গণপলায়ন, বিপুলতম নরহত্যা ও নারীহরণ, তিন সপ্তাহের মধ্যে। দিনে বিশ হাজার মানুষ মারা মহাযুদ্ধেও ঘটে কি না সন্দেহ। সম্প্রতি একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক এর জন্যে মাউণ্টব্যাটেনের অদূরদর্শিতাকে দায়ী করেছেন। কিন্তু করতেন তিনি কী? ক্ষমতা হস্তান্তর না করে সৈন্যসামন্ত নিয়ে চলে যেতেন? করলে কার হাতে স'পে দিয়ে যেতেন? কংগ্রেসের হাতে দিতে গেলে তৎক্ষণাৎ মুসলিম সৈন্যদল বিদ্রোহী হতো, লীগের হাতে দিতে গেলে তৎক্ষণাৎ শিখ ও

হিন্দু সৈন্যদল বিদ্রোহ করত। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আক্ষেপ করেছেন সে ইংরেজের উচিত ছিল আরো কয়েক বছর সবুর করা। ততদিনে লাগ কমজোরী হতো, কংগ্রেস জোরদার হতো।

মজা তো ওইখানেই। আরো কয়েক বছর সবুর করলে লীগ কমজোরী হতো, কংগ্রেস জোরদার হতো। এটা লীগের ভালো করেই জানা ছিল। বিশেষত জিন্না সাহেবের। তিনি বিলেতে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে এলেন। ইংরেজ কর্তারা বুঝলেন। অপসরণের দিন ফেললেন ১৯৪৭ সালের জুন মাস বা আরো আগে। বেচারা ওয়েভেলের চাকরিটি গেল। তিনি ছিলেন অখণ্ড ভারতের অকৃত্রিম বন্ধু। আমি তাঁকে অকারণে ভুল বুঝেছিলুম। তেমনি ভুল বুঝেছিলুম বহুসংখ্যক ইংরেজ সহকর্মীকে। তাঁরা চেয়েছিলেন কোয়ালিশন। পার্টিশন নয়। কোয়ালিশানের সম্ভাবনা যখন সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হলো তখন গৃহযুদ্ধের বিকল্প হিসাবে পার্টিশন ভিন্ন আর কোনো গতি রইল না। ইংরেজরা চেয়েছিল পার্টিশন এ কথা যদি কেউ বলেন, তবে তিনি অন্যায় করবেন। ইংরেজরা চেয়েছিল কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের কোয়ালিশন। ন্যাশনালিজমের সঙ্গে কাউণ্টার-ন্যাশনলিজমের সন্ধি-সমাস। তাহলে ব্যালান্স অফ পাওয়ার ইংরেজের হাতেই থেকে যেত। যদিও তাদের উপর শাসনভার থাকত না। তারা শাসনদায় থেকে মুক্ত হয়ে নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ত।

"নিউ স্টেটসম্যান" চিরকাল ভারতের স্বাধীনতার পক্ষপাতী। মনে আছে সেসময় "নিউ স্টেটসমান" গান্ধীজীর উপর কটাক্ষ করে, "এই সন্তের অভিসন্ধি আমরা আরো কিছুদিন ভারতবর্ষে থাকি। আমরা কিন্তু যত শীগগির পারি চলে আসতে চাই।" আসলে কেন্দ্রীয় সরকারের মাথার উপর ওয়েভেল থাকলেও সত্যিকার ক্ষমতা পটেল ও নেহরুর হাতে পড়েছিল, তাঁদের একমাত্র কণ্টক ছিলেন অর্থসচিব লিয়াকৎ আলী খান। লিয়াকতের বাজেটখানা ইতিহাসের বিস্ময়। সর্দারের দ্বিধা কেটে যায় বাজেটের চেহারা দেখে। যেমন অর্জুনের দ্বিধা কাটে বিশ্বরূপদর্শন করে। নিষ্কণ্টক হতে হলে পার্টিশন কবুল করতেই হবে, নতুবা গৃহযুদ্ধ বাধবে। সর্দারের সর্দারি এবার দেখা গেল জিন্নার হাতের তাস কেড়ে নিয়ে টেবিল ঘুরিয়ে দেওয়া। পার্টিশনে রাজী, কিন্তু বাংলা দেশ ও পাঞ্জাবকেও ভাগ করতে হবে। জিন্নাকে ঢেঁকি গেলানোর জন্যে মাউণ্টব্যাটেনকে বিলেত যেতে হয়, চার্চিলকে দিয়ে চিঠি

লেখাতে হয়। তা সত্ত্বেও জিন্না মুখ ফুটে সম্মতি দেননি। দিয়েছিলেন নীরবে মাথা নেড়ে। নিছক রাজনৈতিক বার্গেন হিসাবে ওটা তাঁর পক্ষে লাভজনক হয়নি। বিখ্যাত সংবাদিক কারাকা অভিনন্দন জানাতে গিয়ে দেখেন জিন্না মুখ হাঁড়ি করে বসে আছেন। যা বললেন তার থেকে মনে হতে পারে পার্টিশন তিনিও চাননি। তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল সমান সমান ক্ষমতার ভিত্তিতে কোয়ালিশন। এবং একমাত্র মুসলিম প্রতিষ্ঠান যে তাঁর পরিচালিত লীগ এই স্বীকৃতি। ভারতবর্ষকে অখণ্ড রাখার শর্ত ছিল এমন একটি ফরমুলা যার অর্থ এক একজন মুসলমান তিন তিনজন হিন্দুর সমান।

অমন একটা ফরমুলায় রাজী হলে বাজীকরের টুপীর ভিতর থেকে বেরিয়ে আসত একে একে আরো অনেকগুলি খরগোস। সমানসংখ্যক সৈন্যসামন্ত, সমানসংখ্যক পুলিস, সমানসংখ্যক সিভিল সার্ভিসের লোক, সমানসংখ্যক আইনসভার সদস্য, সমানসংখ্যক মন্ত্রী, সমান ওজনের দপ্তর। কোনো সিদ্ধান্তই অধিকাংশের ভোটে গ্রহণ করা চলত না। সমানসংখ্যক ভোটের দরুন নিত্য অচল অবস্থার উদ্ভব হতো। দরকার হতো কাস্টিং ভোট। দিতেন ইংরেজ বড়লাট বা লাট। প্রধান সেনাপতি হিন্দু হলে চলত না, হতেন একজন ইংরেজ। আসল ক্ষমতা রয়ে যেত ইংরেজের হাতে। পটেল ও নেহরু কেনই বা তাতে রাজী হতেন, যখন আসল ক্ষমতার বারো আনাই চলে এসেছে তাঁদের হাতে? ওরকম একটা কোয়ালিশন ধোপে টিকত না। একদিন না একদিন ভেঙে পড়তই। তখন সেই পার্টিশনই হতো, কিন্তু তার আগে কংগ্রেসকে ও অন্যান্য মুসলিম দলগুলিকে আরো দুর্বল করা হতো। লীগ হতো আরো সবল। স্বাধীনতার জন্যে লড়ত কারা, যাদের লড়ার কথা তারাই যদি অবল হলো? দুর্বল কাঁধ দেখলে ইংরেজও কি চেপে বসতে চাইত না? অত সহজে বিদায় নিত? ইংরেজ বিদায় নিয়েছে স্বেচ্ছায়, সেকথা ঠিক। কিন্তু বিদায় নিয়েছে আসল ক্ষমতা হাতছাড়া হয়েছে দেখে। কংগ্রেস নেতারা পদত্যাগ করলে বা পদচ্যুত হলে ১৯৪৭ সালে বিপ্লব ঘটত। তাতে সৈন্যদলও যোগ দিত। ভারতের স্বাধীনতা দয়ার দান নয়। বারুদ জমেছিল। যে বারুদ দিয়ে বিপ্লব ঘটানো যেতো সেই বারুদটাই লক্ষভ্রষ্ট হয়ে সম্প্রদায়িক লঙ্কাকাণ্ড ঘটায়।

কিন্তু কেন সাম্প্রদায়িক লঙ্কাকাণ্ড? কেন শ্রেণীগত লঙ্কাকাণ্ড নয়? কেন অন্যরকম লঙ্কাকাণ্ড নয়? এর উত্তর সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকেই দেশে

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি একটু একটু করে বলসঞ্চয় করছিল। ন্যাশনালিজম নামক একটি শক্তি যখন জার্মানীকে একাকার ও ইটালীকে স্বাধীন তথা একাকার করে তখন ভারতবর্ষেও তার সঞ্চারণ ঘটে। এর একটা বিরোধী শক্তির প্রয়োজন হয়। সেটা কাউন্টার-ন্যাশনালিজম। বা কমিউনালিজম। এটা শুধু মুসলমানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। এর বিস্তার ঘটে পাঞ্জাবের শিখদের মধ্যেও, দক্ষিণ ভারতের অব্রাহ্মণদের মধ্যেও, পরে দেখা গেল সারা ভারতে এক শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যেও। গান্ধীজী সতর্ক ও তৎপর না হলে অস্পৃশ্যদের মধ্যেও ঘটত। আম্বেদকার তো সেই তালেই ছিলেন। এতগুলো জাতীয়তাবিরোধী স্রোত যেদেশে সক্রিয় সেদেশে জাতীয়তাবাদ একা কতদূর যাবে? ক'টাকে পরাস্ত করবে? হয়তো আরো কয়েক বছর সময় পেলে পারত। কিন্তু জিন্না সময় দিলেন না, ইংরেজ কর্তারা সময় দিলেন না।

জিন্নাকে একটি ব্যক্তি না ভেবে একটি শক্তি ভাবতে হবে, নইলে অত বড় একটা বিপর্যয়ের তাৎপর্য বোধগম্য হবে না। যে শক্তির সঙ্গে তিনি আপনাকে একাত্ম করেছিলেন তার প্রকৃত নাম কাউন্টার-ন্যাশন্যালিজম এবং তার লৌকিক রূপ মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা। ইংরেজ রাজা হবার আগে মুঘল রাজবংশ ভারতের অধিকাংশের উপর প্রভুত্ব করতো, সেই সূত্রে ভারতের সিংহাসনের উপর স্বাতন্ত্র্যবাদী মুসলমানদের মনে মনে একটা দাবী ছিল। সংখ্যালঘু বলে দিল্লির সিংহাসন পুনরধিকার করা তাঁদের পক্ষে সহজ ছিল না, কিন্তু সংখ্যাগুরু বলে কলকাতা, লাহোর, করাচী প্রভৃতির মসনদ দখল করা সম্ভব ছিল। পিছনে ইংরেজ থাকলে তো কথাই নেই। ইংরেজকে তাঁরা শত্রু করেননি, বরং ইংরেজের সঙ্গে কংগ্রেসের শত্রুতার দিনে নিষ্ক্রিয় থেকে পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছেন। ইংরেজ তো তার মিত্রকে ভুলতে পারে না।

এতদূর পর্যন্ত যা বলা গেল তা ক্ষমতার রাজনীতির পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর যা করেন নি এঁরা তাই করলেন। ধর্মকে ব্যবহার করলেন রাজনীতির সেবায়। খান আবদুল গফর খানের মতো ধার্মিক মুসলমান যা করেননি এঁরা তাই করলেন। রাজনীতির ময়দানে তুললেন ধর্মের ধ্বজা। সাধারণ মুসলমানকে বোঝানো হলো এঁদের জয় হচ্ছে ইসলামের জয়। নতুবা ইসলাম বিপন্ন। দুনিয়ায় এমন দৃশ্য কমই দেখা গেছে যে, সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ইসলামধর্মী জনগণ একই দলের পিছনে ও পাশে দাঁড়িয়েছে। মিশর বা ইন্দোনেশিয়ায় বা আলজেরিয়ায় এর অনুরূপ

দৃশ্য দেখা যায়নি। এই সার্কাসের মতো ব্যাপার ভারতবর্ষে সম্ভব হলো কী করে? হলো এইজন্যে যে ধর্ম নিয়ে একটা ভুল বোঝাবুঝি সাত শ' বছর ধরে বোঝাপাড়ার অপেক্ষায় ছিল। এখনো কি বোঝাপড়া হয়েছে? "ঈশ্বর আল্লাহ্ তেরে নাম" বা "ভজ মন রাম রহিম" বললেই কি হয়? নানক কবীর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক সাধকের জীবনেই সে বোঝাপড়া সত্য হয়েছে। সাধারণের সম্বন্ধে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, তারা পরস্পরসহিষ্ণু।

সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে। একমাত্র আশা রাজনীতির খেলায় ধর্মকে ঘুঁটি করা ইতিহাসের পরবর্তী অধ্যায়ে বাতিল হয়ে যাবে, জনগণও ধর্মের বিভেদকে নেশনভেদ বলে ভাবতে কুণ্ঠিত হবে। ইতিমধ্যে সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরুঘটিত রেষারেষির পরিণামটাও সকলের উপলব্ধি হোক। এখনো হয়নি। পাকিস্তানেও হয়নি, ভারতেও হয়নি। আরো দুঃখ আছে কপালে।

ক্ষমতা হস্তান্তর করে ইংরেজ যেসময় চলে যেতে উদ্যত সেসময় দক্ষিণের এক দ্রাবিড় নেতা বললেন, "ও কী! আর্যদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে যাচ্ছ যে!" এ ঘটনার পর পনেরো বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে দক্ষিণের দ্রাবিড় আন্দোলন আরো জোর হয়েছে। রব উঠেছে দ্রাবিড়দের জন্যে দ্রাবিড় নাড চাই। গত সাধারণ নির্বাচনে দ্রাবিড় মুন্নেত্র কাজাঘম এই রব তুলে মাদ্রাজ আইনসভায় দ্বিতীয় বৃহত্তম দলের মর্যাদা লাভ করেছে। পার্লামেন্টও মাদ্রাজের জন্যে নির্দিষ্ট আসনের বড় একটা অংশ তার ভাগে জুটেছে। এই তো সেদিন সে একটা উপনির্বাচন জিতল। ইতিমধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামেও নেমেছে। নেতাদের সাজা হয়েছে। কিন্তু সাজা হওয়া তো এদেশে রাজা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন। কে জানে পরের বারের সাধারণ নির্বাচনে এটা তাদের রাজটিকা হবে কিনা! যদি হয় তাহলে ভাবনার কারণ হবে। অপোজিশন বলবান হলে গবর্নমেণ্ট চালানো কঠিন। বিশেষত সেই অপোজিশন যদি কথায় কথায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। তারপর সে যদি নির্বাচনে অধিকতর সংখ্যক আসন লাভ করে তাহলে গবর্নমেণ্ট চালানোর অধিকার তারই। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বনিবনা যদি না হয় তবে তাকে ডিসমিস করা খুব সুখের হবে না। শেষে এমন দিন আসবে যেদিন তাকেই ডাকতে হবে তারই শর্তে শাসনের কাজ চালাতে। আর সেও সুযোগ বুঝে পেশ করবে তার চরম দাবী। দ্রাবিড় নাড।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরায়। এটাকে হালকা করে দেখলে

ভুল হবে। আমাদের শান্তিনিকেতনের এক চিত্রকর বছর দুই আগে মাদ্রাজ রাজ্য ঘুরে এসে আমাকে যা বলেছিলেন তা উদ্বেগজনক। দেখলেন লোকের মনোভাব তাঁর উপর বিরূপ। যেহেতু তিনি উত্তর ভারতীয়। তিনি বললেন, তিনি উত্তর ভারতীয় নন, তিনি পূর্ব ভারতীয়, তিনি বাঙালী। তখন মনোভাব বদলায়। তারপর ভাষা নিয়ে সমস্যা। ইংরেজী ওরা বোঝে, কিন্তু না বোঝার ভাণ করে। হিন্দীতে বলতে গেলে একদম বধির। বলতে হবে তামিল ভাষায়। কিন্তু আমাদের চিত্রকর বন্ধু তামিল জানেন না। তাঁকে আশ্রয় নিতে হলো কখনো সংস্কৃতের, কখনো মুদ্রার। মাছ কিনতে গিয়ে বল্লেন, "মীন।" ভাগ্যিস ওটা তামিল ভাষায় জলচল হয়ে গেছে। নইলে সংস্কৃতেও দ্রাবিড়দের আপত্তি। আর মাংস কেনার সময় অভিনয় করে দেখাতে হলো কেমন করে পাঁঠা কাটে। এর পরে বোধহয় তামিল শব্দপুস্তক হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। মোট কথা হিন্দী বা ইংরাজী ও রাজ্যে চলবে না। ওরা মনে মনে স্বতন্ত্র হয়ে বসে আছে। সম্প্রতি পড়লুম উত্তর ভারতীয়দের উপর একচোট মার হয়ে গেল। রামায়ণ, সংবিধান ইত্যাদি আগেই পোড়ানো হয়েছিল, এবার পুড়ল মনুস্মৃতি।

আরো পড়লুম, রামায়ণ নতুন করে লেখা হচ্ছে। রাবণ নাকি দ্রাবিড়দের বীর। তিনি আর্য আক্রমণ প্রতিহত করতে গিয়ে প্রাণ দেন। পাঠ্যপুস্তকগুলো নাকি দ্রাবিড়-ভাবে ভরপুর। তামিলরা নিজেদের ভাষায় নিজেদের খুশিমতো লিখছে, পড়াচ্ছে, পড়ছে। দৃষ্টিকোণটা স্বাতন্ত্র্যসূচক। পাকিস্তানের পূর্বলক্ষণ ছিল—"আমরা আগে মুসলমান, তারপর ভারতীয়।" দ্রাবিড়-নাডেরও পূর্বলক্ষণ সেইরূপ—"আমরা আগে দ্রাবিড় বা তামিল, তারপরে ভারতীয়।" কার্যকালে "ভারতীয়"টা পরিত্যক্ত হবে। হয়তো বছর তিরিশ বাদে।

আমরা ছেলেবেলা থেকেই আর্যদের গৌরবগাথা শুনে আসছি। অনার্যদের হীন ভেবে আসছি। কেমন, সত্য কি না? কিন্তু অনার্যরা তো ভারতবর্ষ থেকে বিলুপ্ত হয়নি। তারা অন্য নামে বিদ্যমান। ওই দ্রাবিড়রাই অনার্য। ওরা শুধু অনার্য নয়, ওরা প্রাগ্-আর্য। ওরাই আর্যদের পূর্বে রাজত্ব করত। আর্যরা ওদের হটাতে হটাতে দক্ষিণে নিয়ে যায়, সেখানে কোণঠাসা করে। তাসত্ত্বেও তাদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে পারেনি। তাদের হাতে তিনটি বড় বড় স্বাধীন রাজ্য ছিল। উত্তর ভারতের কোনো সাম্রাজ্যই তাদের গ্রাস

করতে পারেনি। কিন্তু ক্ষত্রিয়রা যেখানে ব্যর্থ হয়েছে ব্রাহ্মণরা সেখানে সফল হয়েছে। উত্তর ভারতের আর্য সংস্কৃতি ও ধর্ম সেখানে অনুপ্রবেশ করেছে। দ্রাবিড়দের রাজ্যে ব্রাহ্মণরা গিয়ে বসতি করেছে, কিন্তু ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে। তার জন্যে কঠিন কঠিন সব নিয়ম করেছে। সে-সব নিয়ম দ্রাবিড়দের পক্ষে অবমাননাকর। স্বর্গের বা জন্মান্তরের মোহে তারা এতকাল সহ্য করে এসেছে, কিন্তু এখন আর সহ্য করতে রাজী নয়। মাদ্রাজের ব্রাহ্মণ হোটেলে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ দ্রাবিড়দের আজকাল ঢুকতে দেয় কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা টেবিল। কাজেই ব্রাহ্মণের সঙ্গে বসে খেতে হয় না।

অব্রাহ্মণ অর্থাৎ দ্রাবিড় বলেছি। গোড়াতে ওটা ছিল অব্রাহ্মণদের "আত্মসম্মান" আন্দোলন। তখনো দ্রাবিড় চেতনা জাগেনি। কিন্তু "অব্রাহ্মণ" বলে আত্মপরিচয় দিলেও তো ব্রাহ্মণকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তাই একদিন "আদিদ্রাবিড়" আন্দোলন দেখা দেয়। অব্রাহ্মণরা সকলেই দ্রাবিড়, দ্রাবিড়রা সকলেই অব্রাহ্মণ, কাজেই একই উদ্দেশ্য সাধিত হলো। এতদিনে সেই স্রোতেরই একটি শাখা দ্রাবিড়কে নিবিড় করে আঁকড়ে ধরেছে। সংস্কৃত শব্দে তামিল ভাষা ভরা। এটা ওদের কানে বাজে। সংস্কৃত বাদ দিতে চেষ্টা চলছে। তেমনি সংস্কৃতির ভিতর থেকে আর্য উপাদান। হিন্দী তো তামিলের তুলনায় শিশু। তাও সংস্কৃতের দ্বারা আচ্ছন্ন। আর্যাবর্তেই তার জন্ম। আর্য্য উপাদানে গড়া তার অঙ্গ। হিন্দীর প্রভাব পড়লে তামিলের স্বভাব নষ্ট হবে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে দেখা যায়, দিল্লির শাসন কোনোকালেই অতি দক্ষিণে পৌঁছয়নি ব্রিটিশ আমলের আগে। যোগসূত্রটা বরাবরই ছিল সংস্কৃতিগত। ধর্মগত। সে ক্ষেত্রেও আবহমানকাল একটা ব্যবধান ছিল আর্যের সঙ্গে দ্রাবিড়ের। সেটা ধর্ম ও সংস্কৃতির সেতুবন্ধন সত্ত্বেও গভীর ছিল। রক্তের মিশ্রণ তেমন হয়নি, যেমন হয়েছিল উত্তরাপথে। ভাষার মিশ্রণও তেমন হয়নি। দ্রাবিড় ভাষাগুলি অন্য এক বংশের। তাদের দিক থেকে ইংরেজী যতখানি দূর হিন্দী ততখানি। ইংরেজীকে যদি তারা হটায় তাহলে নিশ্চয় হিন্দীকে অভিষেক করার জন্যে নয়। সংস্কৃতকে তো নয়ই। সিংহাসনটা তামিলের জন্যেই সংরক্ষিত। তামিল শুধু একটি আঞ্চলিক ভাষা হয়েই ক্ষান্ত হবে না। সিংহলেও তার প্রচলন আছে। তার অতীত সম্পদ ও আধুনিক বিকাশ হিন্দীর তুলনায় ক্ষীণ নয়।

তারপর ভারতের রাজধানী দক্ষিণ থেকে বড় বেশী দূরে। দ্বিতীয়ত সেটা একান্তই উত্তরে। দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে উত্তর মেরুর যেমন বৈপরীত্য মাদ্রাজের সঙ্গে দিল্লিরও তেমনি। কলকাতা বা বম্বে বা নাগপুর হলে "নিউট্রাল" হতো। ভবিষ্যতে দ্বিতীয় রাজধানীর কথা চিন্তা করতে হবে। এর সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। দিল্লীর একটা ঐতিহাসিক মহিমা আছে, কিন্তু দক্ষিণ সে মহিমার শরিক নয়। রামায়ণ মহাভারতেও দক্ষিণকে ইন্দ্রপ্রস্থের বা অযোধ্যার মহিমার অংশীদার করা হয়নি। দক্ষিণ যদি মনে করে যে সে উত্তর ভারতের একটি উপনিবেশ মাত্র, তাহলে তার মনে পুর্ব পাকিস্তানের মতো অভিমান জন্মাবেই। এর থেকে একদিন উঠবে কাশ্মীরের মতো আংশিক স্বাতন্ত্র্যের দাবী।

কিন্তু এটাও লক্ষণীয় যে তামিলদের সঙ্গে তেলেগুদের বনে না, কন্নাড়িগদের বনে না, মালয়ালিদেরও যে খুব একটা বনে তা নয়। দক্ষিণ ভারতের চারটি দ্রাবিড় রাজ্যের সমবায় কোনো দিন হবার নয়। "হিন্দীর সঙ্গে বাংলার যতখানি তফাৎ তামিলের সঙ্গে তেলেগুর তফাৎ তার চেয়েও বেশী" বলেছিলেন আমাকে ডক্টর গোপাল রেড্ডি, এখন যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী। সুতরাং তামিলনাড থেকে দ্রাবিড়নাড হওয়া সুদূরপরাহত। কিন্তু সমস্যাটা তা বলে লঘু হয়ে যায় না। সিংহল কতটুকু দেশ! সেও তো স্বাধীন। তামিলনাড কি তার তুলনায় বড় নয়? একবার স্বাতন্ত্র্যের হাওয়া গায়ে লাগলে মানুষ আকার আয়তন বিবেচনা করে দেখে না। সাইপ্রাস কতটুকু দেশ! জ্যামেকা কতটুকু!

অনেকের ধারণা, আরো গোটা কতক কারখানা খুলে দিলেই তামিলদের মন পাওয়া যাবে। অসম্ভব নয়। মানুষের মন তো তার পকেটে। কিন্তু স্মরণাতীত কাল হতে ঐতিহাসিক ভুল বোঝাবুঝি যদি থাকে, বিজেতা ও বিজিত বোধ যদি থাকে তবে তাকে দূর করাই চাই। আর্য ও দ্রাবিড় সম্বন্ধে আগেকার দিনে যা লেখা হয়েছে তার সংশোধন দরকার। দ্রাবিড়রা যে সভ্য ছিল, কতক বিষয়ে সভ্যতর ছিল, ভারতীয় সভ্যতায় তাদের দান যে সুবৃহৎ, বহু বিষয়ে বৃহত্তর, এটা স্বীকার করতে হবে। তামিলচর্চাকেও সংস্কৃতচর্চার মতো মর্যাদা ও মূল্য দিতে হবে। হিন্দীর সর্বভারতীয় দাবী খাটো করতে হবে। যেটা নিয়ে মনোমালিন্য তীব্র হলো সেই ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের ভেদটাকেও মুছে ফেলা চাই। দক্ষিণ ভারত তো দক্ষিণ আফ্রিকা

নয় যে সেখানে "আপার্টহাইড" বজায় থাকবে। সমাজে ব্রাহ্মণশূদ্রের সমান মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। শুধু তাই নয়, অসবর্ণ বিবাহের দ্বারা অভেদের অভিমুখে যাত্রা করতে হবে।

দ্রাবিড়নাড আন্দোলনে ব্রাহ্মণদের অনেকে যোগ দিয়েছেন। যাঁরা যোগ দেননি তাঁদেরও কারো কারো সহানুভূতি আছে। তাঁদের সকলের মিলনভূমি হলো ভাষা। তামিল ভাষা। সেই ভূমিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করলে সে লড়াই অনেক দূর গড়ায়। রাজ্যসুদ্ধ লোককে তার মধ্যে টেনে আনা যায়। হিন্দী ভাষান্ধতার সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়ে চলতে পারে তামিল ভাষান্ধতা। সন্ধির চেষ্টা নিশ্চয়ই হবে, কিন্তু সন্ধিসূত্র যদি হয় উত্তর ভারতের কয়েকটি কলেজে বা স্কুলে নমো নমো করে তামিল শেখানো তাহলে ভবী তাতে ভুলছে না। সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতার মাধ্যম যদি হয় হিন্দী ভবীর তাতে ক্ষতি। ভারতের সরকারী ভাষা যদি হয় একমাত্র হিন্দী ভবীর তাতে অসুবিধা। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার ও পরীক্ষার একমাত্র মাধ্যম যদি হয় হিন্দী ভবীর তাতেও আপত্তি। অগত্যা সন্ধির সূত্র হবে ইংরেজীকে অনির্দিষ্টকাল রাখা। এই তিক্ত ভেষজটি হিন্দীপ্রেমিদের গলাধঃকরণ করতে হবে।

সময়ে সন্ধি না করলে ও সন্ধির সূত্র গ্রহণযোগ্য না হলে কাউন্টার-ন্যাশন্যালিজম এবার তামিল ভাষান্ধতার সুযোগ নিয়ে দ্রাবিড়নাডের জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করবে। অশুভ সম্ভাবনা, কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। অবাক হচ্ছি শুনে যে এর সূচনা নাকি ১৯৪৫ সাল থেকে। বোধহয় জিন্না সাহেবের দ্বিজাতিতত্ত্বের পিঠোপিঠি। মাদ্রাজের কংগ্রেসের উপরেও পরোক্ষভাবে এর প্রভাব পড়েছে। ব্রাহ্মণকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে না। অতএব রাজাজীর গঙ্গাযাত্রা। ব্রাহ্মণরা চাকরির জন্যে উত্তরে ছুটছেন। যেখান থেকে তাঁদের পূর্বপুরুষরা এসেছিলেন। কেউ কেউ উত্তরেই বাড়ি করেছেন। তা ইহুদীরা যদি প্যালেস্টাইনে ফিরে যায় দু হাজার বছর বাদে তো এঁরাই বা কেন আর্যাবর্তে না ফিরবেন অগস্ত্যের পথ ধরে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে বিপরীত মুখে?

কার ব্রেকিং পয়েণ্ট যে কখন উপস্থিত হয় কে বলতে পারে? হিন্দু মুসলমানের বা ভারত পাকিস্তানের ব্রেকিং পয়েণ্ট এলো ১৯৪৭ সালে। আর্য দ্রাবিড়ের বা হিন্দী তামিলের ব্রেকিং পয়েণ্ট আসতে পারে আরো ত্রিশ

বছর পরে। আমেরিকার স্বাধীনতার আশি বছর বাদে বাধল উত্তরে দক্ষিণে গৃহযুদ্ধ। সেইজন্যে খুব বেশী নিরুদ্বেগ হতে নেই। যদি কোথাও কোনো গভীর ব্যবধান থেকে থাকে তবে তাকে ভরাট করতে হবে। শুধু সেতুবন্ধন করাই যথেষ্ট নয়। এক শতাব্দী পূর্বে ন্যাশনালিজম এ দেশে ছিল না। তার আগে যা ছিল তাকে জাতীয় ঐক্য বলা ভুল। তলে তলে ছিল বই-কি এক প্রকার ঐক্য। সে রকম ঐক্য ইউরোপেও ছিল। কিন্তু ন্যাশনালিজম তা সত্ত্বেও ইউরোপকে বহু খণ্ড করেছে এবং প্রত্যেকটি খণ্ডকে অন্য এক প্রকার ঐক্য দিয়েছে, যার নাম জাতীয় ঐক্য। প্রায়ই আমরা এক প্রকার ঐক্যকে অন্য প্রকার ঐক্যের সঙ্গে ঘুলিয়ে ফেলি। ছিল ভারতবর্ষের এক প্রকার ঐক্য, কিন্তু জাতীয় ঐক্য বা ন্যাশনাল ঐক্য তার নাম নয়। এটার আয়ুষ্কাল এক শতাব্দীরও কম। মোটের উপর এটা কংগ্রেসের সমবয়সী। এ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, তবে ভারত ইউরোপের মতো বহু খণ্ড হতে পারে। যাতে দুর্বল না হয়, তার জন্যে নিত্য সজাগ থাকতে হবে। ধর্মের মতো ভাষাও বিস্ফোরক হয়ে দেশ ভেঙে দিতে পারে। ভাষার দ্বন্দ্ব থেকেও অভিনব রাষ্ট্রের উৎপত্তি হতে পারে। সৈন্যসামন্ত দিয়ে একে রোধ করা যায় না। ভাবাবেগ দিয়েও বাঁধ বাঁধা যায় না। খাদ থাকলে তাকে ভরাট করতে হবে।

আমাদের ছেলেবেলায় যখন কংগ্রেসের অধিবেশন বসত তখন একই শহরে অনুষ্ঠিত হতো নিখিল ভারত সমাজসংস্কার সম্মেলন, নিখিল ভারত ঈশ্বরবাদী সম্মেলন ইত্যাদি কতরকম অল ইণ্ডিয়া কনফারেন্স। অসহযোগ আন্দোলনের পর থেকে সে পাট উঠে যায়। তার বদলে আসে খাদি, গ্রামোদ্যোগ প্রভৃতির প্রদর্শনী বা বৈঠক। এগুলিও দরকারী। কিন্তু ওগুলি কি অদরকারী? ওগুলির দরকার কি ফুরিয়েছিল? তা নয়। আমাদের নেতাদের একটা ধারণা জন্মেছিল যে, রাজনীতি আর অর্থনীতি ছাড়া একটা নেশনের তৃতীয় কোনো বুনিয়াদ নেই। থাকলে সেটা হয়তো হরিজন আন্দোলন বা নয়ী তালিম। যে নেশন গড়ে উঠছে তার গঠনের সামাজিক, নৈতিক, দার্শনিক, নন্দনতাত্ত্বিক ইত্যাদি কত রকম ভিত্তি চাই। এসব সরকারী আওতায় হবার নয়। স্বাধীন ভারতের সরকার দিল্লিতে এ সকলের আয়োজন করলেও তা সার্থক হবে না। এর জন্যে চাই বেসরকারী উদ্যোগ উদ্দীপনা। কিন্তু কংগ্রেস পর্যন্ত আজকাল সরকারী সাহায্যনির্ভর। জাতীয়তাবাদের আধার যদি জাতীয় সরকারেই নিবদ্ধ হয়, তবে জাতীয় ঐক্য

নিতান্ত যান্ত্রিক হবে। যেটা সকলের সাধনা সেটা গুটিকতক রাজনীতিনিপুণের উপর ছেড়ে দিয়ে বসে থাকা যায় না।

মনে রাখতে হবে যে, ভারতবর্ষ আর একটি আয়ারল্যাণ্ড বা ইটালী নয়, আর একটা ইউরোপ। এই ইউরোপসদৃশ উপমহাদেশকে আমরা নেশন করে তুলতে চেয়েছিলুম। মস্ত বড় একটা প্রাচীর খাড়া করল মুসলীম লীগ। আর-একটা বালিনের প্রাচীর। এখন আরো একটা প্রাচীর নির্মাণের প্রস্তাব উঠেছে দক্ষিণে। পরের দোষ দেখার আগে একবার নিজের ত্রুটি দেখলে হয় না? ত্রুটি দেখলে সাশোধন করলে হয় না? একটা ত্রুটি তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। বরাবরই আমরা বলে এসেছি যে, হিন্দী হচ্ছে ভারতের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা। অর্থাৎ ইউরোপ যেমন ফরাসী ভারতে তেমনি হিন্দী। সকলেই জানেন, ফরাসী ইউরোপের সরকারী ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা নয়। লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা মানে সামান্য ভাষা। ফরাসীরা যদি জেদ ধরে যে, তাদের ভাষাকেই সারা ইউরোপের রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা বানাতে হবে, তাহলে ইউরোপ কোনো দিনই এক নেশন হয়ে উঠবে না। যে-ভাষা আপোসে সামান্য ভাষা হয়েছে, সে ভাষা গায়ের জোরে ন্যাশনাল ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হতে চাইলে এ-কুল ও-কূল দুকূল হারাবে। সম্প্রতি পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিকে একসূত্রে গাঁথার আয়োজন চলেছে। কিন্তু সেই "ইউরোপীয়" সংস্থার ভাষা কোনটি হবে তা নিয়ে তর্ক বেধে গেছে। ফরাসীর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ইংরেজী। তাই ফরাসীরা ইংরেজদের ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। ইংরেজরা ঢোকবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে।

যাকে আমরা সরল মনে আমাদের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা করতে রাজী ছিলুম সে এখন হয়ে উঠতে চায় রাষ্ট্রভাষা বা ন্যাশনাল ভাষা। অর্থাৎ ভারতের ফরাসী না হয়ে ইংরেজী। আমরা তো নারাজ হবই। এই যে নারাজ ভাব এটা তামিলদের মধ্যেই সব চেয়ে ব্যক্ত। কিন্তু বাঙালীদের মধ্যেও অব্যক্ত নয়। নেশন তৈরি হয় সকলের সম্মতি নিয়ে। নেশনের প্রতিষ্ঠা সম্মতির উপরে। সংবিধান রচনা করা ভোটের জোরে সহজ। তা দিয়ে রাষ্ট্র তৈরি হয়। রাষ্ট্র তৈরি করলেই অমনি একটা নেশন তৈরি হয়ে যায় না। পাকিস্তান বলে একটা পৃথক রাষ্ট্র তৈরি করার সময় জিন্না ধরে নিয়েছিলেন যে, পৃথক একটা নেশন তৈরি হলো। কিন্তু পনেরো বছর পরেও পাকিস্তান একটা নেশনে পরিণত হয়নি। আমরাও যদি মনে করে থাকি যে, সংবিধান রচনা করে

রাষ্ট্র বানালেই অমনি নেশন গড়ে উঠল তাহলে আমরাও তেমনি ভুল করব। নেশন একটা যান্ত্রিক ব্যাপার নয়, একটা আত্মিক ব্যাপার। অন্তরাত্মা সায় না দিলে কেউ তার জন্যে প্রাণ দিতে ছুটে যায় না। পাকিস্তানের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছিল তারা আসলে দিয়েছিল ইসলামের জন্যে। নেশন আর ধর্ম এক নয়।

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রধানত উত্তর ভারতবর্ষেরই ইতিহাস। আসাম, সিন্ধু ও তামিল রাজ্যগুলি আবহমানকাল উত্তর ভারতীয় রাজশক্তির অধিকারের বাইরে ছিল। ইংরেজরা দিল্লি থেকে নয়, কলকাতা বম্বে ও মাদ্রাজ থেকে তাদের জয় করে রাষ্ট্রভুক্ত করে। তেমনি কাবুল, পাঞ্জাব ও বাংলা দেশ কখনো বা উত্তর ভারতীয় রাজশক্তির অধিকারে এসেছে, কখনো বা অধিকারের বাইরে গেছে। দিল্লি থেকে নয়, কলকাতা থেকে ইংরেজরা বাংলা ও পাঞ্জাব জয় করে। কিন্তু কাবুল হতে ফিরে আসে। এই যেখানকার ইতিহাস, সেখানে শুধুমাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের বলে বা সংবিধান রচনার কৌশলে নেশন গড়ে তোলা যায় না। রাষ্ট্র তৈরি করা যায় বটে। নেশন গড়ে তুলতে হলে আরো কিছু চাই। তার নাম সম্প্রীতি। তার নাম অভয়। তার নাম সমান ত্যগ। তার নাম সমান সুযোগ। দিল্লিকে রাজধানী করে ও হিন্দীকে রাজভাষা করে উত্তর ভারতই আবহমান আধিপত্য করবে এরকম একটা সন্দেহ যদি কারো মনে জাগে তবে সেই একটি লোক একদিন বরফের গোলার মতো বাড়তে বাড়তে এক কোটি হবে। সন্দেহটা অমূলক একথা মুখে বললেই যথেষ্ট হবে না, কাজে দেখানো চাই। কাগজে কলমে প্রমাণ করা চাই।

চল্লিশ বছর আগে যখন আমি কলেজের ছাত্র তখন থেকেই আমি হিন্দীর অনুরাগী। স্বেচ্ছায় হিন্দী বই কিনেছি, পত্রিকার গ্রাহক হয়েছি। হিন্দীকে ফরাসী ভাষার মর্যদা দিতে চেয়েছি। এখনো আমার সে ইচ্ছার পরির্বতন ঘটেনি। আমার আপত্তি এইখানে যে, হিন্দীপ্রেমিকরা আমাকে আমার শর্তে চান না। চান তাঁদের শর্তে। তাঁদের মতে হিন্দী হবে ভারতের ফরাসী নয়, ইংরেজী। আমার মতে হিন্দী হবে ভারতের ইংরেজী নয়, ফরাসী। হিন্দী যদি ইংরেজীর উত্তরাধিকারী হয় তবে আমাদের উপর আধিপত্য করবে। তার সেই অসপত্ন অধিকার তামিলরা কোনোদিনই মেনে নেবে না। বাঙালীরা আত্মবিভক্ত হয়ে এক পা পাকিস্তানে ও এক পা ভারতে

না রাখলে তামিলদের মতোই হুমকি ছাড়ত। আপাতত দুর্বল, তাই আবেদন নিবেদন করছে। কিন্তু ইতিহাস তো দু'চার দশকেই শেষ হয়ে যাচ্ছে না। সন্দেহের বীজ যদি মনে ঢোকে তবে কুফল ফলতে হয়তো কিছু বেশি সময় লাগবে। নেশন গড়া যাঁদের ব্রত তাঁদের কর্তব্য সন্দেহের বীজ না বোনা। বুনতে না দেওয়া। বুনে থাকলে তুলে ফেলা।

এক একটি ভূখণ্ডের ইতিহাসের ধারা সহজে বদলায় না। উত্তর ভারতের অধিকার অতীত থেকে বর্তমানে ও বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে দক্ষিণে সম্প্রসারিত হতে চলেছে, ন্যাশনালিজমের ছাতার আড়ালে। পদক্ষেপটাকে সংশোধন করা চাই। সিঁদুরে মেঘ এই কথাই বলছে।

ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দ্বিমত দেখা দিয়েছে। ঠিক এই রকমটি দেখা দিয়েছিল হিন্দু কলেজ সংস্থাপনের যুগে। কিন্তু সেবারকার প্রশ্ন আর এবারকার প্রশ্ন এক নয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শিক্ষার জন্যে এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে। টাকাটি কী ভাবে ব্যয় হবে সেটা ছেড়ে দেয় ভারতীয় জনমতের উপরে। ভারতীয়দের এক পক্ষে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীর সংরক্ষকগণ। অপর পক্ষে ইংরেজীর প্রবর্তকগণ। শাসকরা রক্ষণশীলদের চটাতে চাননি। তাঁরা এটাও জানতেন যে ইংরেজীশিক্ষার প্রচলন হলে নব্যশিক্ষিতরা চাকরির দাবী তুলবে ও ইংরেজের পাওনায় ভাগ বসাবে। শেষে একদিন সমকক্ষ হয়ে উঠবে। তবে বিচারাবভাগে হাইড ইস্টের মতো উদারমনা ইংরেজ ছিলেন, সরকারের বাইরে ডেভিড হেয়ারের মতো বিদ্যোৎসাহী। গবর্ণমেণ্টের উপর নির্ভর না করে ইংরেজীর প্রবর্তনে বিশ্বাসী ভারতীয়রা এঁদের মতো কয়েকজন বান্ধবের সহায়তায় ইংরেজী স্কুল ও হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

এর ফলে সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীর সংরক্ষকরা যে নিরুদ্যম হলেন তা নয়। কলকাতার মাদ্রাসা আগে থেকেই ছিল। সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হলো। দুই পক্ষের চেষ্টা চলতে থাকল। ওই এক লক্ষ টাকা কোন পক্ষের কথায় খরচ হবে? দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কি সংস্কৃত, ফারসী ও আরবীমূলক হবে, না ইংরেজীমূলক? অর্থাৎ তার ভিত্তি কি প্রাচীন ক্লাসিকাল হবে, না আধুনিক বৈজ্ঞানিক? বলা বাহুল্য সংস্কৃত এ দেশের হলেও আরবী ফারসী এ দেশীয় নয়। সুতরাং স্বাদেশিকতা কোনো পক্ষের প্রধান বিচার্য বিষয় ছিল না। দ্বিতীয়ত সংস্কৃত কোনো দিন বাংলা প্রভৃতি ভাষাকে প্রাথমিক পাঠশালার চৌহদ্দি পার হতে দেয়নি। সংস্কৃত টোলে বাংলার প্রবেশ ছিল না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কেউ সংস্কৃত শিক্ষার অধিকারী ছিল না। সতরাং সংস্কৃতের পক্ষ নেবে কে? জনসাধারণ নয় নিশ্চয়!

মেকলের সভাপতিত্বে একটি কমিটির অধিবেশন হয়। তাতে উভয় পক্ষেই সমান ভোট। মেকলে তাঁর কস্টিং ভোট দিয়ে ইংরেজী প্রবর্তকদের জিতিয়ে দেন। তার পর থেকে ইংরেজী শিক্ষা সরকারী অনুমোদন ও পৃষ্ঠপোষকতা

পেয়ে সর্বত্র প্রসারিত হয়। ইংরেজী স্কুলগুলিতে বাংলাকেও স্থান দেওয়া হয়। মাধ্যমিক শিক্ষায় বাংলাও হয় ইংরেজীর শরিক ও মিত্র। ইংরেজীর প্রবর্তক যাঁরা তাঁরা বাংলারও প্রবর্তক। নইলে বাংলা সেই গ্রাম্য পাঠশালায় নিবদ্ধ রইত। স্কুলপাঠ্য বিষয় ও নিচের দিকের মাধ্যম হয়ে বাংলারও শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। তা হলে দেখা যাচ্ছে এক নৌকায় সংস্কৃত, ফারসী ও আরবী। আরেক নৌকায় ইংরেজী ও বাংলা। সরকার যখন ইংরেজী তথা বাংলার পক্ষ নেন তখন বাংলা খবরের কাগজগুলি জয়ধ্বনি দেয়। সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যদি বিপরীত হতো তা হলে বাংলা সাহিত্যেরও আধুনিক যুগে পদার্পণ ঘটত না। শুধু বাংলা কেন, হিন্দী উর্দু গুজরাতী মরাঠি তামিল তেলেগু প্রভৃতি কোনো সাহিত্যেরই আধুনিক পর্যায় আরম্ভ হতো না।

ইংরেজী শিক্ষা যখন পুরো দমে চলছে তখন দেশবাসীর মনে জাতীয় স্বাধীনতার চিন্তা জাগে। তখন ইংরেজীকে মনে হয় বিজাতীয়তার বাহক। সে যে আধুনিকতার বাহক এটা ভুলে যেতে বেশিদিন লাগল না। কিন্তু ইংরেজীকে তুলে দিলে তার জায়গায় শিক্ষার মাধ্যম হবে কোন্ ভাষা। সংস্কৃত ? বাংলা ? বাঙালী প্রধানরা কেউ ততদূর যেতে রাজী হন নি। সব চেয়ে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীরাও না। অনেকের ধারণা রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে ও বিশ্বভারতীতে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করেছিলেন। দুঃখের বিষয় তথ্যের সঙ্গে এই ধারণার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিপর্ব থেকেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার উপর ছিল বালকদের গুরুজনের লক্ষ্য। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পারলে কলেজে বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে তারা প্রবেশ পেতো না। রবীন্দ্রনাথ এটা জানতেন। তাই নিচের দিকে বাংলায় পড়ানো হলেও উপরের দিকে ইংরেজীই ছিল মাধ্যম। রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুধীরঞ্জন দাস এঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রনাথের বিদ্যালয়ে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স কিংবা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেছেন।

বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার সময় বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করতে পারা যেত, কিন্তু তা হলে বাংলার বাইরে থেকে ছাত্র সমাগম হতো না। বিশ্বভারতীর আদিযুগের ছাত্ররা সাধারণত গুজরাতী বা দক্ষিণী। ইংরেজীতেই তারা শিখত ও লিখত। বাংলাটা ছিল অধিকন্তু বা ঐচ্ছিক। তার পর রবীন্দ্রনাথের অনিচ্ছাসত্ত্বে স্থাপিত হয় কলকাতা মডেলের কলেজ, ছেলেদের তৈরি করে দেওয়া হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ বি-এ পরীক্ষার জন্যে। অতএব

ইংরেজী হয় তার মাধ্যম। বড়রকম একটা পরির্তন ঘটে বিশ্বভারতী যখন স্বাধীন ভারতের পার্লামেণ্টের আইনবলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয় বা বিশ্ববিদ্যালয় বলে পরিগণিত হয়।

তখন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাকেই করে তার পাঠভবনের উচ্চতম শ্রেণীর শিক্ষার ও পরীক্ষার মাধ্যম। তার পরের ধাপগুলো এখনো ইংরেজী মাধ্যমের দখলে। ইতিমধ্যেই চাপ পড়েছিল ইংরেজীর জায়গায় হিন্দীকে মাধ্যম করতে, যেহেতু টাকা আসছে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে। সে চাপ এড়ানো গেছে আন্তর্জাতিকতার দোহাই দিয়ে। আঞ্চলিকতার খাতিরে বাংলা মাধ্যম প্রবর্তন করতে চাইলে কেন্দ্রের সঙ্গে আড়াআড়ি বাধবে। তা ছাড়া ছাত্রও পাওয়া যাবে না বিশ্ব কিংবা ভারতের অন্যান্য অংশ থেকে। অবাঙালী ছাত্রদের কোনো দিনই বাংলা মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করতে দেখা যায়নি। উচ্চতর শিক্ষার জন্যে বাংলা শিখতে বাধ্য হলে তারা অন্যত্র সরে যাবে। বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। শান্তিনিকেতনে এই নিয়ে আলোচনা বৈঠক বসেছিল। অধিকাংশের মত হলো ইংরেজী মাধ্যম বহাল রাখা।

বিশ্বভারতীর যা ঐতিহ্য তাকে রক্ষা করতে হলে ইংরেজী মাধ্যমকেও রক্ষা করতে হবে। নতুবা ইংরেজীর জায়গায় হিন্দী উড়ে এসে জুড়ে বসবে। উপরের দিকে তর্কটা ইংরেজী বনাম বাংলা নয়। ইংরেজী বনাম হিন্দী। বিশ্বভারতী কবিগুরুর জীবদ্দশায় হিন্দীকে তার যথাযোগ্য স্থান দিয়েছে। হিন্দীভবন স্থাপন করেছে। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম হবে হিন্দী এটা বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যবিরুদ্ধ। এর দরুন যদি তাকে জাতীয়তাবিরোধী বলে কটু কথা শুনতে হয় তাতেও সে রাজী। আর বাংলা মাধ্যমের পক্ষপাতীরা এখন পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেন নি যে ইংরেজী মাধ্যম উঠে গেলে তার জায়গায় বাংলাই হবে উচ্চতর শিক্ষার মাধ্যম ও সেটা কেন্দ্রীয় সরকার মেনে নেবে। এঁরা এমন একটা অবাস্তব জগতে বাস করেন যেখানে রবীন্দ্রনাথের নামেই বিশ্ব আর ভারত বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমরূপে দেখতে বদ্ধপরিকর। যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই দেখে যেতে পারলেন না।

তার পর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। সেদিন আর নেই যেদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল একেশ্বর। কলকাতাতেই আরো দুটি বিশ্ব-বিদ্যালয় হয়েছে, বর্ধমানে আর একটি, কল্যাণীতে আর একটি, উত্তরবঙ্গে আর

একটি। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এগুলির শিক্ষার মাধ্যম কলমের এক খোঁচায় বাংলা হতে পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত তার কোনো লক্ষণ নেই। অন্তত রবীন্দ্রভারতীর শিক্ষার মাধ্যম অনায়াসেই বাংলা হতে পারে। বিশ্বভারতীর বেলা যেসব কথা খাটে রবীন্দ্রভারতীর বেলা সে সব খাটে না। রবীন্দ্রভারতী স্বচ্ছন্দেই অভিনব ঐতিহ্যের সূত্রপাত করতে পারে। তেমনি বর্ধমান, যাদবপুর, কল্যাণী ও উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়। সর্বপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতাকে নিয়ে এত টানাটানি কেন? কলকাতা যদিও পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীন তবু তার ঐতিহ্য সর্বভারতীয়। একদিন তার এলাকা ছিল রেঙ্গুন থেকে পেশাওয়ার অবধি বিস্তৃত। বাংলা বিভাগ বলে তার কোনো বিভাগই নেই। বিভাগটার নাম "আধুনিক ভারতীয় ভাষাবৃন্দ" কেবল বাংলার প্রতি নয়, হিন্দী উর্দু ওড়িয়ার প্রতিও কলকাতার উদার দৃষ্টি। একমাত্র বাংলার সঙ্গে আপনাকে একাত্ম করলে কলকাতা আর ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী থাকবে না। রাজনৈতিক রাজধানী এখন দিল্লী, অর্থনৈতিক রাজধানী বোম্বাই, কলকাতা যদি সাংস্কৃতিক রাজধানীও না হয় তবে সে কী? একটি আঞ্চলিক সদর? যেমন পাটনা, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ? ইংরেজী মাধ্যমের দরুন এখনো ভূভারতের ছাত্র আসে কলকাতায়। বাংলা মাধ্যম হলে আসবে কি? সে রকম একটা মোহ হয়তো কারো কারো মনে আছে। জার্মানীতে যখন জার্মান শিখে পড়তে যাচ্ছে, ফ্রান্সে যখন ফরাসী শিখে পড়তে যাচ্ছে তখন কলকাতায় কেন পড়তে আসবে না বাংলা শিখে?

যাই হোক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এ সিদ্ধান্ত একদিন নিতে হবেই। আজ না নিলে কাল, কাল না নিলে পরশু। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তকরাও কল্পনা করেন নি যে শিক্ষার মাধ্যম নিরবধিকাল ইংরেজীই থাকবে। বাংলার সঙ্গে ইংরেজীর বিরোধ বাধবে এটা তাঁরা ভাবতে পারেন নি। কিন্তু বাধবেই যদি বাংলার উচ্চাভিলাষ ইংরেজীর দ্বারা ব্যাহত হয়। যদি বাংলার চরম বিকাশের পথ ইংরেজীর দ্বারা রুদ্ধ হয়। সুতরাং ইংরেজী মাধ্যমের হাজার গুণ থাকলেও বাংলার সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমত্তা। ক্রমে ক্রমে ইংরেজীর বদলে বাংলা হবে উচ্চতম শিক্ষারও মাধ্যম।

এখন এর একটা উল্টো দিকও আছে। সেটা সকলের মনে রাখা চাই। সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বাহন ছিল বহুকাল ধরে সংস্কৃত। সে যুগে কেউ

বাংলাদেশে আসত না, বাংলাদেশের দিকে তাকাত না। বড়জোর একটি বিশেষ বিষয়ে জ্ঞানলাভের জন্যে কতক পড়ুয়া নবদ্বীপে কিছুদিন কাটাত। বাঙালীর সুদিন এলো অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর দুর্দিনের সঙ্গে সঙ্গে। বাংলার সুদিন এলো ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে। কলকাতার সুদিন এলো ইংরেজের সঙ্গে সঙ্গে। সারা ভারতের দৃষ্টি পড়ল ইতিহাসে প্রথম বার পূর্বদিকের মানচিত্রের উপর। বিংশ শতাব্দীতে সে গৌরব রবি পৃথিবীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল। "আজ বাংলাদেশ যা ভাবে—"

ইংরেজী শিক্ষা বলতে অনেক কিছুই বোঝায়। শুধু ইংরেজীতে লেখা পাঠ্যপুস্তক পড়া নয়। মানুষের মনে অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হয় ব্যক্তি স্বাধীনতা, মানবিকতা, গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারবোধ, আইনের শাসন, মিলিটারির উপর সিভিলের শ্রেষ্ঠতা, অথরিটির উপর যুক্তির শ্রেষ্ঠতা। এমনি কতকগুলি মূল্য যা আগেকার দিনে আমাদের দেশে ছিল না, এখনো আমাদের মনে গভীরভাবে বসেনি, আমাদের জীবনে সহজ হয়নি। এ সব ক্ষেত্রে জাপানীরা কি আমাদের উপর টেক্কা দিয়েছে? তাদের ইনটেলেকচুয়ালরা কি আমাদের ইনটেলেকচুয়ালদের চেয়ে বড়? তাদের সাহিত্যিকরা কি আমাদের সাহিত্যিকদের চেয়ে মহৎ? তাদের আইনজ্ঞরা কি আমাদের আইনজ্ঞদের চেয়ে বিদ্বান? তাদের বিচারকরা কি আমাদের বিচারকদের চেয়ে বিজ্ঞ? জাপানের দৃষ্টান্ত যাঁরা দিচ্ছেন তাঁরা কি জানেন না জাপানকে ফাসিস্ট করতে কতটুকু কাঠখড় লাগে? ভারতকেও মিলিটারিস্ট করতে বা মধ্যযুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে খুব বেশি কাঠখড় লাগে না। রামমোহন রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বদলে আর একটা ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যারা নেবেন তাঁরা যেন ভারতের সনাতন দুর্বলতার কথাটাও গণনার মধ্যে আনেন। বিশেষত বাঙালীর।

যে দেশে বহু ধর্ম বহু ভাষা

যে দেশে বহু ধর্ম সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এ প্রশ্নের উত্তর পাকিস্তান একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। পাকিস্তানের অধিকাংশের ইচ্ছা অনুসারে স্থির হয়ে গেছে পাকিস্তান হচ্ছে ইসলামী রাষ্ট্র। সেই যুক্তি অনুসরণ করলে ভারত হতে পারত হিন্দু রাষ্ট্র। কিন্তু ভারত করল অপর একটি যুক্তি অবলম্বন। ভারতের মতে সব ধর্মই সমান, সব ধর্মই সত্য, সংখ্যাগুরুর মুখ চেয়ে একটি ধর্মকেই রাষ্ট্রধর্মে পরিণত করলে আর সব ধর্মের উপর অবিচার করা হবে, সুতরাং সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু নির্বিশেষে সর্বোদয়ের বিচারে সকলের প্রতি সমদর্শিতার খাতিরে ভারতকে হতে হবে সেকুলার স্টেট। যে রাষ্ট্র ধর্মের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ।

এই যুক্তি বর্মাও অবলম্বন করেছিল। কিন্তু কী যে দুর্বুদ্ধি হলো উ নু ও তার দলের। তাঁরা সাধারণ নির্বাচনে জিতেই আইন পাশ করিয়ে নিলেন যে বর্মা হবে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। অধিকাংশের ইচ্ছায় কর্ম। কে বাধা দেবে? কিন্তু এর পরিণাম হলো অশুভ। শান, কারেন প্রভৃতি পার্বত্য জাতির তরফ থেকে দাবী উঠল আংশিক স্বাতন্ত্র্যের। শেষে প্রধান সেনাপতি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করে শাসনতান্ত্রিক সরকার ধ্বংস করলেন। পাকিস্তানেও তাই হয়েছে। তবে ইসলামী রাষ্ট্র এখনো লোপ পায়নি, যেমন লোপ পেয়েছে বৌদ্ধ রাষ্ট্র। পাকিস্তানী জনগণ যদি কোনো দিন গণতন্ত্রের মর্যাদা বোঝে তা হলে সেই সঙ্গে সেকুলার স্টেটের মর্যাদাও বুঝবে। যেখানে সেকুলার স্টেট নেই সেখানে গণতন্ত্র কেবলমাত্র অধিকাংশের ইচ্ছাসাপেক্ষ নয়, সর্বজনের ইচ্ছানির্ভর। গণতন্ত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থাকতে পারে না। যারা প্রতিবেশীকে দ্বিতীয়-শ্রেণীর নাগরিকে পর্যবসিত করে তারা ডিক্টেটরের পদানত হবেই। তারা আত্মকর্তৃত্বের যোগ্য নয়। কারণ তারা অপরের সমান অধিকার মানে না।

ভারত সেকুলার স্টেট হয়ে বর্মার ও পাকিস্তানের দশা এড়িয়েছে। সেকুলার স্টেট যতই দৃঢ় হবে গণতন্ত্রও ততই দৃঢ় হবে। অনেকেই এটা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, কিন্তু সকলে এখনো করেননি। তাঁরা চান হিন্দু রাষ্ট্র,

হলোই বা সেটা ফাসিস্ট শাসিত। ইতিহাস এঁদের বাসনা পূর্ণ করলে ভারতেরও দশা হবে পাকিস্তানের বা বর্মার মতোই।

এ গেল ধর্মের কথা। ইতিমধ্যে ভাষার প্রশ্ন প্রবল হয়েছে। যে দেশে বহু ভাষা সে দেশের মূলনীতি কী হওয়া উচিত? এর উত্তরে বেলজিয়াম ও সুইটজারল্যাণ্ড একভাবে দিয়েছে। ভারত দিয়েছে অন্যভাবে। কার উত্তরটা ঠিক? কারটা বেঠিক?

বেলজিয়াম বলে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৩০ সালে। তার রাষ্ট্রভাষা হয় ফরাসী। দশটা বছর যেতে না যেতেই ফ্লেমিশদের দিক থেকে প্রতিবাদ ওঠে। তারাও তো বেলজিয়ান। তবে তাদের ভাষা কেন ফরাসীর সমান মর্যাদা পাবে না? দীর্ঘকাল আন্দোলন চালানোর ফলে ১৮৯৮ সালে আইন করে ফরাসী ও ফ্লেমিশ উভয় ভাষাকেই বেলজিয়ামের ন্যাশনাল ভাষারূপে সমান স্থান দেওয়া হয়। এখন সে দেশের রাষ্ট্রভাষা এক নয়, দুই। সরকারী কাজকর্ম দুই ভাষায় চলে।

তেমনি সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৭৪ সালের শাসনতন্ত্রে মেনে নেওয়া হয় যে, তাদের ন্যাশনাল ভাষা হবে জার্মান, ফরাসী ও ইটালিয়ান। বলা বাহুল্য এ তিনটি ভাষা শুধু উপরের দিকের কাজকর্মের ভাষা। নিচের দিকের কাজকর্ম জেলা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় চলে। জেলা স্তরে আরো দুটি ভাষারও অস্তিত্ব আছে। এ ছাড়া সর্বত্র ইংরেজীর প্রচলন। সেটা অবশ্য বেসরকারী ভাবে। সুইসরা একাধিক ভাষা শিখতে অভ্যস্ত।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে এ ধারণা ইউরোপেও ছিল। তার দরুন প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের জ্বালিয়েছে। আজকাল আর সে ধারণা নেই। কিন্তু একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে, এ ধারণা অত্যন্ত ব্যাপক। এর ফলে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতে যথেষ্ট অত্যাচার হয়েছে। আলসাস লোরেনের লোক একবার জার্মানদের হাতে মার খেয়েছে, একবার ফরাসীদের হাতে।

এখন ভারতের কথা বলি। একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রধর্ম হবে, এ ধারণা যাঁদের মধ্যে নেই তাঁরাও বিশ্বাস করেন যে, একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হবে। বেলজিয়ামের চেয়ে, সুইটজারল্যাণ্ডের চেয়ে বহুগুণ বৃহৎ যে দেশ, যার ভাষাসংখ্যা খুব কম করে ধরলেও চোদ্দ পনেরটি সেদেশ যখন পরাধীন ছিল তখন একটিমাত্র বিদেশী ভাষার দ্বারা একসূত্রে গাঁথা ছিল।

তার থেকে একটা সংস্কার জন্মেছে যে রাষ্ট্রভাষা একাধিক হতে পারে না। আমি কিন্তু এই সংস্কারের স্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার করিনি। এটার সত্যতা নির্ভর করছে সকলের সম্মতির উপরে, সুবিধার উপরে, ন্যায়বোধের উপরে। অধিকাংশের ভোটের জোরে কোনো একটি ভারতীয় ভাষাকে আর সকলের উপর চাপালে পকিস্তানের ইসলামী রাষ্ট্রের মতো একটা অপরিণামদর্শী সমাধান হয়। সেরকম একটা সমাধান যখন বেলজিয়ামে বা সুইটজারল্যাণ্ডে টিকল না তখন ভারতেও টিকতে পারে না। ইতিমধ্যেই তামিলদের জন্যে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব উঠেছে। মাত্র পনেরো বছর যেতে না যেতেই এই। এখনো তো অর্ধ শতাব্দী কাটেনি। ভারত যদি ছত্রভঙ্গ হয় তবে ভাষার ইস্যুতেই হবে।

হিন্দীর পিছনে সকলের সম্মতি নেই। সকলের তাতে সুবিধা হবে না। সকলের ন্যায়বোধ তার দ্বারা চরিতার্থ হবার নয়। তার পক্ষে একটিমাত্র যুক্তি। অধিকাংশ লোক হিন্দী চায়। অর্থাৎ অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। পাকিস্তান যেমন ধর্মের ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, ভারতে তেমনি ভাষার ব্যাপারে অধিকাংশের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকত্বের আশংকা জাগে। এমন কয়েকটি বিষয় আছে যা গায়ের জোরে বা ভোটের জোরে নিষ্পত্তি করা যায় না। ধর্ম তার একটি। ভাষা তার আরেকটি। ধর্মের বেলা আমরা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছি। ভাষার বেলাও কি দিতে পারিনে?

তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। ইংরেজীকে সরানোর পরে ঘোরতর বিবাদ বেধে যাবে। তামিলরা হিন্দীকে মানবে না, নাগারা মানবে না, কাশ্মীরীরা মানবে না। বাঙালীরাও মানবে না। এমনি না মানার লক্ষণ চার দিকে। কংগ্রেস থাকতেই এই। কংগ্রেস কি চিরস্থায়ী? পরে যে দলটার হাতে ক্ষমতা পড়বে সে দল যদি সবকটা রাজ্যের আস্থা না পায় তখন হিন্দীর প্রতি বিরাগ হবে মানুষকে খেপিয়ে তোলার একটা উপায়। যেমন হিন্দুর উপর বিরাগ হয়েছিল মুসলমানকে বিভ্রান্ত করার অব্যর্থ উপায়। সেইজন্যে তর্কটা হিন্দী বনাম ইংরেজী নয়। তর্কটা আসলে হচ্ছে হিন্দী বনাম তামিল-বাংলা-পাঞ্জাবী ইত্যাদি। হিন্দী হবে কেন্দ্রীয় সরকারের একমাত্র ভাষা, এর মানে হিন্দী হবে সারা ভারতের একচ্ছত্র ভাষা। যাদের মাতৃভাষা হিন্দী নয় তারা হিন্দী শিখতে গিয়ে

দেখবে যে, প্রত্যেকটি হিন্দীভাষী শিশু জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যেমন জন্মত স্টার্ট পেয়ে এগিয়ে থাকত প্রত্যেকটি ইংরেজ শিশু। ইংরেজীকে যারা বিদায় করবে তারা কি ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারীকেও একদিন ঘাড় থেকে নামাতে চাইবে না ?

হিন্দী যে ইংরেজীর একমাত্র উত্তরাধিকারী হবার স্বপ্ন দেখছে হিন্দী কি বুঝতে পারছে না যে, আর সকলের সঙ্গে ভাগ না করে ভোগ করা যায় না ? ভাগ করার নমুনা কি এই যে, হিন্দীই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ও আর-সব আঞ্চলিক ভাষা ? সব কটা ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা চাই। সেটা যদি কাজের কথা না হয় তবে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত করা চাই যার দ্বারা আর সকলের ন্যায়বোধ চরিতার্থ হবে। প্রতিযোগিতার বা পরীক্ষার ভাষা যদি হয় ইংরেজী, তা হলে আমাদের ন্যায়বোধ যতখানি চরিতার্থ হয় হিন্দী হলে ততখানি হয় না। বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজীকে হটাতে চাও ? বেশ। তার বদলে এমন একটি ভাষাকে হিন্দীর সঙ্গে বন্ধনীভুক্ত কর যে-ভাষা আমাদের ন্যায়বোধকে পীড়া দেবে না। সে-ভাষাটি যে-কোন ভাষা, অহিন্দীভাষীদের দ্বারাই সেটি স্থির হোক।

আর কোনো ভাষা ভারতের সকল প্রান্তে ইংরেজীর মতো ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, এটা একটা প্রত্যক্ষ সত্য। যেখানে হিন্দী চলে না সেখানেও ইংরেজী চলে। ইংরেজীর অধিকারে না থাকলে সে সব অঞ্চল হিন্দীর অধিকারেও আসত না। ইংরেজী নামক সত্যটির উৎপত্তিস্থল ইংলণ্ড। তেমনি আরো অনেকগুলি সত্যেরও উৎপত্তি ইংলণ্ডে বা ইউরোপে। আমাদের শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, আইন আদালত, পার্লামেণ্ট, আর্মি, নেভী, পুলিস, স্কুল কলেজ, লেবরেটারি, রেল স্টীমার, ডাকঘর ডাক্তারখানা ব্যাঙ্ক, স্টক এক্সচেঞ্জ, ছাপাখানা খবরের কাগজ, থিয়েটার, সিনেমা, রেডিও, ট্রাম, বাস, মোটর—কোনটিই বা বিদেশাগত নয় ? এমন কি কংগ্রেসও তো বিদেশী। হিন্দ্, হিন্দু, হিন্দী। এসবও তো বিদেশী ভাষার শব্দ। আজকাল স্বদেশী পারিভাষিক শব্দ দিয়ে শোধন করে নেওয়া চলেছে। "রাজ ভবন" বললে স্বদেশিয়ানার একটা বিভ্রম সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে বস্তুর নাম পাল্টে দেওয়া হয় তার বস্তুসত্তা অবিকল তেমনি রয়ে যায়। টেলিফোনকে কী একটা বিকট হিন্দী নাম দেওয়া হয়েছে। তা সত্ত্বেও সেটা টেলিফোন নামক বিদেশী একটা যন্ত্রই। বিদেশী বলেই সেটা বর্জনীয় নয়।

তেমনি ইংরেজী। তার সঙ্গে পরাধীনতার সম্পর্ক একদা ছিল। এখন তো নেই। ভবিষ্যতেও সে সম্পর্ক ফিরবে না। ইতিমধ্যেই স্থির হয়ে গেছে যে সব ছাত্রকেই একটা স্তরে ইংরেজী শিখতে হবে। অবশ্য-শিক্ষণীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীতে কারো আপত্তি নেই। তাই যদি হলো তবে শিক্ষার শেষ ধাপে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী হলে আপত্তির কী কারণ থাকতে পারে? তামিলরা ও বাঙালীরা জিতে যাবে, হিন্দীভাষীরা তাদের সঙ্গে পেরে উঠবে না, এই কারণ নয় তো? উপরের দিকে পরীক্ষার ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজী যেমন ছিল তেমনি থাকাই রাষ্ট্রের স্বার্থ। সেইভাবেই রাষ্ট্র যোগ্যতম প্রার্থী বেছে নিতে পারে। করদাতার অর্থ সেইভাবেই সৎপাত্রে পড়বে। নিকট ভবিষ্যতে আমি এই ব্যবস্থার রদবদলের পক্ষপাতী নই। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সবাইকে সমান সুযোগ দেওয়াই যদি নীতি হয় তবে প্রতিযোগিতার মাধ্যম ইংরেজীই থাকবে, ইংরেজী ভিন্ন আর কোনো ভাষা হবে না। যদি হিন্দীকেও অন্যতম মাধ্যম কর তবে বাংলাকেও করতে হবে, তামিল তেলেগু কন্নাডিগ মালয়ালমকেও করতে হবে।

জাতীয় মর্যাদার খাতিরে হিন্দী ভারত রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা হোক, কিন্তু আভ্যন্তরিক ন্যায়ের খাতিরে ইংরেজীই পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম রূপে থাকুক। ইংরেজী মাধ্যম না থাকলে পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতার মাধ্যম হোক বাংলা, উর্দু, মরাঠি, গুজরাতী ইত্যাদি চোদ্দ পনেরোটি ভাষা। শুধু হিন্দী নয়। যেখানে হিন্দীকে বসালে অহিন্দীভাষীদের ক্ষতি সেখানে ইংরেজীকে রাখাই সমীচীন। বিদেশী বলে তাকে খেদিয়ে দিলে স্বদেশী বলে শুধু হিন্দীকে নয়, বাংলাকে, পাঞ্জাবীকে, তামিলকেও বসাতে হবে। যেখানে কারুর কোনো ক্ষতি নেই সেখানে হিন্দী আরাম করে বসুক। কিন্তু অপরের ক্ষতি যেখানে সেখানে হিন্দীর আরাম করে বসার অধিকার নেই। জাতীয়তার জন্যে তাকেও ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

একটা দেশের একটাই রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। এটা একভাষী দেশের বেলাই খাটে। ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটাকে খাটাতে যাঁরা চাইছেন তাঁরা মনে মনে ইংরেজীরই নজির অনুসরণ করছেন। ইংরেজী যেমন একচ্ছত্র ছিল তেমনি একচ্ছত্র হবে অন্য একটি ভাষা। অন্য একটিমাত্র ভাষা। সেই বিদেশী লজিকের জোরে হিন্দীকেও একচ্ছত্র করতে হবে।

কিন্তু বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজী যদি বিদায় হয় তবে তার নজিরটাকেই বা মানতে যাব কেন? জাতীয় ঐক্য কি সুইসদেরও নেই? বেলজিয়ানদেরও নেই? একাধিক রাষ্ট্রভাষা কি তাদের ঐক্যহানি ঘটিয়েছে?

শেষ পর্যন্ত তর্কটা দাঁড়ায় ইংরেজী হলো বিদেশীর ভাষা, বিজেতার ভাষা। তাকে বিদায় না দিলে স্বাধীনতা সম্পূর্ণ হবে না। বেশ, তাই হোক। তা হলে ইংরেজীর নজিরটাকেও মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যাক। ভারতের সব কটা ভাষাকেই হিন্দীর সঙ্গে সমান মর্যাদা দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের সরকারী ভাষা করা হোক। সেটা কাজের কথা নয় এ যুক্তি আর আমরা শুনতে চাইনে। একটা বহুভাষী দেশের রাষ্ট্রভাষা একটাই হবে এটাও কি কাজের কথা? ইংরেজরা তাদের নিজেদের সুবিধের জন্যে ওরকম করেছিল। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ভারতীয়েরও ওতে কিছু সুবিধে হয়েছিল। কিন্তু জনগণের দিক থেকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা—হিন্দী হলেও—কাজের কথা নয়। যতগুলি ভাষা ততগুলি রাষ্ট্রভাষা এইটেই কাজের কথা। আমরা যদি এই সত্যকে স্বীকার না করি, এই সত্যের সঙ্গে আপস রফা না করি তবে অমীমাংসিত সমস্যা একদিন আপনার পথ আপনি করে নেবে। বহুভাষী দেশ বহু রাষ্ট্র হবে।

ইউরোপীয়রা যদি না আসত তা হলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতো। এরা যে যার সুবিধামতো এক একটা স্বদেশী ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক স্বদেশী ভাষাকে। হিন্দীর সার্বভৌমত্ব সব হিন্দু মেনে নিত না। উর্দুর সর্বভৌমত্ব সব মুসলমান মেনে নিত না। হয়তো সবাই মিলে একদিন একটা ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গড়ে তুলত। কিন্তু সেই সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা যে একমাত্র হিন্দী বা একমাত্র উর্দু হওয়া উচিত এটা সবাইকে দিয়ে মানিয়ে নেওয়া খুবই কঠিন হতো। অত দূর যেতে হবে কেন? ধরুন, ১৯৪৭ সালে যদি জিন্নাসাহেব ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনায় রাজী হয়ে যেতেন, যদি অখণ্ড ভারতবর্ষের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হতো তা হলে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা কি এক হতো, না একাধিক হতো, না হিন্দী উর্দুর যমজরূপ হতো? সকলেই জানেন যে একমাত্র হিন্দীর একচ্ছত্র দাবি কেউ স্বীকার করতেন না। না জিন্না, না গান্ধী। ঐক্যের খাতিরে হয় যমজ ভাষাকে সম্মিলিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করতে হতো, নয় ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হতো।

দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলেই একদিকে হিন্দী ও অন্যদিকে উর্দূ একচ্ছত্র হবার ছাড়পত্র পেয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালী মুসলমান হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে যে ওই ছাড়পত্রটা উর্দূভাষী মুসলমানদের শাসন শোষণের সনদ। তাই তারা বাংলাকেও উর্দূর সমান অংশীদার করার জন্যে প্রাণপণ করছে। আক্ষরিক অর্থে প্রাণ দিয়েছেও। উর্দূই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে এটা তারা কোনো কালেই মেনে নেবে না। তারা যেন বেলজিয়ামের ফ্লেমিশ ভাষী। লেগে থাকলে তাদের মাতৃভাষাও পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা হবে, শুধু পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা নয়। উর্দূভাষীরা যদি তাতে নারাজ হয়, তবে রাষ্ট্র দু' ভাগ হয়ে যাবে। তার জন্যে দায়ী হবে উর্দূভাষীদের জেদ। আর নয়তো ইংরেজীকেই অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখতে হবে। আপসের আর কোনো উপায় নেই। ইংরেজী বিদেশী ভাষা, কিন্তু আপসের একমাত্র উপায়।

উর্দূর বিরুদ্ধে নয়, উর্দূভাষীদের প্রচ্ছন্ন সনদের বিরুদ্ধেই পূর্বপাকিস্তানীদের এ বিক্ষোভ। তেমনি হিন্দীভাষীরাও একটা সনদ পেয়ে গেছে। ভাবী ভারতের শাসক ও ধনিক শ্রেণী হবে হিন্দীভাষী এরকম একটা ইঙ্গিত দেখা দিয়েছে। মহাত্মাজী ভেবেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অতি অল্প ক্ষমতা দেবেন, আর সব ছড়িয়ে দেবেন প্রদেশে প্রদেশে, গ্রামে গ্রামে। ঠিক উল্টোটি হয়েছে। বিকেন্দ্রীকরণের ভরসা নেই। ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন বিকেন্দ্রীকরণের অন্তরায়। দেশ ইণ্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনকেই বরণ করে নিয়েছে। অত্যন্ত কেন্দ্রীভূত ক্ষমতাকে হিন্দীভাষীদের ধনাধিক্য ও ভোটাধিক্যের উপর ছেড়ে দিলে সেটা গণতন্ত্রের মতো দেখায়, কিন্তু সেটা হয় উত্তর ভারতের দ্বারা ভারাক্রান্ত মাথাভারী গণতন্ত্র। তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ অবশ্যম্ভাবী। তামিলদের একদল এরই মধ্যে খেপেছে। হিন্দী নামক ভাষার বিরুদ্ধে ততটা নয়। যতটা হিন্দীভাষী শাসক ও ধনিক শ্রেণীর সনদের বিরুদ্ধে। মিটমাট না হলে দেশ আবার ভাঙবে। আপসের আর কী উপায় আছে—ইংরেজীকে সহচর ভাষারূপে অনির্দিষ্টকাল বহাল রাখা ভিন্ন ?

আমাদের হাজার বছরের অভিজ্ঞতা বলছে যে দেশ বহুখণ্ড হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায় না। বিপদের সময় দেশবাসী একজোট হয় না। সুতরাং শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন চাই। এতকাল পরে আমরা আমাদের নিজেদের একটি কেন্দ্রীয় সরকার পেয়েছি। কাশ্মীরী, কেরলী, বাঙালী, তামিল

অসমীয়া, গুজরাতী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি নানা প্রান্তের লোক একবার কুরুক্ষেত্রে মিলিত হয়েছিল শুনেছি। সেটা কিন্তু মিলেমিশে দেশ চালানোর জন্যে নয়। ইতিহাসে এই প্রথমবার আমরা একজোট হয়ে রাষ্ট্র চালাচ্ছি। এ জোট যদি ভেঙে যায় তবে আবার পরাধীনতা। একে অটুট রাখতেই হবে। অথচ একমাত্র রাষ্ট্রভাষার সনদ যে একে তলে তলে ভাঙছে। এটা এমন একটা ইস্যু যার একপ্রান্তে হিন্দীভাষীদের স্বার্থ, অপর প্রান্তে অহিন্দীভাষীদের স্বার্থ, মাঝখানে ওই আপসের প্রস্তাব। ওই সহচর ভাষা। ভাঙনকে রোধ করতে হলে ওর চেয়ে আর কোনো সহজ উপায় নেই। বিদেশী বলে ইংরেজীতে যাঁদের আপত্তি তাঁরা ইচ্ছা করলে ইংরেজীর বদলে বাংলা তামিল মরাঠি ইত্যাদি চৌদ্দ পনেরটি ভাষাকে সহচর ভাষা বানাতে পারেন। কিন্তু সেটার নাম আরো সহজ নয়, আরো জটিল।

'বিদেশী' এই বিশেষণটাই যদি যত নষ্টের গোড়া হয়ে থাকে তবে আমরা তার বদলে 'আন্তর্জাতিক' এই বিশেষণটি ব্যবহার করতে পারি। স্বাধীন রাষ্ট্র যদি কমনওয়েলথ নামক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে তো আন্তর্জাতিক ভাষা ব্যবহার করলে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। স্বাধীনতার সঙ্গে সেটা যদি খাপ খায়, তবে এটাই বা বেখাপ হবে কেন? আগেকার দিনে বিদেশী ভাষার বিরুদ্ধে যতগুলি যুক্তি শোনা যেতো ইদানীং স্বদেশী ভাষার বিরুদ্ধেও ততগুলি শোনা যাচ্ছে। তামিলরা তো সাফ বলে দিয়েছে যে, হিন্দীও ওদের পক্ষে বিদেশী। আমরাও তো দেখছি হিন্দী শিখতে ইংরেজীর চেয়ে কম শক্তি খরচ হলেও হিন্দীতে শেখবার যোগ্য বিষয় অল্পই আছে, ইংরাজীতে বিস্তর। শব্দগুলো হয়তো চেনা, কিন্তু অর্থ এক নয়। আর ব্যাকরণ তো আরবীর কাছাকাছি যায়। 'মহাত্মা গান্ধীকী' হলো কেন? 'কা' হলো না কেন? কারণ 'জয়' শব্দটা স্ত্রীলিঙ্গ। আর বিশেষ্য যদি স্ত্রীলিঙ্গ হয়, তবে বিশেষণকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে, ক্রিয়াপদকেও স্ত্রীলিঙ্গ হতে হবে। কিন্তু গোড়ায় গলদ, 'জয়' কেন স্ত্রীলিঙ্গ হবে? 'ফতে' স্ত্রীলিঙ্গ বলে?

যাই হোক হিন্দী আমাদের দেশের সব চেয়ে বহুল প্রচলিত ভাষা। দেশের লোকের সঙ্গে কারবার করতে হলে হিন্দী আমাদের শিখতেই হবে। রাষ্ট্রভাষা না হলেও শিখতুম। শিখেছি। 'মহাত্মা গান্ধী কী জয়' হেঁকেছি। হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে বলে সুখীই হয়েছি। তা হলে বাধছে কোন্‌খানে? বাধছে এইখানে যে, ভারত যেমন ধর্মের বেলা নিরপেক্ষ

তেমনি নিরপেক্ষ ভাষার বেলা নয়। হিন্দুধর্মের সঙ্গে সে তার রাষ্ট্রকে একাকার করেনি, কিন্তু হিন্দীভাষার সঙ্গে তা করেছে। ভারত হিন্দুরাষ্ট্র নয়, কিন্তু সংবিধানের যদি সংশোধন না হয়, তবে ১৯৬৫ সালে হিন্দী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে একমেবাদ্বিতীয়ম্ হওয়ামাত্র ভারতকে বলতে পারা যাবে হিন্দী-রাষ্ট্র। তখন হিন্দীভাষীরাই হবে প্রথম শ্রেণীর নাগরিক। পাকিস্তানের হিন্দুরা যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক ভারতের বাংলাভাষী তামিলভাষী পাঞ্জাবীভাষীরাও তেমনি দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বনবে। সংবিধান রচনার সময় কনাস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লির সদস্যেরা সর্বসম্মতিক্রমে হিন্দীকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করেননি। তাঁদের মধ্যে তখনি দ্বিমত দেখা দিয়েছিল। এক পক্ষ ছিলেন হিন্দীর সমর্থক। অপর পক্ষ ইংরেজীর। বলা বাহুল্য ইংরেজীর সমর্থকরা জানতেন যে ইংরেজী একটি বিদেশী ভাষা। শুধু বিদেশীর নয় বিজেতার ভাষা। ইংরাজীর সমর্থন করেছিলেন বলে তাঁরা যে কম স্বদেশী বা কম স্বাধীনতাপ্রিয় ছিলেন তা নয়। তাঁরাও কংগ্রেসের লোক। ভোটে দিয়ে দেখা গেল দু'পক্ষের ভোটসংখ্যা প্রায় সমান সমান। হিন্দীর সঙ্গে ইংরেজীর সামান্য একটিমাত্র ভোটের ব্যবধান। এরূপ ক্ষেত্রে হিন্দী ইংরেজী দুটি ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষা করা উচিত ছিল।

এখানে আর একটি কথা পরিষ্কার করে বলতে চাই। আমাদের সংবিধানে কোনো ভাষাকেই 'রাষ্ট্রভাষা' বা 'জাতীয় ভাষা' বলে আখ্যাত করা হয়নি। হিন্দীকে বলা হয়েছে 'সরকারী ভাষা'। সংবিধান যদি সংশোধন করা হয়, তবে ইংরেজীকে বলা হবে 'সহচর সরকারী ভাষা'। 'রাষ্ট্রভাষা', 'জাতীয় ভাষা' ইত্যাদি আখ্যা প্রকৃতপক্ষে সব ক'টি ভারতীয় ভাষারই পাওনা। কোনো একটি ভাষার নয়। হিন্দী যদি সে রকম একটা আখ্যা পেয়ে থাকে, তবে সেটা বিধিসম্মতভাবে নয়। সেটা পাঁচজনের মুখে মুখে। যেমন সুবোধ মল্লিক মহাশয়কে লোকে 'রাজা' বলত। যেমন কংগ্রেস সভাপতিকে লোকে 'রাষ্ট্রপতি' বলত। রাষ্ট্রভাষা বলে হিন্দীর একটা নামডাক হয়েছে। মন্ত্রীরাও তাকে রাষ্ট্রভাষা বলে চালিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সংবিধানে এর কোনো সমর্থন নেই। সুতরাং হিন্দী এমন কিছু হারাচ্ছে না, যা সংবিধান অনুসারে তার প্রাপ্য। আর ইংরেজীও এমন কিছু পাচ্ছে না যার বলে সে রাষ্ট্রভাষা বলে গণ্য হবে। লোকমুখে হিন্দীই থেকে যাবে

একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সংবিধানে তার একটি সহচর সরকারী ভাষা জুটবে। সেটি যদি ইংরেজী না হয়ে উর্দূ কিংবা তামিল হতো তাতেও হিন্দী গোঁড়াদের আপত্তির তরঙ্গ উঠত। ইংরেজীকে যেমন তাঁরা 'বিদেশী' বলে অপাংক্তেয় করতে চান, তেমনি তাকেও করতেন অন্য কোনো ছুতোয়। মোদ্দা কথা শরিক তাঁরা চান না। হলেই বা সে স্বদেশী।

হিন্দী থাকছে, ইংরেজীও থাকবে, ভবিষ্যতে ভাববিনিময়ের ভাষার অভাব হবে না। যাঁরা হিন্দীতে চান তাঁরা হিন্দীতে ভাবা বিনিময় করবেন, যাঁরা ইংরেজীতে চান তাঁরা ইংরেজীতে। যদি বিনিময় করবার মতো ভাব থাকে। যদি সে রকম মনোভাব থাকে। সরকারের কাজকর্মের ভাষা ছাড়া কি ভাববিনিময় হয় না? সংস্কৃতেও হতে পারে। উর্দূতেও।

গান্ধীজী সাধারণত হিন্দীতেই ভাববিনিময় করতেন, কিন্তু জীবনের শেষ-দিনও তাঁকে বাংলা হাতের লেখা তৈরি করতে দেখা গেছে। নোয়াখালীতে ফিরে বাংলায় ভাববিনিময় করতেন। তামিলদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি তামিল ভাষা শিখেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতে। পশ্চিমা মুসলমানদের সঙ্গে ভাববিনিময়ের জন্যে তিনি উর্দূতেও কথা বলতেন। রথীবাবুর সঙ্গে, আমার সঙ্গে তিনি ইংরেজীতে কথা বললেন ১৯৪৫ সালে। ভাববিনিময় একটিমাত্র ভাষায় হবে—হিন্দীতে—এমন অদ্ভুত ধারণা তো গান্ধীজীর ছিল না।

এই প্রসঙ্গে একটি মজার গল্প মনে পড়ল। বছর কয়েক আগে স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতভাষী সুধীদের এক সম্মেলন হয়। আমাদের এক বিশিষ্ট অধ্যাপক গেছলেন যোগ দিতে। ফিরে এসে বললেন, আলোচনা হলো—কোন্ ভাষায়, বলুন তো? ইংরেজীতে!

আর একটা মজার গল্প বলি। পাঞ্জাবে সেদিন দারুন বচসা বেধে গেল। খোঁপা আর এলোচুলে নয়, পাঞ্জাবীতে আর হিন্দীতে। তামাশা এই যে, দু'পক্ষেরই বাক্যবাণ বর্ষিত হলো উর্দূ সংবাদপত্রে। মামলার ভাষা হলো উর্দূ। মনে আছে ছেলেবেলায় আমি একবার লালা লাজপৎ রায়ের 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকার নমুনা চেয়ে পাঠাই। পত্রিকা দেখে আমার চক্ষুঃস্থির। হিন্দী নয়, ইংরেজী নয়, উর্দূ। যেখানে উর্দূ উভয়ের জানা সেখানে ভাবাবনিময়ের ভাষা উর্দূ হওয়াই স্বাভাবিক। স্কুল কলেজে যিনি যাই পড়ুন না কেন দেখা হলে হিন্দুতে আর শিখে বাতচিৎ হয় উর্দূতেই।

সরকারী ভাষা বলে গণ্য না হলেও উর্দুতেই পশ্চিমা হিন্দু ও শিখদের স্বাচ্ছন্দ্য আমি অনেকবার লক্ষ করেছি। তেমনি সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃত না হলেও ইংরেজীর কদর এদেশে দীর্ঘকাল থাকবে। কেন থাকবে তার একশ কারণ। জাতীয়তাবাদীরা যত সহজে ইংরেজকে হটিয়েছেন, তত সহজে ইংরেজীকে অচলিত করতে পারবেন না। কাজেই সে চেষ্টা না করাই ভালো। স্বাধীনতার পরে আমাদের গ্রামে গ্রামে হাইস্কুল হয়েছে। লোকে চায় হাই স্কুল। টোল নয়, মাদ্রাসা নয়, বুনিয়াদী নয়, বিশুদ্ধ বাংলা বিদ্যালয় নয়, সেই সেকালের মতো হাই স্কুল। কিংবা টেকনিক্যাল স্কুল। কলেজের সংখ্যাও বাড়ছে। যেখানে মাধ্যম হিসাবে ইংরেজী উঠে যাচ্ছে সেখানেও বিষয় হিসাবে ইংরেজী থেকে যাচ্ছে। এটাও জনগণের ইচ্ছায়।

ইংরেজীর কাজ হবে স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেওয়া বা ঠিক করতে সাহায্য করা। সে কাজ হিন্দীর দ্বারা হতে পারে না। সামনের দশ বিশ বছরে তো নয়ই, এই শতাব্দীতে নয়। একবিংশ শতাব্দীর ভাবনা একবিংশ শতাব্দী ভাববে। আমরা যারা বিংশ শতাব্দীতে বাস করছি তাদের ভাবনা বিংশ শতাব্দীকেই ঘিরে। যতদূর দেখতে পাচ্ছি ইংরেজীর প্রয়োজন থাকবে। সে প্রয়োজন প্রশাসনঘটিত নাও হতে পারে। বাংলাদেশ যদি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হতো তা হলে আমরা কেউ ইংরেজীকে সরকারী ভাষা বা তার সহচর করতুম না। সব যুক্তিকে খারিজ করত সেন্টিমেণ্ট। বাংলাভাষাই হতো রাষ্ট্রভাষা। কিন্তু সেরূপ ক্ষেত্রেও ইংরেজীর প্রয়োজন ফুরোত না। লোকে ইংরেজীকে চাইত বাংলার স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক করে দেবার জন্যে। সৃষ্টির ও সমালোচনার আদর্শ চোখের উপর তুলে ধরার জন্যে। ইংরেজের যুগ গেছে, ইংরেজীর যুগ যায়নি। আরো আধ শতাব্দী থাকবে।

কিন্তু তাই বা কেমন করে বলি? খাস ইংরেজের দেশে ইংরেজী যদি পেছিয়ে পড়ে, তেমন বড় লেখক যদি না জন্মান, বইগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, সাময়িকপত্রগুলো যদি হয় অন্তঃসারশূন্য, খবরের কাগজগুলো যদি হয় বিশেষত্বহীন, সেই জ্বলন্ত বিবেক যদি নিবে আসে, চিন্তার স্বাধীনতা যদি চোরাবালিতে ঠেকে যায় তা হলে অর্ধ শতাব্দীকাল কে একটা মরা সাহিত্য কাঁধে করে বেড়াবে? ইংরেজী যদি বাংলাকে বা হিন্দীকে এগিয়ে দিতে না পারে তবে ইংরেজীর অবস্থানকাল আধ

শতাব্দীও নয়। আরো আগে তার উপর থেকে লোকের মন উঠে যাবে। মানুষকে জোর করে ইংরেজী শেখানোর আমি পক্ষপাতী নই। ইংরেজী যে অবশ্যশিক্ষণীয় বিষয় হয়েছে এটাও আমার মতে অনুচিত। ছেলেরা যদি ইংরেজী শিখতে না চায় না শিখবে। না শিখলে পরে পশতাবে। নিজেদের ছেলেমেয়ে হলে তদের বলবে অমন ভুল না করতে। কতক লোকের পশতানো দরকার। আজকাল মাড়োয়ারীর ছেলেরা মন দিয়ে ইংরেজী শেখে। বাঙালীর ছেলেরা ফাঁকি দেয়॥

ইংরেজীর পেছিয়ে পড়া যেমন অসম্ভব নয় হিন্দীর এগিয়ে যাওয়াও তেমনি সম্ভবপর। এক পুরুষের মধ্যে হিন্দীর অসাধারণ উন্নতি হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে উর্দূকে আত্মসাৎ করতেও পারে। দেবনাগরী লিপি ছাড়া অন্যান্য লিপিতে কি হিন্দী লেখা যায় না, ছাপা যায় না? রোমক লিপিতে ছাপা হলে হিন্দী বই কাগজ আরো চলবে। বাংলা লিপিতে ছাপলে বাঙালীরা অনায়াসে পড়বে। কতক হিন্দী :বই কাগজ একাধিক লিপিতে ছেপে পরীক্ষা করা উচিত পাঠকসংখ্যা কী পরিমাণ বাড়ে। অনেকে দেবনাগরীর ভয়ে হিন্দীর দিকে ঘেঁষতে চায় না। তাদের উপর জোরজুলুম করে যেটুকু ফল হবে তার চেয়ে ঢের বেশী হবে বিভিন্ন লিপিতে হিন্দী বই কাগজ ছেপে। তার পর হিন্দীর ব্যাকরণ আরো সরল হওয়া চাই। পশুপাখির কার কী লিঙ্গ তাই আমাদের জানা নেই। শব্দমাত্রেরই লিঙ্গ থাকবে ও আমরা তা জানব, এ কী জ্বালা!

শেষ কথা, ইংরেজীর দীপশিখা নিবে গেলেই যে হিন্দীর দীপশিখার, বাংলার দীপশিখার, অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির দীপশিখার দেওয়ালি হবে এটা একপ্রকার নঞর্থক চিন্তা। বরং ইংরেজীর দীপ যতক্ষণ জ্বলছে জ্বলতে দাও, তার সাহায্যে নিজেদের দীপ জ্বালিয়ে নাও। ফুঁ দিয়ে তাকে অকালে নিবিয়ে দিলে পরে হয়তো দেখবে নিজেদের দীপও নিবু নিবু। দেওয়ালি হবে, না কালীপূজা হবে, কে এখন থেকে ভবিষ্যদ্বাণী করবে?

মাতৃভাষা

হায়দরাবাদে আপনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন তা "মাতৃভাষা" নামক পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ও তার এককপি আপনি আমাকে সাদরে উপহার দিয়েছেন। এর জন্যে যদি আমি ধন্যবাদ দিই তা হলে সেটা মামুলী শোনাবে। আমাদের সম্পর্ক আরো গভীর।

শিক্ষার মাধ্যম যে মাতৃভাষাই হওয়া উচিত এটা আপনার বহুকালের মত। আপনার পুরোনো মতই আপনি নতুন করে ব্যক্ত করেছেন। ভুল বোঝার কোনো অবকাশ রাখেননি। অথচ এই নিয়ে ভুল বোঝারও বিরাম নেই। অনেক কটু কথাই আপনাকে শুনতে হচ্ছে। আরো শুনতে হবে। কারণ আপনি একটা বিতর্কের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। বিতর্কটা যদি শুধুমাত্র শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে হতো তা হলে তা অত তীব্র হতো না। তার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে আরো পাঁচটা প্রশ্ন। এই প্রশ্নগুলোকে এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারা যায় না।

বাংলা, ওড়িয়া প্রভৃতি মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ইংরেজদের আমলেও ছিল। যারা ডাক্তারি পাশ করত তাদের বলা হতো ভি এল এম এস। ছেলেবেলায় এ রকম ডাক্তার জনা তিনেক দেখেছি। তখনকার দিনে যাকে মাইনর পাশ বলা হতো তার একটা স্বদেশী সংস্করণও ছিল। তার নাম মিডল ভার্নাকুলার। এম ভি পাশ করে কেউ কেউ হাই স্কুলে আসত। তাদের বসিয়ে দেওয়া হতো কয়েক ক্লাস নিচে। তারা ইংরেজী শিখে নিয়ে পরে প্রমোশন পেতো।

তাছাড়া ছিল মাদ্রাসা, মক্তব ও টোল। এখনো আছে। জনগণকে আপনি ইচ্ছা করলে মাদ্রাসায়, মক্তবে ও টোলে পড়াতে পারেন। সেসব ভার্নাকুলার স্কুল, ভার্নাকুলার মেডিক্যাল স্কুল অন্য নামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন। মাতৃভাষায় শিক্ষাদানই যদি উদ্দেশ্য হয় তবে আজ এই মুহূর্তেই কোটি কোটি বালক বালিকাকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করতে পারা যায়। এর জন্যে শুধু এইটুকু করলেই যথেষ্ট হবে যে শিক্ষকদের বা অধ্যাপকদের নির্দেশ দেওয়া হবে ইংরেজী বই দেখে মাতৃভাষায় পড়াতে ও পরীক্ষকদের নির্দেশ দেওয়া

হবে মাতৃভাষায় প্রশ্ন করতে, উত্তরপত্র পরীক্ষা করতে। পরে ইংরেজী বইয়ের বদলে মাতৃভাষায় বই লিখিয়ে নেওয়া হবে।

কিন্তু আপনার ভার্নাকুলার স্কুলের বা কলেজের সঙ্গে সঙ্গে যদি এক সার ইংরেজী স্কুল বা কলেজ থেকে যায়, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে যদি সেসব প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পায়, তা হলে দেখবেন তাদেরই বাজারদর ও ও সামাজিক মর্যাদা বেশী। স্বাধীনতার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ জনগণের জন্যে মাতৃভাষার মাধ্যম বরাদ্দ করেছে। কিন্তু ইংরেজী মাধ্যম নিষেধ করে দেয়নি। কলকাতা শহরেই অনেকগুলি নতুন স্কুল হয়েছে, সেখানে ইংরেজীতে পড়ানো হয়। চার গুণ খরচ, তবু ছেলেমেয়েদের ভীড়। বিহারে তো হিন্দীর জয়জয়কার। কিন্তু মিশনারীদের স্কুল কলেজের সংখ্যা বেড়ে গেছে। বাপ মা হিন্দীর অধ্যাপক অধ্যাপিকা, মেয়েকে দিয়েছেন কন্‌ভেণ্ট স্কুলে। কটক থেকে এক মন্ত্রী এসেছিলেন শান্তিনিকেতন দেখতে। বললেন তাঁর দুই ছেলেকে তিনি দিয়েছেন দিল্লীতে, কোনো এক ইংরেজী মাধ্যম স্কুলে।

ইদানীং শান্তিনিকেতনের পাঠভবনে বাংলা মাধ্যমের সঙ্গে সমান্তরাল-ভাবে ইংরেজী মাধ্যমও প্রবর্তিত হয়েছে। যারা দূর থেকে আসবে তাদের জন্যে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বাংলা মাধ্যমে এতকাল যারা পড়ে এসেছে তাদের কেউ কেউ এক বছর লোকসান দিয়েও ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে চায়। কেন এই দুর্মতি? বাঙালীর মেয়ে কেন বাংলা মাধ্যম ছেড়ে ইংরেজী মাধ্যম বরণ করে? আমার মেয়ে নয়, আমি এর উত্তর দিতে পারিনে।

আপনি বৈজ্ঞানিক মানুষ। তথ্য নিয়ে আপনার কারবার। তথ্য হচ্ছে এই যে, বালক বালিকাদের মধ্যেও দু'মত দেখা যায়। তাদের গুরুজনদের মধ্যেও। ইংরেজী মাধ্যম অস্বাভাবিক ও ব্যয়সাপেক্ষ। তা সত্ত্বেও বাপ মা ছেলেমেয়েকে কন্‌ভেণ্ট স্কুলে পাঠান, মিশনারী স্কুলে দেন, ক্ষমতায় কুলোয় তো দেরাদুনে রাখে। আপনি হয়তো ভাবছেন এঁরা ইঙ্গবঙ্গ। না, এঁরা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী, কেউ কেউ সাম্যবাদী। কারো কারো মতবাদ সাম্প্রদায়িক। ইংরেজের উপর যারা হাড়ে হাড়ে চটা ইংরেজীর উপর তাদের অন্ধ নির্ভরতা। তাদের বিশ্বাস ইংরেজী ধরণের শিক্ষাই সত্যিকার শিক্ষা, দেশী ধরণের শিক্ষা তারই একটা সুলভ সংস্করণ। যেমন ছিল সেকালের সেই ভি এল এম এস।

জোর জবরদস্তি করে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল কলেজ উঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা যদি না করেন, যদি "বাঁচো আর বাঁচাও" নীতি মেনে সেগুলিকেও টিকে থাকতে দেন, তা হলে দেখবেন হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী সেই সব স্কুল কলেজেই পড়তে চাইবে। ইংরেজীতে পাঠ্যপুস্তক অসংখ্য। মাতৃভাষায় অত নয়। সুতরাং শিখঁবেও তারা বেশী। যতদিন না গায়ের জোরে ইংরেজী মাধ্যমের মূলোৎপাটন হচ্ছে ততদিন কতক লোক ওর পক্ষপাতী ও পৃষ্ঠপোষক থেকে যাবেই। প্রতিযোগিতায় তাকে হটানো সহজ নয়। বরং প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে সে-ই সহায়।

যে দেশে হিন্দীভাষীর সঙ্গে তামিলভাষীব প্রতিযোগিতা, বঙ্গভাষীর সঙ্গে উর্দূভাষীর প্রতিযোগিতা সে দেশে ইংরেজীকে কতক লোক শত্রু না ভেবে মিত্র ভাববেই। জাপানে বা জার্মানীতে এ সমস্যা নেই, কারণ ভাষা তাদেব আমাদের মতো চোদ্দ পনেরোটা নয়, একটাই। জাপানের বা জার্মানীর উদাহরণ আমাদের জনগণের কাজে লাগতে পারে, তারা প্রতিযোগিতায় নামে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে প্রতিদিন প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। কতরকম পরীক্ষায় পাশ করতে হয়। চাকরিতে বহাল হতে হয়। চাকরি রাখতে হয়। প্রমোশন আশা করতে হয়। মাতৃভাষার মাধ্যম বড় জোর পশ্চিমবঙ্গে ফলপ্রদ হবে, কিন্তু সারা ভারতে? হিন্দীভাষীরা এর উত্তরে বলবেন, হিন্দীই জনপথ তথা রাজপথ। সবাইকে হিন্দী মাধ্যম মেনে নিতে হবে। কিন্তু হিন্দী কি বাঙালীর মাতৃভাষা? তামিলের মাতৃভাষা? ইংরেজী মাধ্যমের পরিবর্তে হিন্দী মাধ্যম প্রবর্তন কি মাতৃভাষায় শিক্ষাদান এদের বেলা?

প্রতিযোগিতার বালাই যাদ না থাকত, প্রতিযোগিতার পরিসর যদি ভারতব্যাপী না হতো, তা হলে যে যাঁর মাতৃভাষায় উচ্চতম শিক্ষালাভ করলে ভালোই হতো। কিন্তু আমরা জানি যে উচ্চ শিক্ষার প্রতি ধাপেই প্রতিযোগিতা। শিক্ষা শেষ হলে চাকরির জন্যে প্রতিযোগিতা। চাকরি জুটে গেলে প্রমোশনের জন্যে প্রতিযোগিতা। সুতরাং প্রতিযোগিতার উপর দৃষ্টি রেখেই পড়াশুনা করতে হয়। জনগণের জীবনে এ সমস্যা নেই। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনে তো আছে। এই শ্রেণীটা যতদিন থাকবে, এ সমস্যা যতদিন থাকবে, ততদিন শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে দ্বিমত অনিবার্য। একদল তর্ক করবেন ইংরেজী রাখার পক্ষে, আরেক দল ইংরেজী হটানোর পক্ষে। তবে এটাও দেখছি যে অন্যতম শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে ইংরেজী সকলের কবুল।

আমি জোর জবরদস্তির সমর্থন করব না। আমি বলব, এক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটা মাধ্যম হোক। কোনোটার তামিল, কোনোটার তেলেগু, কোনোটার হিন্দী, কোনোটার বাংলা। সেই সঙ্গে কোনো কোনোটার ইংরেজী। যাদের বদলির চাকরি তাদের ছেলেমেয়েরা ইংরেজী পছন্দ করবে। সারা ভারতে যদি চারটে ইংরেজী মাধ্যমের বিশ্ববিদ্যালয় থাকে ও তাদের অধীনে চার সেট স্কুল কলেজ থাকে তাহলেই যথেষ্ট। বিশ ত্রিশ বছর পরে লোকে ফল দেখে বুঝবে ইংরেজী মাধ্যম ভালো কি মন্দ। যদি ভালো হয়ে থাকে তাহলে আরও কিছুকাল থাকবে। বরাবরও থেকে যেতে পারে। ইংরেজীর অপরাধ তো এই যে ওটা বিদেশী ভাষা। আরবী ফারসীরও সেই একই অপরাধ, উর্দুর অপরাধও তার কাছাকাছি যায়। "বিদেশী" বিশেষণটা শিক্ষার ক্ষেত্রে বড়ই শ্রুতিকটু। বিদেশীর কাছে যদি শেখবার থাকে তবে শিখতে হবে চাই কি আরো পঞ্চাশ বছর।

ছাব্বিশে জানুয়ারীর প্রশ্ন

জাতীয় সংহতির কথা যখন আমরা ভাবি তখন আমাদের মনে থাকে না যে ভারত একটি তৈরী 'নেশন' নয়। যেমন জাপান একটি তৈরী 'নেশন'। ভারতবর্ষের ইতিহাসে সাম্রাজ্য বহুবার গড়ে উঠেছে বহুবার ভেঙে পড়েছে। কিন্তু 'নেশন' এর আগে হয়নি। এই প্রথম। এই নবজাতকের সঙ্গে আমাদের পরিচয় মাত্র সতের বছরের। আমাদের চোখের সামনে এই শিশু ধীরে ধীরে বাড়ছে। এর বিকাশে আমাদেরও কিছু হাত আছে। আমরা যদি একে সুশিক্ষা দিই এ সুশিক্ষিত হবে। যদি কুশিক্ষা দিই তবে কুশিক্ষিত হবে। আমরা যদি সতর্ক না থাকি তা হলে এ অবোধ হয়তো একদিন আগুনে হাত দিয়ে হাত পোড়াবে, মুখ পোড়াবে। তা বলে একে সব সময়ে বেঁধে রাখতেও চাইনে। একে স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করতে দিতে হবে। ভুলভ্রান্তির ঝুঁকি নিতে হবে। শুধু দেখতে হবে যে সেটা মারাত্মক ভুল নয়। নেশন' যাতে ভেঙে না যায়, যাতে 'ডিক্টেটার'-এর কবলে না পড়ে, যাতে জার্মানীর মতো যুদ্ধে নেমে বিভক্ত না হয়। যাতে নিজের হাতে নিজের গলা না কাটে, অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর না হয়—বাইরে অক্ষত থেকে ভিতরে ভিতরে ফোঁপরা না হয়ে যায়।

তারপর আমাদের মনে থাকে না যে ভারত একটি ঐককেন্দ্রিক 'নেশন' নয়। যেমন ইতালী একটি ঐককেন্দ্রিক 'নেশন'। এ দেশে যতগুলি ভাষা ততগুলি কেন্দ্র। এ দেশের এক একটি ভাষা ইউরোপের এক একটি ভাষার সঙ্গে তুলনীয়। যেমন ইংরেজী ফরাসী জার্মান রাশিয়ান তেমনি হিন্দী উর্দু বাংলা তামিল। কোন কোনটি ইংরেজী ফরাসীর চেয়েও প্রাচীন। বাংলা তো এখন অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা। ভারতের ভাষাগুলিকে 'আঞ্চলিক ভাষা' বলে আখ্যায়িত করা সমীচীন নয়। কারণ এটা সত্য নয়। অসত্যের উপর দাঁড় করালে একটা 'নেশন' দাঁড়াতে পারে না। জাতীয় সংহতি যত বড়ই হোক না কেন সত্য তার চেয়েও বড়। সত্য এ ক্ষেত্রে এই যে, ভারত একটি বহুকেন্দ্রিক 'নেশন', একটি বহুসেলবিশিষ্ট প্রাণী। এর এক একটি ভাষা এক একটি স্বর। ভারত যেন একটি সপ্তস্বর। অনেকগুলি স্বাধীন ও তন্ত্র ভাষাগোষ্ঠী মিলে একটি মহাগোষ্ঠী রচনা করবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে।

কেউ 'আঞ্চলিক' নয়। সকলেই 'রাষ্ট্রিক' বা জাতীয়'। কোন একটিকে বেছে নিয়ে রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা বলে বিশেষ মর্যাদা দিলে জাতীয়তার বুনিয়াদ শক্ত হয় না দুর্বল হয় এ প্রশ্নের উত্তর একদিন দিতে হবে। ভারতের ইতিহাসের গতি নির্ভর করছে এর সত্যনিষ্ঠ উত্তরের উপরে।

রবীন্দ্রনাথ যখন বাংলা ভাষায় লিখতেন তখন তিনি সেই সূত্রে ভারতীয় ভাষায় লিখতেন। সে ভাষাকে ইংরেজরা হয়তো 'ভার্নাকুলার' বলে ইংরেজীর তুলনায় খাটো ভাবতো। আমরা তা ভাবতুম না। তাই 'ভার্নাকুলার' শব্দটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছি। প্রতিবাদের ফলে সে শব্দটি পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তার বদলে এসে জুটেছে 'আঞ্চলিক' বলে দেখতে শুনতে নিরীহ আর একটি শব্দ।

একদা আমাদের ভাবা ছিল ইংরেজীর নিরিখে 'ভার্নাকুলার'। এবার হয়েছে হিন্দীর নিরিখে 'আঞ্চলিক'। এর গভীরে যেতে হবে। একটা দেশে একাধিক ভাষা থাকবে এটা এমন কিছু আশ্চর্য ব্যপার নয়। তা বলে কোন একটি হবে সে দেশের 'জাতীয় ভাষা' আর বাদ বাকী 'আঞ্চলিক'? ঐ শর্তে কোথাও কোন 'নেশন' গড়ে ওঠার খবর কেউ শুনেছেন?

কানাডার মতো সুপ্রতিষ্ঠিত দেশেও আজ রব উঠেছে কুইবেক পৃথক হতে চায়। কেন হঠাৎ এ খেয়াল হোল? কারণ কুইবেকের লোক ফরাসীভাষী। আর সকলে ইংরেজীভাষী। কথা ছিল ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীকেও কেন্দ্রীয় সরকারে স্থান দেওয়া হবে। কার্যত যা হয়েছে তাতে ফরাসীভাষীরা সুখী নয়। ইংরাজীভাষীদের ফরাসী শিখতে চাড় নেই, অথচ ফরাসীদের ইংরেজী না শিখলে নয়। গরজটা যেন এক পক্ষেরই। অপর পক্ষের নয়। অবিকল এই ব্যাপারটি দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের উত্তর ও দক্ষিণে। কথা ছিল স্কুলগুলিতে মাতৃভাষা, মাতৃভাষা ভিন্ন আর একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষা ও ইংরাজী শেখানো হবে। সেই অবসরে দক্ষিণ ভারতে মাতৃভাষ, হিন্দী ও ইংরেজী শেখানো হচ্ছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের ছেলেদের শেখানো হচ্ছে মাতৃভাষা, সংস্কৃত ও ইংরেজী। বলা বাহুল্য সংস্কৃত একটি আধুনিক ভাষা নয়। সংস্কৃত শিক্ষারও প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার জন্যে যদি একটি আধুনিক ভারতীয় ভাষাকে বাদ দিতে হয় তবে দক্ষিণ ভারতও তো হিন্দীকে বাদ দিতে পারে, ওর বদলে সংস্কৃতকে ত্রিভাষার অন্তর্গত করতে পারে। মোদ্দা কথা, হিন্দীভাষীরা জানে যে, তামিল বা তেলেগু না শিখলেও তাদের

চলে, শিখলেও যে তাদের বিশেষ কোন লাভ হবে তা নয়। জাতীয় সংহতির অনুরোধে নিছক ত্যাগস্বীকারে তাদের রুচি নেই। কারই বা আছে? দক্ষিণীদেরও কি আছে? তারা যদি হিন্দী শেখে তো সেটা অনেকটা জীবিকার দায়ে। কিন্তু সবাই তো সরকারী চাকরি করবে না। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি করে আরও কম লোক। তাহলে জাতীয় সংহতির কী উপায়?

ভাষা নিয়ে মীমাংসা এখানে হয়নি, ওভাবে হবেও না। সামনের ছাব্বিশে জানুয়ারী তারিখে ইংরেজীকে 'রিপ্লেস' করতে গিয়ে কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দী প্রভৃতি ভাষা যে নতুন অধ্যায়টি আরম্ভ করতে যাচ্ছে সেটি 'শুভায়' কি না ভবিতব্য জানে। ইংরাজী তো চলল, কিন্তু তার ছেড়ে যাওয়া জমিতে দখল নিতে যারা আজ এখনি উদ্যত তারা নিজেদের মধ্যে একমত না হলে পরে এর লাঠি ওর পিঠে পড়বে।

ছাব্বিশে জানুয়ারী উত্তর

ইংরেজ ও মার্কিন একই ভাষায় কথা বলে। তবু তারা এক নেশন নয়। এককালে তাদের একই শাসনব্যবস্থা ছিল, একই সৈন্যদল ছিল, একজনই মাথা ছিলেন। তবু তারা পৃথক হয়ে গেল। তা হলে দেখা যাচ্ছে ভাষাগত ঐক্যই চূড়ান্ত নয়। আমরা যে হিন্দীকে আমাদের একমাত্র সরকারী ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা বা জাতীয় ভাষা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ২৬ শে জানুয়ারি ১৯৬৫ দিন ধার্য করেছিলুম এটার মূলে ছিল ভাষাগত ঐক্যের উপর বিশ্বাস। অথচ সেই দিনটিতেই কিনা দক্ষিণ ভারতে এক ব্যক্তি অনলে আত্মাহুতি দিলেন।

তার পর থেকে দক্ষিণে আগুন জ্বলছে। ইতিমধ্যে আরো তিনজন আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করেছেন, এছাড়া এক ব্যক্তি বিষপান করে আত্মঘাতী হয়েছেন। পুলিশের গুলী মিলিটারির গুলী ইত্যাদির কথা না হয় ছেড়েই দিলুম। এই যে সতীর আত্মাহুতি তথা দক্ষযজ্ঞ চলেছে এটা নিশ্চয়ই ভাষাগত ঐক্যের উপর বিশ্বাস দৃঢ় করছে না। বরং ওই তত্ত্বটাকেই খণ্ডন করছে যে ভারতীয় নেশনকে একদিন এক ভাষায় কথা বলতে হবে।

ভুল। ভুল। মস্ত বড়ো ভুল এই ধারণা। কাজকর্ম চালানোর জন্যে একটা সরকারী ভাষা দরকার হতে পারে, কিন্তু সেটার সঙ্গে ভাবগত ঐক্যের সম্পর্ক কতটুকু? ভাবগত ঐক্যের জন্যে চাই একই ভাবের ভাবুক হওয়া। স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন চলছিল তখন আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বা হিন্দীতে বা অন্য ভাষায় কথা বলেছি। অন্তরে অন্তরে ঐক্য বোধ করেছি। কেউ কাউকে বাধ্য করি নি অপরের ভাষায় কথা বলতে। স্বাধীনতার জন্যে আবেগ আমাদের একাত্ম করেছিল। কে কোন্ ভাষায় কথা বলছে এইটাই ছিল তুচ্ছ। কী বলছে এইটেই ছিল মুখ্য। এখন আমরা মুখ্যটাকেই গৌণ করেছি। তাই রাষ্ট্রপতিকেও হুকুম করি, হিন্দীমে বোলিয়ে! দক্ষিণের লোকের মনে লাগবে না?

সুইটজারল্যাণ্ডের লোক এখনো কোনো একটি ভাষাকে ঐক্যের বাহন করে নি। অথচ তাদের মতো একপ্রাণ একতা দেখা যায় না। তিন তিনটে ভাষাকে সমান মর্যাদা দিয়েও তাদের কাজকর্ম চলে যাচ্ছে।

তারা তেভাগা হয়ে যাচ্ছে না। কিন্তু সমান মর্যাদা না দিলে ওরাও বিদ্রোহ করত, গৃহযুদ্ধে জর্জর হতো, স্বাধীনতা হারাত। নেশনমাত্রকেই এক ভাষায় কথা বলতে বা ভাব বিনিময় করতে হবে সুইসরা এ তত্ত্বে বিশ্বাস করে না।

নেশন সৃষ্টির মূলে ভাষা নয়। নেশন সৃষ্টির মূলে আবেগ। যারা চোদ্দটা প্রধান ও অসংখ্য অপ্রধান ভাষায় কথা বলে তারাও একই আবেগ অনুভব করার ফলে এক নেশন হতে পারে। আমরা একটা মহৎ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছি। অথচ সেই আমরাই আজ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের অন্ধ ধারণার যূপে আপনাকে বলি দিচ্ছি। কত বড়ো একটা বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয় চলেছে আমাদের চোখের সামনে!

কেন এ রকম হলো? এর কারণ আমি যতদূর বুঝি বলছি। ইংরেজ যখন চলে যায় তখন প্রশ্ন ওঠে, কে বড়ো? কে ছোট? ভারতবর্ষে মুসলমান ছোট হতে নারাজ হয়। পাকিস্তানে বাংলা দেশের সবটা গেলে হিন্দু ছোট হতে নারাজ হয়। অগত্যা ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। এবার চলে যাবার পালা ইংরেজী ভাষার। বহু লোকের এর উপরে রাগ। এটা বিদেশী ভাষা, বিজেতার ভাষা। এর যাত্রার জন্যে নোটিশ দেওয়া হলো ২৬শে জানুয়ারি ১৯৬৫। তখন আর এক দফা প্রশ্ন উঠল, কে বড়ো? কে ছোট? ভারতীয় ইউনিয়নে তামিল ছোট হতে নারাজ। বংলা ছোট হতে নারাজ। অথচ আবার দেশটাকে খণ্ড-বিখণ্ড করতেও কারো উৎসাহ নেই। দেখেছে তো তার পরিণাম। হিন্দীর হাত থেকে নিস্তার নেই। তার কাছে মাথা হেঁট করে থাকতেই হবে। এই যে জ্বালা এই জ্বালায় মানুষ জ্বলেপুড়ে মরছে।

জ্বালাটা আঁচতে পেরে কর্তারা ভালোমানুষের মতো বলছেন, "আহা। আমরা তো সত্যি সত্যি ইংরেজীকে চলে যেতে বাধ্য করছিনে। নোটিশ দিয়েছিলুম তা ঠিক। কিন্তু তোমাদের যাতে অসুবিধে না হয় তার জন্যে সব কিছু বন্দোবস্ত ও করেছি। লেকিন তোমরা ভুল বুঝলে হামরা কী করব।" ভুল বোঝার কোনো রাস্তাই নেই। সংবিধান অতি পরিষ্কার ভাষায় বলেছে হিন্দী হলো ইউনিয়নের একমাত্র সরকারী ভাষা। তার মানে আর সব ভারতীয় ভাষার মাথার উপরে তার স্থান। ইংরেজী আরো কিছুদিনের জন্যে থাকবে তার সহযোগীরূপে। সরকারের সঙ্গে কারবারে তার ফলে

অসুবিধে কম হবে, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে তামিল বাংলা প্রভৃতি অন্যান্য ভাষার পোজিশন কী হবে? এরা কি সামন্ত রাজার মতো অঙ্গরাজ্য শাসন করেই সন্তুষ্ট থাকবে? উচ্চতম মহলে এদের প্রবেশ নিষেধ হবে? সেখানে শুধু হিন্দী ও তার সহযোগী?

"যতদিন তোমরা চাইবে ততদিন তোমাদের সুবিধের জন্যে ইংরেজী থাকবে।" আশ্বাস দিচ্ছেন কর্তারা। তামাশা মন্দ নয়। আমরাই বা কেন একটা বিজাতীয় ভাষাকে আঁকড়ে ধরে থেকে কম জাতীয়তাবাদী বলে হাতে নাতে ধরা পড়তে যাব? এটা তো খুব অদ্ভুত কথা সে জাতীয়তাবাদের পুরোধাদেরই হিন্দী না শিখলে ইংরেজী শিখতে হবে। তাই যদি হলো তবে ইংরেজী তো থেকেই গেল। সে গেল কোথায় যে তার যাত্রার জন্যে দিন স্থির করার দরকার ছিল? কর্তারাই যেন হাত জোড় করে ইংরেজীকে বলছেন, "এ ভাই আংরেজী, তুমি আজ এখনি যেয়ো না। তুমি গেলে দাউ দাউ করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠবে। তুমি থাকলে আমাদেরও সুবিধে। আমরা তোমাকে দরজায় খাড়া রেখে ভিতরে ভিতরে সব কাজ গুছিয়ে নেব। কেবল চার পাঁচটি অঙ্গরাজ্যে নয় ইউনিয়ন গবর্নমেণ্টের সিভিল ও মিলিটারি যাবতীয় দপ্তরে হিন্দী চালু করে নেব। তার পর তোমাকে আর কষ্ট করে খাড়া থাকতে হবে না। তুমি আস্তে আস্তে স্বস্থানে প্রস্থান করবে। যেখান থেকে এসেছিলে।"

খুড়োর গঙ্গাযাত্রা যে কতকাল জুড়বে তা কেউ বলতে পারে না। অনির্দিষ্টকাল এই বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে বাস করবে। এক পা গঙ্গার জলে ডুবিয়ে রাখবে, কে জানে কখন নাড়ী ছেড়ে যায়! ততকাল আমরা সকলে এরই আর একটা পা ধরে জাতীয় ঐক্যের সাধনা করতে থাকব। এইভাবেই ভারতীয় জাতি কায়মনোবাক্যে সুসংহত হবে। যথাকালে খুড়ো পঞ্চত্ব পাবেন। ততদিনে আমরা সবাই হিন্দীতে বাতচিৎ করতে শিখে থাকব। আঠারো কোটি লোকের মাতৃভাষা সাতাশ কোটি লোকের ভাব বিনিময়ের ভাষা হয়ে থাকবে।

সে যে কবে হবে তা সাতাশ কোটি লোক বা তাদের প্রতিনিধিরাও কি জানেন? আজ আমরা যেটা দর্শন করছি সেটা ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। উত্তরে দক্ষিণে এমন আড়াআড়ি বেধে গেছে যে সহজে তার নিষ্পত্তি নেই। বেচারা আওরাংজেবকে শেষজীবনটা দক্ষিণ ভারতেই কাটাতে হয়েছিল।

সেইখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। উদ্দেশ্য তাঁর ছিল সাধু। ভারতবর্ষকে তিনি একচ্ছত্রাধীন করতেই চেয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদীমাত্রেরই যেটা মনের কথা। তার জন্যে বাদশাহী সৈন্যদলকে দক্ষিণেই আটকা পড়তে হয় বছরের পর বছর। তবু তো সে সময় চীনের দিক থেকে বিপদের আশঙ্কা ছিল না।

বরণ করে নেবার স্বাধীনতা দিলে হিন্দীকে যারা যোগাযোগের ভাষারূপে বরণ করবে তাদের নাম উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ ও দিল্লী। তাদের সঙ্গে যোগ দেবে গুজরাত ও মহারাষ্ট্র। পাঞ্জাব এ বিষয়ে দ্বিমত হতে পারে, পাঞ্জাবীভাষীরা হিন্দীভাষীদের উপর বিরক্ত। কাশ্মীর চাইবে উর্দু, কিন্তু সেটার নাম কেউ করছেন না। সুতরাং কাশ্মীরী ভাষীরাও দ্বিমত হতে পারে। বাদবাকী যতগুলি রাজ্য বা ইউনিট আছে তাদের যদি বরণের স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে তারা ইংরেজীকেই বরণ করবে। তাদের নাম মাদ্রাজ, মহীশূর, কেরল, অন্ধ্র, উৎকল, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, নেফা, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর, ত্রিপুরা, আন্দামান, পণ্ডিচেরী, গোয়া। তা যদি হয় তো অধিকাংশই ইংরেজীর পক্ষে।

যে রাষ্ট্রের অধিকাংশ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইংরেজীকেই রাখতে চায় সে রাষ্ট্রের সরকারী ভাষা প্রধানত হিন্দী হলে লোকের অসহ্য হতো না। কিন্তু সংবিধানে লেখা আছে একমাত্র হিন্দী। তবু যদি সরকারী ভাষা হয়েই হিন্দী ক্ষান্ত হতো। তার তরফ থেকে দাবি করা হচ্ছে সে হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, একমাত্র জাতীয় ভাষা, শুধু তাই নয় সে নাকি রাজভাষা। আমাদের এই প্রজাতন্ত্রে রাজভাষা থাকবে কেন? রাজভাষা যদি থাকে তো রাণীভাষাও থাকা উচিত। নইলে রাজা একা নিঃসঙ্গ বোধ করবেন। যতদূর দেখতে পাচ্ছি দুটো ভাষাই যোগাযোগের তথা কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা হবে। তা বলে অন্যান্য ভাষাকে শুধু সামন্ত ভাষা করে রাখলে চলবে না। তারাও সমান মর্যাদার অধিকারী হবে। তাদেরও জাতীয় ভাষা বলা হবে। তবে তাদের দ্বারা যোগাযোগ বা কেন্দ্রীয় দপ্তরের কাজকর্ম চলবে না। কিন্তু মনি অর্ডার ফর্ম তো আগেকার দিনে বাংলা ভাষাতেও ছাপা হতো। রেলের টাইম-টেবল তো এখনো বাংলায় ছাপা হয়। 'কেন্দ্রীয় সরকারের যেসব কার্যকলাপ জনসাধারণের সঙ্গে সংযুক্ত সেসব শুধু হিন্দীতে বা ইংরাজীতে আবদ্ধ রাখলে অন্যায় হবে।

মোট কথা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যকলাপের ভাষায় একপ্রকার ক্রমবিভাগ চাই। কোনো কোনো কাজ শুধু হিন্দীতেই হবে, যেমন অনুষ্ঠানিক কর্ম। কোনো কোনো কাজ শুধু ইংরেজীতেই হবে, যেমন সরকারী চাকরির জন্যে পরীক্ষা। কোনো কোনো কাজ হিন্দীতে ও ইংরেজীতে হবে, যেমন দপ্তরের কাজ। কোনো কোনো কাজ সব ক'টা ভাষায় হবে, যেমন ডাকঘরের কাজ। রেলের কাজ। এসব ক্ষেত্রে গোঁড়ামি ভালো নয়। সব ক'টা ভাষাই জনগণের সেবার ভাষা। মিলনের ভাষা।

এত বড়ো একটা জটিল ব্যাপার রাতারাতি নিষ্পন্ন হতে পারে না। এটা বিপ্লবধর্মী নয়, বিবর্তনধর্মী। বিবর্তন অত্যন্ত মন্থর গতিতে চলে। তার কাছে পনেরো বছর কিছুই নয়। মানুষের মন তৈরি করতে আরো বেশী সময় লাগে। ইংরেজরা প্রথম দিকে ইংরেজী প্রবর্তন করতে চায় নি। ফার্সী ভাষাকে 'রিপ্লেস' করতে প্রায় নব্বই বছর লেগেছিল। আর আমাদের নেতাদের ধারণা সংবিধানে একটা ধারা জুড়ে দিলেই পনেরো বছর বাদে ইংরেজীকে 'রিপ্লেস' করতে পারা যাবে। করবে কে? না হিন্দী। এসব কাজ বাহুবলেও হয় না, কলমের জোরেও হয় না, বিপ্লবের শক্তিতেও কুলোয় না। কমিউনিস্টরাও বুঝতে পারছে যে, ইংরেজীকে রাতারাতি উঠিয়ে দিলে বিপদ। কারণ হিন্দী একা সব দিক সামলাতে পারবে না। তার অনেক শরিক। শরিকদের সঙ্গে লড়তে লড়তে তার দম ফুরিয়ে যাবে।

যে দেশের বাইরে শত্রু ওৎ পেতে আছে, যার ঘরেও সব জিনিস আগুন সে দেশে ভাষা নিয়ে ধর্মান্ধের মতো আত্মকলহ একটা দিনও সহ্য করা যায় না। এর জন্যে দায়ী কে? দায়ী প্রথম ঢিলটি যে মেরেছে সে। তার উত্তরে পাটকেলটি যে মেরেছে সেও। কর্তারা কি জানতেন না যে, ২৬শে জানুয়ারি ভারতীয় ইউনিয়নের একচ্ছত্র রাষ্ট্রভাষারূপে হিন্দীর অভিষেক হলে তামিলদের মধ্যে অনেকেই সেদিন শোক প্রকাশ করবে? শোক প্রকাশকে জবরদস্তি দমন করতে গেলে শুরু হবে অনলে আত্মাহুতি। না, এই জিনিসটা তাঁরা জানতেন না। এটা ভারতে নতুন। এতে ভারতের গৌরব বাড়ছে না। হিন্দীর উপরেও শ্রদ্ধা বাড়ছে না। আরো বড়ো অনর্থের ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে। অতএব দ্রুত সমাধান চাই। সে সমাধান সর্বসম্মত হওয়া চাই। বিনোবাজীর অনশন যেন অযথা প্রলম্বিত না হয়।

আচ্ছা, এ দেশে তো অনেকগুলো দল। এমন কোনো নিখিল ভারতীয় দল আছে কি যার দপ্তরে ইংরেজী ব্যবহার করা হয় না, তার বদলে হিন্দী ব্যবহার করা হয়? এরা কেউ যদি ইংরেজীকে 'রিপ্লেস' করতে না পেরে থাকে তবে ভারত সরকারকে ও কাজ থেকে নিবৃত্ত করে নি কেন? যে দলের সভ্যরা ভারতের নানা রাজ্যের ভাষার কথা বলে, সুতরাং পরস্পরের সঙ্গে ইংরেজীতেই বাক্যালাপ বা পত্রালাপ করে, তারা ইংরেজীকে বাদ দেবার স্বপ্ন দেখতে যায় কেন? দেশকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তারাও কি দায়ী নয়? ইংরেজী থাকলেই যে আমাদের দেশ ইঙ্গ-মার্কিন তাঁবেদার বনে যাবে তা নয়। ইংরেজী আর গোলামি সমার্থক শব্দ নয়। এই অনর্থের মূলে এঁদের এই বিভ্রমও কাজ করছে। সবাইকে আজ আত্ম সমালোচনা করতে হবে।

উল্টো দৌড়

জনাব জিন্না সাহেবের জীবনচরিতের প্রথম অধ্যায় পাঠ করতে গিয়ে অবাক হয়ে যাই। কত বড়ো বিস্ময়কর প্রতিভা! ইতিহাসে অভূতপূর্ব। তবে অতুলনীয় নয়। সম্প্রতি আমরা তাঁর অনুরূপ প্রতিভার সন্ধান পেয়ে "তদা নাশংসে" জপ করতে আরম্ভ করেছি। হায়, গান্ধী, তুমি কি এ জলতরঙ্গ রোধ করতে পারতে, যদি বেঁচে থাকতে!

যা বলছিলুম। একদা জিন্না সাহেব বিষম এক পণ করেন। তখন তাঁর বয়স বোধ হয় আট কি দশ। খেলাধূলায় পোক্ত নন। অবজ্ঞার সঙ্গে তাঁর এক সহপাঠী তাঁকে বলেন, "তুই আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে পারবি!"

"কেন পারব না? আলবৎ পারব। তুই হেরে যাবি।" জিন্না বুক ফুলিয়ে বলেন।

সহপাঠী তো হেসে অস্থির। যে ছেলে কোনো দিন কোনো খেলায় জেতেনি সে কিনা পাল্লা দিয়ে দৌড়বে ও জিতবে। সহপাঠী বলেন, "আয়, বাজি রাখি। যে হেরে যাবে সে খাওয়াবে।" (এই অংশটা আমার ঠিক মনে নেই।)

জিন্না বলেন, "রাজি। আমি জানি আমি জিতব। কেন মিছিমিছি হেরে যাবি?"

ওয়ান, টু, থ্রী। শুরু হয়ে যায় দৌড়। সহপাঠী ছুটতে ছুটতে অনেকদূর এগিয়ে যান। জিন্না তাঁর ধারে কাছেই নেই। মনের আনন্দে তিনি একবার পিছন ফিরে তাকান। ও কী!

সহপাঠী তো হাঁ। তিনি ডাক ছেড়ে বলেন, "ও কী! ওদিকে দৌড়চ্ছিস কেন? ওটা তো উল্টো দিক। আচ্ছা আহাম্মক দেখছি!"

"আরে, আমিও তো সেই কথাই ভাবছি।" জিন্না সপ্রতিভভাবে জবাব দেন। "কেন বাপু, বেকুবের মতো উল্টো দিকে দৌড়তে গেলি? হেরে গেলি তো?"

বাজি রাখার সময় কোন্ দিকে দৌড়তে হবে এ বিষয়ে কথাবার্তা হয়নি। সহপাঠী খেলাধুলায় যেমন মজবুৎ বুদ্ধিশুদ্ধিতে তেমন নন। তাই তো তিনি

জিন্নার সঙ্গে বুদ্ধির দৌড়ে হেরে যান। জীবনযুদ্ধেও তাই ঘটে। কায়দে আজম জিন্না উল্টো দিকে দৌড়তে আওরাংজেবের যুগে পৌঁছে যান। "আওরাংজেব ভারত যবে করিতেছিল খান্ খান্।" তাঁর মতে সেইটেই অগ্রগতি। সেইটেই সোজা দিক।

পাকিস্তান বেরিয়ে যাবার পর বাকী যা রইল সেই বাকীস্থানের নামকরণ হলো ভারত। মনে করা গেল যে আমরা আমাদের মতে সোজা এগোচ্ছি। আমরা বিংশ শতাব্দীর ভারতীয়। আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর মোগল নই। যার নতুন নামকরণ হয়েছে পাকিস্তানী। আমাদের বিচারে আমরা তিন শতাব্দী এগিয়ে রয়েছি ও আধুনিকতর যুগের দিকেই যাচ্ছি।

এখন গান্ধীজীর কথা বলা যাক।

কংগ্রেসের ভাষা আগেকার দিকে ইংরেজী ছিল। গান্ধীজী এসে সেটাকে বদলে দিয়ে হিন্দী করেন। কিন্তু পুরোপুরি না। ইংরেজীও রাখেন। "ইয়ং ইণ্ডিয়া"র সম্পাদনা হাতে নিয়ে তিনি এই কৈফিয়ৎ দেন যে দক্ষিণ ভারতের লোক হিন্দী বুঝবে না বলেই তাঁকে ইংরেজীতে লিখতে হচ্ছে।

তারপর হিন্দী বলতে তিনি ঠিক কী বুঝতেন সেটাও পরে তিনি অন্যত্র ব্যক্ত করেন। সীতাপুরে অনুষ্ঠিত হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে তাঁর বক্তব্য হলো—

"Highly Sanskritized Hindi is as avoidable as highly Persianized Urdu. Both the speeches are not intelligible to the masses. I have accepted Hindustani as a common medium because it is understood by over twenty crores of people of India. This is not the artificial Lucknavi Urdu or the sammelani Hindi. And one would expect at least a sammelan address to be such as would be understood by both Hindus and Muslims of the common type." (vide *Mahatma* by Tendulkar, vol. 2, p. 273).

এটা ১৯২৫ সালের কথা। মুসলমানরা "হিন্দী"র জায়গায় "হিন্দুস্তানী" পছন্দ করেন বলে দশ বছর পরে তাঁর বক্তব্যের বিবর্তন নিম্নোক্তরূপ ধারণ করে—

"When I presided over the sammelan once again in 1935, I had the word properly defined as a language that was spoken both by the Hindus and Musalmans and written in Devanagari or in Urdu script. My object in doing so was to include in

Hindi the high-flown Urdu of Maulana shibli and the high-flown Hindi of Pandit Shyamsunderdas. Then came the Bharatiya Sahitya Parishad, also an offshoot of the sammelan. At my suggestion the name Hindi-Hindustani was adopted, in the place of Hindi. (ibid., vol. 4. p. 179).

পরে কিন্তু হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন মহাত্মার এই উপদেশ লঙ্ঘন করে ও উর্দুকে পরিহার করে। তখন তিনি শেঠ যমুনালালজীকে পরামর্শ দিয়ে আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করান। তার নাম রাখা হয় হিন্দুস্তানী প্রচার সভা। এবার আর হিন্দী নয়, হিন্দী-হিন্দুস্তানী নয়, এবার সোজাসুজি হিন্দুস্তানী। কিন্তু সে হিন্দুস্তানীর বাহন দেবনাগরী তথা উর্দু লিপি। সে ভাষা হিন্দু মুসলমান উভয়েরই ভাষা। নিছক হিন্দীও নয়, নিছক উর্দুও নয়। সেই অনুসারে "হরিজনসেবক" পত্রিকার ছুটি সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। যমজ সংস্করণ। একটি দেবনাগরীতে। অপরটি উর্দু লিপিতে। বলা বাহুল্য পাঞ্জাবের হিন্দুরা দেবনাগরীর চেয়ে উর্দু লিপিতেই অভ্যস্ত। একবার আমি লালা লাজপৎ রায়ের "বন্দে মাতরম্" আনিয়ে দেখি যে বিলকুল উর্দুতে লেখা ও ছাপা।

কেউ কল্পনা করেনি যে দেশ রাতারাতি ভাগ হয়ে যাবে। যদি অখণ্ড ভারত থাকত ও কংগ্রেস লীগ মিলে মিশে রাজত্ব করত তা হলে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনের শুদ্ধ হিন্দীর ও তার একমাত্র বাহন দেবনাগরী লিপির দিকে ভোট বেশী পড়লেও এত বড়ো গুরুত্বপুর্ণ একটা বিষয়ের মীমাংসা কেবলমাত্র অধিকাংশের ভোটেই হতো না। সংখ্যালঘু মুসলমানের মুখ চেয়ে হিন্দী উর্দু উভয় ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার বা সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে হতো। দেবনাগরী ও উর্দু লিপি উভয় লিপিকেই সমান আসন দিতে হতো। অথবা ভাষার ও লিপির দ্বন্দ্ব এড়াতে গিয়ে ইংরেজীকেই বাহাল রাখতে হতো। অবশ্য গান্ধীজী থাকলে প্রাণপণে চেষ্টা করতেন হিন্দী উর্দুর মধ্যে মিলন ঘটাতে। সরকারী ভাষা যেটা হতো সেটা হতো শিবলীর উর্দু নয়, শ্যামসুন্দর দাসের হিন্দী নয়, আবু শেখ আর হাবু দোসাদের দেহাতী বুলি। শুধু লিপিটাই দুরকম। সে বুলিতে সরকারী কাজকর্ম করা খোদার বা রামের অসাধ্য হলে গান্ধীজী কী করতেন জানিনে।

হঠাৎ দেশ ভাগ হয়ে যায়। তখন এ ঝগড়া আপনি মিটে যায়। উর্দু একেবারে মুলুক ছেড়ে চলে যায়। মক্কার দিকে মুখ করে মক্কার আরো

খুচরো ডিটেলসগুলো পর্যন্ত ও নিজে বসে বসে তৈরী করেছে।

ডাক্তার॥ হুঁ। কেস্‌টা অবিশ্যি আমার কাছে খুব কমপ্লিকেটেড্ মনে হচ্ছে না। দড়ি ছিঁড়ে ঐ সেকেণ্ডারি প্ল্যাটফর্ম থেকে ব্যাকস্টেজে সেন্সলেস্ হয়ে পড়ে যাবার পরেই ওর মাথায় চোট লেগেছিল। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই ওর রোলটা চিরকালের জন্য মাথায় গেঁথে গিয়েছে। হুঁ, এরকম ব্যাপারে ব্রেণে খুবই অ্যাফেক্ট করতে পারে। [টুটু ও বাচ্চু ঢোকে] এই ধরনের কেসে জেনারালি কারো কারো বোধশক্তি হারিয়ে যায়, কেউ কেউ পাগলও হয়ে যায়।

বলরাম॥ (টুটু ও বাচ্চুকে) শুনছ হে খোকাখুকুরা? জীবনের ঠাট্টাটা দেখেছ? তোমরা তখনও জন্মাওনি, কি বাচ্চু বড় জোর বছর দুই-তিনেকের। তোমাদের বিয়ে-ফিয়ের কোনো কোশ্চেনই ছিল না তখন! আর আজ তোমার মা তার ছবির সঙ্গে তোমার হুবহু মিল খুঁজে পাচ্ছেন। অথচ তুমিই যে সেদিন পৃথিবীতে আসবে এরকম কোনো কল্পনাই ছিল না তোমার মার মনে। এর মধ্যেই ছাখো, আমরা সব বুড়ো হয়ে গেলুম। আর ও, মাথায় ঐ একটি চোট—সব বন্ধ হয়ে গেল। চিরকালের জন্য শের আফগান রয়ে গেল।

[আর্তনাদ করে প্রভাতের প্রবেশ, হাতে উন্মুক্ত তলোয়ার]

প্রভাত॥ একটু ভেতরে আসছি স্যার। আই অ্যাম ভেরি সরি।

টুটু॥ (ভয়ে) ও মাগো, ঐ শের আফগান এসে গেছে।

ছায়া॥ বাচ্চু, এ কি সেই?

বাচ্চু॥ না না, এ না, এ না। কিছু ভয় পাবেন না।

ডাক্তার॥ তাহলে....ইনি ?

বলরাম॥ আরে, এযে সেই পুরোনো মেক-আপ নিয়ে এসেছে। একী সেই দূত-টুত না কী ?

বাচ্চু॥ ওর ঐ কন্টিনিউড পাগলামিতে তখনকার দিনের সেই হিস্টরিক্যাল অ্যাটমসফিয়ার রাখবার জন্য কয়েকজন লোককে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। এ তাদেরই একজন।

প্রভাত॥ মাপ করবেন স্যার।

বাচ্চু॥ মাপ করার নিকুচি করেছে। আমি অর্ডার দিয়েছিলুম পাশের দরজা বন্ধ থাকবে। কেউ যেন এঘরে ঢুকতে না পারে।

প্রভাত॥ জানি স্যার। কিন্তু আমি আর পারছি না। আমাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করে দিন, আমি চলে যাচ্ছি।

বাচ্চু॥ ও আপনিই সুধীরবাবুর জায়গায় আজকে জয়েন করেছেন ?

প্রভাত॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার! এই পাগল সামলানো আমার কম্ম নয়।

ছায়া॥ (বাচ্চুকে) তবে যে তুমি বলেছিলে ও খুব ঠাণ্ডা মেজাজে থাকে ?

প্রভাত॥ (ছায়াকে) আজ্ঞে না স্যার! ঐ আদত পাগলের কথা বলছি না। আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তাদের কথা বলছি। (বাচ্চুকে) আপনিই স্যার সেদিন ইণ্টারভিউয়ের সময় বললেন এরা আমাকে সব বুঝিয়ে টুঝিয়ে দেবে। তা ওরা আমাকে নিয়ে যা শুরু করেছে তাতে সুস্থ মানুষই পাগল হয়ে গিয়ে বুক থাবড়াবে স্যার!

[বাকীরা ঢোকে]

সুকুমার ॥ একটু আসবো স্যার ?

ননী ॥ স্যার আমরা একমিনিট আসবো ?

বাচ্চু ॥ আসুন সুকুবাবু। এসব কী আরম্ভ করেছেন আপনারা ? একটা নতুন লোক—কোথায় সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠিক করে দেবেন —তা না।

সুকুমার ॥ স্যার প্রভাতটা—

প্রভাত ॥ হ্যাঁ প্রভাত না, এখন প্রভাত। আমি এই পাগলামির মধ্যে নেই। আমি চলে যাচ্ছি।

সুকুমার ॥ চলে যাচ্ছি মানে ?

ননী ॥ হঠাৎ এখানে পালিয়ে এসে তো বারোটা বাজিয়ে দিলেন একেবারে।

সুকুমার ॥ স্যার, উনি ভীষণ ক্ষেপে উঠে ওকে অ্যারেস্ট করবার হুকুম দিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন যে, এক্ষুণি এই দরবারে এসে ওর বিচার করবেন। কী করি বলুন তো এখন ?

বাচ্চু ॥ দরজাটা বন্ধ করে দিন। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিন। কুইক !

ননী ॥ মেশো, মানে উপেনবাবু অবিশ্যি আছেন ওখানে, কিন্তু একা উনিতো ওঁকে বেশীক্ষণ আটকে রাখতে পারবেন না।

সুকুমার ॥ একটা কাজ করা যায়। আমরা যদি ওঁকে গিয়ে খবর দিই যে, দিল্লী থেকে সম্রাট আকবরের একজন লোক মানে ডাক্তারবাবু, দেখা করতে এসেছেন—তাহলে উনি হয়তো এটা টেম্পোরারিলি ভুলে যাবেন। ডাক্তারবাবু ওঁর সামনে কী পোশাক পরে হাজির হবেন তা কি কিছু ঠিক করেছেন ?

বাচ্চু ॥ হ্যাঁ, ঠিকই। ডঃ মল্লিকও এই ফাঁকে ওঁকে একবার দেখে নিতে পারবেন।

টুটু ॥ আমি বাড়ি যাবো! চল মা, আহ্ চল না!

ডাক্তার ॥ দেয়ার ইজ জাস্ট ওয়ান....ওঁর সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র কিছু থাকে না তো? মানে ধরুন হঠাৎ....

বাচ্চু ॥ না না, সেসব কিছু নেই! এই টুটু, কী বোকার মত ভয় পাও। তুমি নিজেই তো এখানে আসতে চাইলে!

টুটু ॥ না আমি নিজে মোটেই আসতে চাইনি। মা আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে জোর করে নিয়ে এল।

ছায়া ॥ না, আমি কাউকে আনি নি! আমি তো একাই আসতে চেয়েছিলুম। আমি একবার ওকে দেখব।

বলরাম ॥ একটা কথা বলি বাপু। হাসাহাসি করো না। এখানে দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে গেলে সত্যি তোমাদের মত ধড়াচূড়ো পড়তে হবে নাকি?

সুকুমার ॥ হ্যাঁ স্যার, এই ড্রেসটাই সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট, কেন না উনি যদি আপনাদের মডার্ন ড্রেসে দেখেন, তাহলে একেবারে অনর্থ হয়ে যাবে।

ননী ॥ পয়েণ্টটা হচ্ছে যে, উনি মনে করবেন, আপনারা সব শাহাজাদা সেলিমের চর, ছদ্মবেশ পরে আছেন।

বাচ্চু ॥ এদের দেখে আপনাদের যেরকম মনে হচ্ছে যে, এরা যেসব পোশাক পরে আছে সেগুলো আউট অব ডেট, ডঃ মল্লিকের এরকম ড্রেস দেখলে ওঁরও মনে হবে উনিও আউট অব হিজ্ টাইম।

সুকুমার ॥ তাতেও বিশেষ কিছু এসে যেত না। কিন্তু উনি যে মনে করবেন ওঁর চরম শত্রু শাহাজাদা সেলিম ডাক্তারবাবুকে এরকম ছদ্মবেশে পাঠিয়েছেন।

বলরাম ॥ আকবরের ছেলে সেলিম? আশ্চর্য ব্যাপার?

সুকুমার ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, ওঁর সবসময় মনে হয়, শাহাজাদা সেলিম মেহেরুন্নিসার লোভে ওঁকে এসে হঠাৎ একদিন খুন করে যাবে।

ডাক্তার ॥ ইয়েস্, দ্যাট্স্ পারসিকিউশন ম্যানিয়া।

বাচ্চু ॥ সবার থাকার কি দরকার? এঁরা কজন তো আছেনই। আমরা বরং বাইরে গিয়ে বসি। ডঃ মল্লিক তো ওঁকে একা দেখলেই হবে।

ডাক্তার ॥ ইয়ে—আমাকে একেবারে একা একা থাকতে বলছেন?

বাচ্চু ॥ না না, এরা ক'জন তো থাকছেনই।

ডাক্তার ॥ না, আমি ওঁদের কথা বলছি না। বলছিলুম যে, অন্ততঃ পক্ষে মিসেস মুখার্জী যদি....

ছায়া ॥ নিশ্চয়ই। আমিতো থাকতে চাই-ই। সেইজন্যইতো আমি এলাম। আমি ওকে একবার দেখব!

টুটু ॥ কেন মা, তোমার সবতাতেই....চল না, সবাই চলে যাই।

ছায়া ॥ আহ্ চুপ কর। চলেই যদি যাবো তাহলে এলাম কেন? আমি....আমি ইসমৎ বেগম আজব, মেহেরুন্নিসার মা।

ননী ॥ খুব ভালো। ওঁর শাশুড়ী সাজতে হলে আপনাকে এই ড্রেসের উপরেই শুধু একটা খুব লম্বা গোছের বোরখা পরতে হবে, আর কিছু না। গ্র্যাণ্ড আইডিয়া। (রমেশকে) এই মট্‌কু, যাতো, তুই আর সাধন তাড়াতাড়ি গিয়ে—

রমেশ ॥ আহ্‌ দাঁড়া। পাঁচবার যাবো আর পাঁচবার আসবো, না? ····ডাক্তারবাবুর জামাকাপড় লাগবে না?

ডাক্তার ॥ আমি····আমি ধরুন·······নূর-ই-কুতব-উল আলম যদি সাজি?

ননী ॥ ও মোল্লা। বেশ।

স্নকুমার ॥ আপনি অবিশ্যি এর আগে অনেকবার এসে গেছেন।

ডাক্তার ॥ কী? আমি? না, আমিতো কক্ষণো—

স্নকুমার ॥ আজ্ঞে না। আপনি মানে নূর-ই-কুতব-উল আলম। ওঁর পক্ষে আসাটা খুব ন্যাচারাল,—যাষ্ট এই ড্রেসের ওপর একটা আলখাল্লা চড়িয়ে নেওয়া আর কি! তাতে যিনি আসেন তারও স্নবিধে আর আমাদেরও স্নবিধে! বেশি হাঙ্গামা করতে হয় না।

ডাক্তার ॥ তবে?

স্নকুমার ॥ না না, কোনো ট্রাবল নেই—উনি কিছু মনে রাখেন না। ওঁর কাছে কে আসছের চেয়ে কী পরে আসছে সেটাই সবচেয়ে ইম্পরট্যাণ্ট।

ছায়া ॥ ও, কে আসছে সেটা বুঝি নয়!

স্নকুমার ॥ আজ্ঞে না, কী পরে আসছে সেটাই।

ছায়া ॥ ভালো, আমার পক্ষে তো আরো ভালো।

বাচ্চু ॥ আচ্ছা, চলুন তাহলে, আমরা তিনজনে চলে যাই।

বলরাম ॥ না, আমার মিসেস যদি থাকেন তো আমার থাকাটাও দরকার। মানে একটা মর‍্যাল রেসপন্‌সিবিলিটি তো।

ছায়া ॥ না, তোমার থাকার কোন দরকার নেই।

বলরাম ॥ না—ইয়ে মানে তুমি আছো বলেই যে থাকব তাও নয়, আমারও ওকে দেখার খুব ইচ্ছে।

সুকুমার ॥ হ্যাঁ, তিনজনেই থাকবেন তো, থাকুন না, ভালোই তো।

ননী ॥ হ্যাঁ তিনজনে থাকলেই বোধ হয় ভালো হয়। তাহলে এঁর জন্যে কোন্ পোশাকটা নিয়ে আসব ?

বলরাম ॥ যাই হোক, দেখো বাবা, বেশী রুপোলি ফিতে জরিটরি দিয়ে খুব জবজরং যেন কিছু না হয়।

ননী ॥ উনি ধর গিয়ে জনাব মোয়াজুদ্দিন সাজতে পারেন।

বলরাম ॥ মোয়াজুদ্দিন! সে টা কী ? খায় না মাথায় দেয় ?

ননী ॥ একজন দরবেশ। দিল্লীর জুম্মা মসজিদের পাশেই আপনার দরগাহ্। আপনি একটা আলখাল্লা পরবেন, আর মাথায় একটা কালো ফেট্টি। এই রকমই চল ছিল।

বলরাম ॥ আমি কী সাজব ?

ননী ॥ আপনি ধরুন ডাক্তারবাবুর মানে নূর-ই-কুতব-উল আলমের একজন অ্যাসিস্ট্যাণ্ট গোছের। (রমেশকে) এই মট্কু, যাতো ড্রেসগুলো তাড়াতাড়ি নিয়ে আয়। আর সাধন দা, তুমি গিয়ে ওঁর কাছে অ্যানাউন্স কর যে দিল্লী থেকে নূর-ই-কুতব-উল আলম আর ইসমৎ বেগম দেখা করতে এসেছেন আর যাওয়ার আগে চেয়ার-টেয়ারগুলো নিয়ে যাও।

[সাধন, সুকুমার আর রমেশের চেয়ারসহ প্রস্থান]

বাচ্চু। আচ্ছা, আমরা তাহলে ওপরের ঘরে গিয়ে বসছি। এসো টুটু। কী হল ? এসো, আরে ডোণ্ট ওয়রি।

টুটু ॥ মা, তাড়াতাড়ি করো কিন্তু, লক্ষ্মীটি !

[টুটু, বাচ্চু আর প্রভাত বেরিয়ে যায়]

ডাক্তার ॥ (ননীকে) আমাকে মানাবে তো ?

ননী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ মানাবে, খুব ভালোই মানাবে। আপনি কিছু ভাববেন না। নূর-ই-কুতবকে এখানে বরাবরই যথাযোগ্য সম্মানের সাথে রিসিভ করা হয়ে থাকে, আর ইসমৎ বেগমকেও। আপনাদের দেখলে উনি খুব খুশীই হবেন। উনি একথা কখনোই ভোলেন না যে, আপনারা দু'জনেই দিল্লীর প্রচণ্ড গরম আর লুর মধ্যে দু'দিন ঘরে বাইরে দরবার করে সম্রাট আকবরের কাছ থেকে ওঁকে বর্ধমানের জায়গীরদারি পাইয়ে দিয়েছিলেন। আপনারা না থাকলে উনি মেহেরুন্নিসাকে নিয়ে কখনো এতদূরে এসে খানিকটা নিরাপদ বোধ করতে পারতেন না।

বলরাম ॥ (ননীকে) আমি কী করব ?

ননী ॥ আপনি কিন্তু করবেন না। একবারে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন। ওঁকে শুধু দেখবেন তো ?

ছায়া ॥ তুমি চলে যাও না! তুমি ওদের সঙ্গে চলে গেলেই তো ভালো করতে।

বলরাম ॥ আহ্ কী হচ্ছে কী? এত এক্সাইটেড হবার কী আছে ?

ছায়া ॥ আচ্ছা থাকো, চুপ করে থাকো, কথা বোলো না।

[ড্রেস নিয়ে রমেশ ও সাধনের প্রবেশ]

ননী ॥ এই তো ড্রেসগুলো এসে গেছে। (ছায়াকে) এই হচ্ছে আপনার বোরখা—নিন।

ছায়া ॥ এখানে আয়না-টায়না কিছু নেই ?

ননী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। পাশের ঘরে পাঁচ-সাতটা বড়ো বড়ো আয়না আছে। আপনি যদি……

ছায়া ॥ সেই ভালো। আমি নিজেই পরে আসিগে। আমি নিজেই পরে নিচ্ছি।

[প্রস্থান]

[রমেশ বলরামকে এবং ননী ডাক্তারকে ড্রেস পরায়]

বলরাম ॥ জানো ডাক্তার, আমি জীবনে কোনদিন ভাবিনি যে শেষ পর্যন্ত দরবেশের পোষাক পরে কোথাও দাঁড়াতে হবে। (ননীকে)……আচ্ছা, এসব অদ্ভুত পাগলামির দৌলতে বেশ দু'পয়সা খরচা হচ্ছে তো ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ পাগলামি ব্যাপারটা কস্টলি, সব ধরনের পাগলামিতেই তো খরচ হয়।

বলরাম ॥ (হেসে) হ্যাঁ, খরচা করার মতো টাকা থাকলে আর পাগল হতে বাধা কী ?

ননী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, তা হয়। ওঘরে সেকালের জামাকাপড় ভর্তি কয়েকটা ওয়ারড্রোব আছে। ড্রেসগুলো খুব কস্টলি—খুব নিখুঁতভাবে তৈরী। অবিশ্যি এখন সব বহুবার ইউজ করে পুরোনো-টুরোনো হয়ে গেছে। ছিঁড়ে-ফিড়ে গেছে অনেকগুলো। চিৎপুরে 'রূপমন্দির' নামে একটা ড্রেস-সাপ্লাইয়ের দোকান আছে। আমাদের সুধীরদা সেখানে কাজ করতেন। এ কষ্ট্যুমগুলো সব সেখান থেকে আনানো। হ্যাঁ পয়সা খরচা হয় ঠিকই।

[বোরখা পরে ছায়া ঢোকে]

বলরাম ॥ অপূর্ব, অপূর্ব মাই ডিয়ার, তোমাকে বেড়ে খানদানি দেখাচ্ছে।

ছায়া ॥ (হেসে) আরে ওটা কী পরেছ তুমি? খুলে ফ্যালো, খুলে ফ্যালো। তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ঢোল কাঁধে দাদের মলম বেচতে বেরুবে।

বলরাম ॥ (হেসে) ও, শুধু আমাকে ঠাট্টা না করে একবার ডাক্তারকে দেখলে হত না?

ডাক্তার ॥ কী আমাকে খুব খারাপ দেখাচ্ছে? দাঁড়ান, একটু ঠিকঠাক করে নেই।

ছায়া ॥ না, না, আপনাকে বেটার দেখাচ্ছে। তবে হাসিও পাচ্ছে।

ডাক্তার ॥ আপনাদের এখানে কি প্রায়ই আমাদের মতন সব নতুন লোকজন আসেন?

ননী ॥ সেটা অ্যাকচুয়্যালি ওঁর মর্জির ওপর নির্ভর করে। ঐ যখনই বললেন, অমুক জায়গীরদারকে বলো, কিংবা তমুক মোল্লাকে সেলাম দাও, ঐ তখনই কাউকে না কাউকে ধড়াচূড়ো পরিয়ে হাজির করতে হয়। এই আর কী। তাছাড়া মাঝে মাঝে মহিলারাও আসেন।

ছায়া ॥ মহিলারাও আসেন? কারা আসেন?

ননী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, মহিলা....মানে....এমনি সব মেয়েছেলে আর কী। গোড়ায় তো প্রায়ই দরকার হত।

বলরাম ॥ বা বেড়ে ব্যাপার তো। এরকম পোষাক পত্তর পরে আবার মেয়েছেলে? বাবা, এ যে সেয়ানা পাগল।

ননী ॥ আজ্ঞে, মানে বুঝতেই পারছেন····মানে ইয়ে····

বলরাম ॥ বুঝেছি···খুব কম পয়সার মেয়েছেলে····(ছায়াকে) দেখো গো, তোমার দরটা যেন ঠিক থাকে বাপু····ঝামেলা কোরো না।

নেপথ্যে ॥ মির্জা মহম্মদ জায়গীরদার বর্ধমান মুলুক—শাহ নিজাম··· জাহাপনা গাজী শের আফগান বাহাদুর····

ননী ॥ ডাক্তারবাবু আপনার চশমা। (তাড়াতাড়ি চশমা খুলে নেয়)

[সভাসদসহ শের আফগানের প্রবেশ]

শের আফগান ॥ সেলাম বেগম সাহেবা। বন্দেগী—জনাব আলী। (বলরামকে দেখে) এ কে ? আসলাম খাঁ ?

সুকুমার ॥ সাহেব-এ-আলম, উনি একজন দরবেশ····জুম্মা মসজিদের পাশেই ওঁর দরগাহ্। উনি জনাব নূর-ই-কুতব-উল আলমের সঙ্গে এসেছেন।

শের আফগান ॥ (বলরামকেই) ওদিকে তাকিয়ে কোনো লাভ নেই। বেগম সাহেবা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না আসলাম খাঁ। খোদা কসম, আপনার মেয়ে মেহেরুন্নিসাকে আমি বিশ্বাস করি না। যদি আসলাম খাঁ নিজে এসে সারা হিন্দুস্থানের বাদশা আকবরের নামে আমাকে অনুরোধ না করতো, তবে আমি তাকে কিছুতেই বিয়ে করতুম না। তখন আমি বুঝিনি যে বাদশা আকবরের রাগ থেকে কেবলমাত্র শাহজাদা সেলিমকে বাঁচাবার জন্যেই আসলাম····না না, এখন শাহজাদা সেলিমের সমালোচনার সময় নয়। আসলাম খাঁ, তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশ্বাস করো, তোমারই জন্যে আমি মেহেরকে পেয়েছি। আর ষড়্যন্ত্র—সে তো আজ নয়····সেতো ছেলেবেলা

থেকেই। ....আমার মা মীনা বেগম....বেলুচিস্তান....মরুভূমি ....আর আজ ছ্যাখো....পরণে এই জায়গীরদারের পোশাক........ আর এই দরবার....এই সভাসদ....না, এটা কোনো ব্যাপার নয়। কে তোমার বন্ধু, বিপদের মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রাখা—এই আর কী—ভুল কী করে শুধরে নিতে হয়, আমি জানি, তোমার সব কথা জেনেও আমি তোমারও সামনে বিনীত হয়ে থাকতে জানি আসলাম খাঁ। তুমিই না আমার মা মীনা বেগম সম্পর্কে রটিয়ে দিলে যে—আবুল ফজল সাহেবের সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক আছে?

বলরাম ॥ না, না, অন্তত আমি তো বলিনি।

শের আফগান ॥ ও, তুমি নও না? তুমি নও? হ্যাঁ, তোমাকে দেখে তো মনে হয় না তুমি এমন খারাপ কথা বলতে পারো।.... (ডাক্তারকে) বুঝলেন আড়ালে নিন্দে করতে এদের জুড়ি নেই। সামনা সামনি ধরলেই বলবে না, না, অন্তত আমিতো বলিনি। সামনে সবাই ভদ্র. বেশ মজার না?

ননী ॥ (চাপা গলায় ডাক্তারকে) বলুন হ্যাঁ, শাহাজাদা সেলিম আর আসলাম খাঁ—সবারই ঐ এক ধরন—সবাই এক।

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, ঐ শাহজাদা সেলিম আর আসলাম খাঁ—সব এক, ঐ এক ধরন।

শের আফগান ॥ ঠিক। জানেন, ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছি। আমি খুব ভাবুক ছিলাম। ছ'বছর বয়েস থেকে আমি খালি মার কথা শুনেছি, আলী, রোজগার কর, মানুষ হ! ভাবুন কোথায় সুদূর বেলুচিস্তান, আর কোথায় এই বাংলাদেশ... বর্ধমান

····এই মুঘল সাম্রাজ্যে একজন পাঠান···অনেক, অনেক বিদেশী ····আমাকে জায়গীরদার করে রাখা হয়েছে আর চারপাশে সব লোভী আর জোচ্চোর মুঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ গড়ে তুলছে। কাকে ছেড়ে কাকে বলব? বর্‌হানউদ্দিনের চেয়ে বড় চোর কোকলতাস। ····কোকলতাসের চেয়ে বড় চোর আসলাম খাঁ।

সুকুমার ॥ সাহেব-এ-আলম!

শের আফগান ॥ ও হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। এখন শাহজাদা সেলিমের সমালোচনার সময় নয়। কিন্তু আসলাম খাঁ, তুমি আমার মা'র নামে যে কলঙ্ক রটিয়েছো, তা ক্ষমার অযোগ্য। আমি ছেলে হয়ে মার এ নিন্দে শুনেছি, অথচ কোন প্রতিকার করতে পারিনি। এই পাপ আমাকে দিনরাত চাবুক মারে। জানেন, আমি মার জন্যে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদেছি। এ অন্ধকার প্রাসাদের এখানে ওখানে একা দাঁড়িয়ে কাঁদতে কাঁদতে সর্বাঙ্গে বোধ করেছি কী ব্যথা। পাপবিদ্ধ হবার কী নিদারুণ যন্ত্রণা। (ছায়াকে) আপনি তো মা···আপনার মধ্যে তো একটা মায়ের মন বেঁচে আছে। আপনি বলুন, আপনিই বলুন, মাত্র চারমাস আগে, আমার মা রাজধানী রাজমহল থেকে আমার সঙ্গে দেখা করে গেছেন। আর আজ ওরা বলে আমার মা নেই, মা মরে গেছে। আমি তো মার জন্যে কাঁদতে পারব না! কেননা, এই যে আজ আপনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, এর মানেই তো আমার বয়েস এখন ২৬ বছর!

উপেন ॥ আপনার মা এখনও বেঁচে আছেন বলেই আমাদের বিশ্বাস সাহেব-এ-আলম।

ননী ॥ তিনি রাজমহলেই আছেন জনাব। হয়তো ব্যস্ত আছেন। শিগগিরই আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।

শের আফগান ॥ হ্যাঁ, যদি দেখা হয়, আমি মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদব….(ছায়াকে) দেখুন, আমার চুল এখনও কালো। একজন আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে কিনা তাই চুলে কলপ দিয়েছি, নইলে আমার নিজের এসব ভালো লাগে না। ওহো, আপনিও তো চুলে কলপ দিয়েছেন, না? বুঝলেন, চুলে কলপ লাগানোটা আমার মনে হয়, খানিকটা সময়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার মতোই, নয়? যে শক্তি আমাদের সমস্ত ইচ্ছেগুলোকে প্রতিদিন মারে, তার বিরুদ্ধে খানিকটা অসহায় হয়ে রুখে দাঁড়ানো, তাই না? ধরুন, মানুষ জন্মায় আর মরে। আবার জন্মায়, আবার মরে। (ডাক্তারকে) আচ্ছা জনাব আলী। আপনি কি জন্মাতে চেয়েছিলেন? আমি কিন্তু জন্মাতে চাই নি।

ডাক্তার ॥ সাহেব-এ-আলম, জীবনের সব কিছুতো মানুষের ইচ্ছেমত হতে পারে না।

শের আফগান ॥ হ্যাঁ ঠিক। জীবনের সবকিছু মানুষের ইচ্ছেমতো হতে পারে না। আর একথা বুঝতে পারি বলেই আমাদের মনে সব অত অদ্ভুত ইচ্ছে জাগে। যেমন মেয়েরা পুরুষ হতে চায়, বুড়োরা চায় জোয়ান হতে। আর এমন বেশী বেশী করে চায় যে তাতে কোন ভাণ থাকে না। যেমন আপনি আপনার আলখাল্লা যতই আঁটসাঁট করে ধরে রাখুন না কেন আপনার জামার হাতা দিয়ে একটা জিনিস গলে পড়ছে। সেটা কী জানেন?

ডাক্তার ॥ মানে, ইয়ে⋯(অপ্রস্তুত ভাবে জামার হাতা ঠিকঠাক করতে থাকে, হাতের ঘড়িটা দেখা যাচ্ছিল)

শের আফগান ॥ জীবন, জীবন! দেখবেন, আপনাকে ফাঁকি দিয়ে জীবন কোথায় চলে গেল। কতরকম ছায়া তার। কত বিচিত্র চেহারা! ঘেন্না, রাগ, দুঃখ; হ্যাঁ, দুঃখও নিজের জন্য দুঃখ। দুঃখের যে কী নিদারুণ বিকৃত চেহারা হতে পারে তা আপনি আন্দাজ করতে পারেন? সে যে কখন আপনার সযত্নে লালিত মুখ ধরে ভেঙে মুচড়ে বিকৃত করে ফ্যালে, আপনি নিজেই তা চিনতে পারেন না। আপনি কি জীবনে কখনও এরকম বোধ করেছেন বেগম সাহেবা? আপনার কি মনে হচ্ছে অনেক বছর আগে আপনি যেমনটি ছিলেন ঠিক তেমনটিই আছেন? ⋯না নেই। ভেবে দেখুন, সেই অনেকদিন আগে যখন আপনি, আমি আর⋯অনেক আলোতে আপনার আমার মুখ মনে পড়েনি? আপনার খারাপ লাগেনি আমার কথা ভেবে? হ্যাঁ, এই তো, এইতো আপনার মনে পড়েছে। কী হয়েছিল, মনে পড়েছে? ....না না থাক। আমি বলব না, কাউকে বলব না। আর আসলাম খাঁ, তুমি কী করে সব কথা ভুলে ঐ রকম একজন লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারলে?

সুকুমার ॥ সাহেবে আলম!

শের আফগান ॥ না না, আমি নাম বলছি না, আমি কারো নাম বলছি না। বেগম সাহেবা, কখনো নিজেকে কিংবা অন্যকে ঠকানোর জন্যে চুলে কলপ দেবেন না। আর যদি দেন তো, শুধু আয়নায় যে ছায়াটুকু পড়ে, সেই ছায়াটাকে ঠকাবার জন্যে

অল্প একটু, এই শুধু সামনেটা। সবাইকেই তো রং মাখতে হয়, বলুন! না না, আমি আপনার ঠোঁটের কিংবা গালের রংয়ের কথা বলছি না, রং মানে বলছি স্মৃতির কথা—প্রথম যৌবনের স্মৃতি। সেটাকে এখনও তো আপনি ধরে রাখতে চান....এই বয়সেও। তাই না, আসলাম খাঁ। আজকে যা সত্যি আগামীকাল সেইটেই তো স্মৃতি হবে! এই পোষাক, এই জোব্বা, এই জীবন, এই ইচ্ছেগুলি....আল্লা, একে চিনেছি! এ দরবেশ নয়, দরবেশের ছদ্মবেশে আসলাম খাঁ।

উপেন ॥ সাহেবে আলম, আল্লার নামে—

ননী ॥ যা বলছেন একটু সমঝে বলুন সাহেবে আলম।

সুকুমার ॥ নূর-ই-কুত্তব-উল আলম আর বেগম সাহেবা আপনার নিরাপত্তার জন্যে শাহনশা আকবরের কাছে দরবার করবেন—এই প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন জনাবে আলী।

ডাক্তার ॥ জী জনাব! ঐই প্রস্তাব নিয়েই....শাহনশা আকবরের কাছে ....আমরা দুজনেই....

শের আফগান ॥ আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি জনাবালী। আমাকে মাপ করুন। আমি আপনার কাছেও মাপ চাইছি বেগম সাহেবা! আমাকে আপনি মাপ করুন, আমি যেখানে বাঁধা, সেখান থেকে আমি মুক্তি পাব না আমি জানি। ঐ ওখানে, ঐ তলোয়ার আমার মাথার ওপর ঝুলছে....আমি বুঝতে পারছিনা কেন, এই লোকটার কাছে আমি কিছুতেই শান্ত থাকতে পারছি না, কিছুতেই না।

সুকুমার॥ জাহাপনা, আপনি ওঁকে আসলাম খাঁ বলে মনে করেছেন। উনি আসলাম খাঁ নন ?

শের আফগান॥ আসলাম খাঁ নন ?

উপেন॥ না জনাব। উনি একজন গরীব দরবেশ।

শের আফগান॥ হয় তো তাই, ভেতর থেকে প্রবৃত্তিগুলো যখন তাড়া দ্যায়, তখন····নিজেকে শান্ত রাখা যায় না। বেগমসাহেবা আপনি পুরুষদের চেয়ে আমাকে ভালো বুঝতে পারবেন। বিশ্বাস করুন, আমি আপনার মেয়ে মেহেরকে ভালবাসি। সে সুন্দরী বলে নয়, আমার বেগম বলে,···হ্যাঁ সে সুন্দরী বলে নয়, আমার বেগম বলেই। ঐ তো ওখানে ঐ শীষমহলের নীচে বেচারা ছলছল চোখে দাঁড়িয়ে আছে। অনেক নিন্দে শুনতে হয়েছে তো তাকে। ওর জ্বর হয়েছে জানেন ? দিল্লীর প্রচণ্ড লু ওর নরম চামড়ায় কী ভীষণ ছোবল মেরেছে। আপনি তো আর মা, আপনি আর সাহেবে আলম দুজনে যাবেন, শাহনশা আকবরকে আমাদের কথা বলবেন। বলবেন যে, এরা সুখী, এদের সুখ যদি কেউ নষ্ট করতে চায়, উনি যেন তার বিচার করেন।

ছায়া॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমি বলব···নিশ্চয়ই···

ডাক্তার॥ আমরা বলব, নিশ্চয়ই।

শের আফগান॥ আর একটা কথা। তাঁকে আমার হয়ে অনুরোধ করবেন····তিনি তো সারা হিন্দুস্তানের বাদশা····তাঁর হুকুমে তো কবর থেকেও মানুষ উঠে আসতে পারে।····এই দেখুন, আমাকে দেখে যান····আমি যেখানে আছি এও একটা কবর! ওঁকে

বলবেন, আমি বেঁচে নেই, বেগমসাহেবা। আমার হাত-পা বাঁধা। হাত-পা বাঁধা বল্লুম, না? ঐ ছবিদুটোর দিকে তাকিয়ে দেখুন....ওখানে আমি বাঁধা। আমি আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে চাই, ছাব্বিশ বছর বয়স তো চিরকাল থাকে না বেগমসাহেবা....আপনারা বলবেন, কেমন? সেলাম জনাবালী, বেগম সাহেবা সেলাম....

[উন্মত্ত হাসিতে প্রস্থান, ছায়া মূর্ছিত হয়ে পড়ে, বাকী সবাই তাঁকে ঘিরে ধরে, পর্দা পড়ে]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[একই দৃশ্য। মঞ্চের সামনের দিকে তিনটি চেয়ার ও একটি চায়ের টেবিল, তাতে চায়ের সরঞ্জাম অর্থাৎ ট্রে, কাপ ডিস ইত্যাদি রয়েছে। কিছুক্ষণ আগেই চা খাওয়া শেষ হয়েছে। ডাক্তার, বলরাম ও ছায়া নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে]

ডাক্তার॥ (ছায়াকে) তাই শ্যাল নট্ প্রিসিউম টু কণ্ট্রাডিক্ট ইউ....বাট্ বিলিভ্ মি, ইট্স্ ওনলি....মানে আপনি নিজেই তো বলেছেন যে, এটা পিওরলি আপনার পার্সনাল ইম্প্রেশন।

বলরাম॥ আরে বাবা, ইম্প্রেশনটা তো আর হাওয়ার ওপর হয় না। ওর কথাবার্তা শুনেই তো হয়েছে, (ছায়াকে) না কি গো?

ছায়া॥ (অন্যমনস্কভাবে) হুঁ, কী বলছ....কথাবার্তা? হুঁ....

ডাক্তার ॥ বাট্, ইট্ ইস্ নেসেসারি টু আণ্ডারস্ট্যাণ্ড দ্য স্পেশাল্ সাইকোলজি অব দি ম্যাড ম্যান····বুঝলেন, পাগলদের একটা ক্ষমতা আসে····অ্যাণ্ড আই উড্ পার্টিকুলারলি এম্ফেসাইস্ দিস্ পয়েণ্ট····পাগলদের একটা ক্ষমতা আসে। খুব শক্তিশালী একটা অবসারভেশনের ক্ষমতা। তাদের ধরুন, যারা ছদ্মবেশে তাদের সঙ্গে দেখা করতে আসে, তাদের সত্যিকারের পরিচয়টা তারা ধরে ফেলতে পারে····অ্যাণ্ড দ্যাট ভেরি ইসিলি····উই ক্যান বি অ্যাবসল্যুটলি সিওর্ অব দ্যাট্, কিন্তু এক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব কমপ্লিকেটেড্। এই জন্যে কমপ্লিকেটেড্ যে, এই শের আফগান তার নিজের চোখেই একটা ইমেজ,····মানে তার নিজের কল্পনার একটা ছবি····ঠিক এই ছবিটার মতো।

[শের আফগানের ছবিটার দিকে আঙুল দিয়ে দেখান]

বলরাম ॥ হ্যাঁ, ও-ও তাই বলছিল (ছায়াকে উদ্দেশ্য করেন)।

ডাক্তার ॥ বেশ, তাহলে একটা কল্পনার সামনে আমরা, মানে আরো কতকগুলো কল্পনা····হাজির হলুম। ডু আই মেক মাইসেল্ফ্ কোয়াইট ক্লিয়ার ?

বলরাম ॥ প্লিজ কন্টিনিউ····।

ডাক্তার ॥ আর ঠিক তখনই উনি····ওঁর অসুস্থতার মধ্যেই ওঁর নিজস্ব কল্পনা আর আমাদের মধ্যে একটা ডিফারেন্স ধরতে পারলেন ! তার মানে উনি বুঝতে পারলেন, আমরা যা সেজে এসেছি আমরা তা নই····আমরা ফিক্টিশাস্। সেই জন্যেই উনি আমাদের বিশ্বাস করতে পারেন নি, সব পাগলেরাই সবসময় অন্যদের অবিশ্বাস করে····এটাই পাগলদের অ্যালার্ট থাকার

উপায়'।....কী বলব....আমরা কনস্ট্যাণ্টলি ভাবছি উনি পাগল, অথচ উনি নিজেকে সবসময়েই ভাবছেন নরম্যাল। বুঝতে পারছেন....উনি যত বেশী নিজেকে আমাদের কাছে মেলে ধরতে চাইছিলেন তত বেশী ওঁকে আমাদের ট্র্যাজিক মনে হচ্ছিল। উনি বুঝতে পারছিলেন ওঁর সম্পর্কে আমরা কী ভাবছি। তাই তাড়াতাড়ি করে ভাণ করতে লাগলেন, ওঁর চুলে কলপ লাগানো, ঠোঁটে, গালে রং মাখা....সবটাই আমাদের ঠাট্টা করবার জন্যে.... যেন সবটাই ইচ্ছে করে করছেন।

ছায়া ॥ না না, ডঃ মল্লিক, আপনি ভুল বুঝছেন।

ডাক্তার ॥ কেন ?

ছায়া ॥ আমি বলছি ও আমাকে চিনতে পেরেছে।

ডাক্তার ॥ ইম্‌পসিবিল্‌, অ্যাবসল্যুট্‌লি ইম্‌পসিবিল্‌।

বলরাম ॥ (ছায়াকে) যাঃ তা কী করে হবে, মোটেই চিনতে পারেনি।

ছায়া ॥ হ্যাঁ, ও আমাকে চিনতে পেরেছে। আমার কাছে এসে যখন কথা বলছিল, যখন ডিপ্‌লি আমার দিকে তাকিয়েছিল, আমি বুঝেছি, ও আমাকে চিনতে পেরেছে।

বলরাম ॥ আরে বাবা, ওতো তোমার কথা বলেনি, তোমার মেয়ের কথা বলছিল।

ছায়া ॥ (দৃঢ়তার সঙ্গে) মোটেই না, আমার কথাই বলছিল।

বলরাম ॥ হ্যাঁ বলছিল....কিন্তু....

ছায়া ॥ শোনো নি, ও আমার চুলে কলপ দেওয়ার কথা বলছিল।

তার মানেই ওর স্পষ্ট মনে আছে ছেলেবেলায় আমার চুল কী অদ্ভুত কালো ছিল।

বলরাম॥ ভগবান, শেষকালে আমাকেও পাগল নিয়ে ঘর করতে হবে!

ছায়া॥ বোকার মত কথা বোলো না।

বলরাম॥ আরে বাবা, তুমিতো কখনও ওর বেগম ছিলে না। ওর পাগলামোর স্মৃতিতে তোমার মেয়েই ছিল ওর বেগম!

ছায়া॥ ওতো আমার মেয়েকে কোনদিন দেখেনি। তবে কি করে বুঝবে আমার মেয়ের চুল কালো?

বলরাম॥ এ আবার কী কথা! কম বয়সে সবার চুলই কালো থাকে, তাই বলেছে! একজন পাগল হয়ে গিয়ে আর একজনের চুলের রং মনে করে তার যৌবনকে মনে রেখেছে, আর তুমিও কল্পনায় বিরাট বিরাট উদ্ভট থিয়োরী খাড়া করে ফেললে? তুমি বলছিলে না, আমার আসা উচিত হয়নি? আসলে তোমারই আসা উচিত হয় নি।

ছায়া॥ কিন্তু।....ও আমার কথাই বলছিল, আমার মেয়ের কথা না। দেখছিলে না, সব সময় আমার সঙ্গেই কথা বলছিল?

বলরাম॥ গুড্ গড্! আমাকে নিঃশ্বাস ফেলার সময় দিচ্ছিল না, আমার বলে হার্ট অ্যাটাক্ হয়ে করোনারী হবার দাখিল.... আর তুমি বলছ কিনা তোমার সঙ্গে কথা বলছিল? ওযে অধিকাংশ সময়টাই আসলাম খাঁর সঙ্গে কথা বলছিল সেও কি তোমার সঙ্গে নাকি?

ছায়া॥ হতে পারে, হয় তো বেশীক্ষণ সময় আমার চোখের দিকে

তাকিয়ে থাকতে ওর লজ্জা হচ্ছিল, হয়তো কষ্ট হচ্ছিল। বেশ তো, যদি আমায় চিনতেই না পারে তাহলে তোমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে ওরকম খেপে উঠল কেন বলতো? আর তো কারো ওপর চটেনি।

ডাক্তার ॥ (ছায়াকে) দেখুন, আমি একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না—মিঃ মুখার্জী যে আসবেন সেটা তো ওঁকে আগে জানানো হয় নি। ওঁর কাছে অ্যানাউন্স করা হয়েছিল শুধু দুজনের কথা, আপনার আর আমার কথা। কাজেই আমাদের সঙ্গে আন-অ্যানাউন্সড্ থার্ড পার্সনকে দেখেই ওঁর সন্দেহ হয়েছে।

বলরাম ॥ কোয়াইট! তুমি ঠিকই বলেছ ডাক্তার। কিন্তু সে কথাটা এঁকে বোঝাবে কে? ইনি মাথায় গজাল মেরে ঢুকিয়ে নিয়েছেন যে, উনি একে চিনতে পেরেছেন।

ছায়া ॥ আমি বলছি....ও আমাকে চিনতে পেরেছে। আচ্ছা, ডঃ মল্লিক, মানুষ কখনও কখনও এমন ভাবে তাকায় না যে, দেখলে তার মনটাকে চট্ করে ধরে ফেলা যায়? হয় তো...

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ....সেরকম একটা পসিবিলিটি থাকতে পারে। হয়তো একটা মোমেণ্ট....

ছায়া ॥ ঠিক....ওযে বলল....'ছাব্বিশ বছর বয়স তো আর চিরকাল থাকে না'....আমি তক্ষুণি বুঝতে পারলাম ও আমাদের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে। মুখে অনেক রং মেখে ওকে যে বয়েসের ছাপ ঢেকে রাখতে হচ্ছে। কথাগুলো মার্ক করেছিলেন ডঃ মল্লিক?

বলরাম॥ না, করবার কী আছে? আমিও মার্ক করেছি। কে না চায় বয়সটা কম থাকুক। আর ওতো চিরকালই একটু হিরো টাইপের ছিল! বয়সটা ফিরে পেলে আর একবার ডন জুয়ানি খেলাটা জমিয়ে খেলতে পারে, এই আর কী?

ছায়া॥ আর কিছু না মানো অন্তত পাপপুণ্য মানো। ওর নামে মিথ্যে দোষ দিয়ো না। ও আর যাই হোক, কোনোদিন মেয়ে ঘেঁষা ছিল না।

বলরাম॥ কিন্তু পুরুষঘেঁষা মেয়েদের ওপর অ্যাডভান্টেজ্ নিতে গেলে খুব মেয়েঘেঁষা না হলেও চলে।

ডাক্তার॥ আচ্ছা শুনুন, আপনাদের পার্সোনাল পয়েন্টগুলো বাদ দিলে যা দাঁড়ায়, সেটা আপনারাও বুঝতে পারছেন যে, পেসেন্টের মেণ্টাল অ্যাপ্টিটিউডগুলো চেঞ্জড্ হওয়ার সূচনা দেখা যাচ্ছে। সাধারণতঃ অসুস্থ মস্তিষ্কে এটা হয় না। কাজেই এক্ষেত্রে কেসটা ইসিয়ার, মানে এক কথায় বলতে গেলে, আসলে ওঁর অপ্রকৃতিস্থতা একটা ডেফিনিট্ রাস্তা ধরে চলতে পারছে না। এর ফলে ওঁর যে সেকেণ্ড পার্সোনালিটি⋯সেটা মাঝে মাঝে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, একটা প্রচণ্ড আবেগ মাঝে মাঝে পেসেণ্টকে তাঁর আসল ব্যক্তিত্বে ফিরিয়ে আনছে।⋯এটা খুব ভালো লক্ষণ। এটা যাকে বলে,⋯মানে ধরুন⋯বেশ আশাব্যঞ্জক মস্তিষ্কচালনা⋯ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড? ইট্স্ রিয়্যালি কনসিডারেব্ল্ সেরিব্র্যাল্ অ্যাক্টিভিটি। এখন আমরা ওকে যে প্রচণ্ড মানসিক আঘাতটা দেব বলে ঠিক করেছি⋯

ছায়া॥ টুটু আর বাচ্চু এখনও আসছে না কেন?

ডাক্তার ॥ 'বেগ ইওর পার্ডন ?

ছায়া ॥ টুটু আর বাচ্চু। প্রায় মিনিট দশেক হয়ে গেল।

ডাক্তার ॥ হুঁ, প্রায় মিনিট দশেক।

ছায়া ॥ একটা বোরখা পড়তে আর কতকক্ষণ লাগে ? এক দেড় মিনিট....

ডাক্তার ॥ হয়তো মিঃ চ্যাটার্জী ওঁকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলছেন। আপনার মেয়ে খুব বেশী ভয় পেয়েছেন তো ?

ছায়া ॥ ডঃ মল্লিক, টুটুকে কি আপনার এই স্কীমের মধ্যে না নিলেই.... ? ওকে তো আমি জানি।

ডাক্তার ॥ কিন্তু উপায় তো নেই। কিছু না, সমস্ত ব্যাপারটা শেষ হতে এক সেকেণ্ডও লাগবে না।....হ্যাঁ শুনুন, আমার ট্রিট্‌মেণ্টের বেসিক আইডিয়াটা হচ্ছে পেসেণ্টকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, উনি নিজেকে যা ভাবছেন, উনি রিয়্যালি তা নন্। ওঁর এই কল্পনার জগতের ওপর একটা প্রচণ্ড জোরে ঘা মারতে হবে....তাহলেই ওঁর চিন্তার থ্রেড্-গুলো ছিঁড়ে ফেলা যাবে। সূতোগুলো অবিশ্যি এমনিতেই আর মজবুত নেই এখন। উনি স্পষ্টই বুঝতে পারছেন যে, ওঁর এই শের আফগানের জীবন একটা শাস্তি। উনি নিজেই তো বললেন, শুনলেন না,....... 'ছাব্বিশ বছর বয়স তো আর চিরকাল থাকেনা।' মানে ব্যাপারটা হচ্ছে, হঠাৎ যদি এই সময়ের ডিফারেন্সটা পার করে দেওয়া যায়, তাহলেই উনি ভালো হয়ে যাবেন !

বলরাম ॥ কী রকম ভালো ডাক্তার ? সাধুসন্যাসীদের মতো ?

ডাক্তার ॥ উই মে হোপ, দেন, টু সেট হিম গোয়িং এগেন্। ঠিক

একটা বিকল ঘড়ির মতো, অনেক দিন বন্ধ হয়ে আছে ; ধরুন আমরা সেটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। ঠিক যেসময়ে বন্ধ হয়েছিল সেই সময়ে সেটাতে একটা প্রচণ্ড জোরে ঝাঁকানি দেওয়া গেল। তখন অ্যাট্ লিস্ট এক্সপেক্ট করা যায় সেটা আবার আগের মত চলতে আরম্ভ করবে।

[বাচ্চু ঢোকে]

ছায়া ॥ এই যে বাচ্চু! টুটু কোথায়, টুটু ?

বাচ্চু ॥ এক্ষুণি আসছে।

ডাক্তার ॥ মিস্ মুখার্জী—ফাইনালি রাজী হয়েছেন তো ?

বাচ্চু ॥ রাজী না হওয়ার কী আছে ?

ছায়া ॥ তাহলে ও কী করছে কী ?

[প্রভাতের টুটুকে নিয়ে প্রবেশ]

বাচ্চু ॥ এই তো এসে গেছে।

বলরাম ॥ খ্যাখো, মেয়েকে খ্যাখো। তোমার চেয়ে অনেক বিউটিফুল দেখাচ্ছে।

[বাচ্চু ইসারায় প্রভাতকে চেয়ার ও অন্যান্য আসবাব বাইরে নিয়ে যেতে বলে। প্রভাত তাই করে এবং পরে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে]

ছায়া ॥ ঠিক আমার মতো। টুটু, লক্ষ্মী মেয়ে, এখানে একটু চুপ করে দাঁড়া। খ্যাখো, এবার বুঝতে পারছ, আমার ছবিটা যখন আঁকা হয়েছিল ঠিক এই রকম দেখাচ্ছিল। (টুটুকে দেখিয়ে)।

ডাক্তার ॥ এক্সাক্টলি। পারফেক্ট। ইট্‌স অ্যাবসল্যুট্‌লি পারফেক্ট।

আপনি ঠিকই বলেছেন মিসেস মুখার্জী, ছবিটা জীবন্ত হয়ে উঠছে।

বলরাম ॥ হ্যাঁ, এখন আর কোনোরকম কিন্তু,সুতরাং, এবং, ইত্যাদি অব্যয় চলবে না। টুটুকে দেখাচ্ছে ঠিক তোমার পঁচিশ বছর আগেকার মত।

টুটু ॥ উঃ বাবা, আমার ওপর দিয়ে আচ্ছা এক্সপেরিমেণ্ট খাটিয়ে নিচ্ছ। বোরখা পরলে কী গরম লাগে মা! কানদুটো কীরকম গরম হয়ে যায়।

ছায়া ॥ দাঁড়া, এ-পাশটা ঠিক করে দিই। খুব অস্বস্তি লাগছে?

টুটু ॥ ইস্, যাচ্ছেতাই। নিন্ ডঃ মল্লিক, তাড়াতাড়ি করুন, বলুন কী করতে হবে।

ডাক্তার ॥ ইয়ে হয়েছে······অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত তো আপনাকে ওয়েট করতেই হবে।

টুটু ॥ ওরে বাবা, সেই সন্ধ্যে অবধি! তাহলে এটা এখন খুলে ফেলি?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

ছায়া ॥ তুই কী বোকা, এখন পরতে গেলি কেন?

টুটু ॥ বাঃ, একটা ট্রায়াল দিয়ে রাখলুম।

ডাক্তার ॥ ও. কে। দি ইলিউশন ইস পারফেক্ট।····আচ্ছা মিসেস মুখার্জী, আপনি····একটু দেখি····ঠিক এখানটায় এইরকম করে দাঁড়ান,····একটু ফাঁক থাক····মিস মুখার্জী, আপনি একটু এগিয়ে ....ফাইন, ফাইন!

বলরাম ॥ তুমি সময়ের ডিফারেন্সটা বোঝাচ্ছ ডাক্তার? মানে সময়ের রাস্তার মাঝে পঁচিশ বছর দূরে দূরে দুটো মাইলস্টোন?

ডাক্তার ॥ এক্সাক্টলি !

ছায়া ॥ পঁচিশ বছর ! মানুষকে কী না করে ফেলতে পারে !

বলরাম ॥ কী আর পারে ? এমন বুড়ো করে ফেলতে পারে যে সাজলেও আর ইয়ং দেখায় না। কিন্তু যাই বল ডাক্তার, তোমার প্ল্যানটা আমি এখনও ভালো করে বুঝতে পারছি না।

ডাক্তার ॥ এখনো পারবেন না, কেন না এখনও আপনি মিসেস মুখার্জীকে নর্ম্যাল ড্রেসে দেখছেন।

বলরাম ॥ কেন ? মেয়ের সঙ্গে মাকেও কি আরেক প্রস্থ বোরখা পরতে হবে নাকি ?

ডাক্তার ॥ নিশ্চয়ই তাই, ওঁর বোরখাটাতো পাশের ঘরেই রয়েছে। মানে যখনই পেসেণ্ট মিস্ মুখার্জীকে ওই রকম বোরখা পরে দেখবেন, তখনই ধরে নেবেন উনি মেহেরুন্নিসা—

বলরাম ॥ বুঝেছি, ঠিক তক্ষুণি তুমি মেয়ের মাকেও আরেকটা বোরখা পরিয়ে ওর পাশে আরেক মেহেরুন্নিসা দাঁড় করিয়ে দিতে চাও, এই তো ?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ, তাই। একজনকে ঠিক ছবির মতো দেখতে— সাড়ে তিনশো বছর আগের, আর একজন যিনি রিয়্যালি সেজেছিলেন পঁচিশ বছর, আগে। অ্যাণ্ড দিস্ উইল গিভ্ দ পেসেণ্ট এ টেরিব্‌ল মেণ্টাল শক্।

টুটু ॥ ডঃ মল্লিক, একটু এদিকে আসবেন ?

[ডাক্তার, টুটু ও বাচ্চু নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে

বলরাম ॥ (ছায়াকে) এই শুনছ ; শোনো....(ছায়া কাছে আসে

বলরাম ফিস ফিস করে বলে) ব্যাপারটা কিন্তু হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে।

ছায়া ॥ কোন ব্যাপারটা ?

বলরাম ॥ এই সন্ধ্যেবেলার প্ল্যানটা তোমার খুব ইণ্টারেস্টিং মনে হচ্ছে ? আমার তো মনে হয় মেয়েদের পক্ষে ব্যাপারটা খুব রিস্কি।

ছায়া ॥ হ্যাঁ, অর্ডিনারী মেয়েরা তাই ভাববে।

বলরাম ॥ এক্সট্রা-অর্ডিনারী মেয়েদেরও তাই ভাবা উচিত। ওই অন্ধকারের মধ্যে একটা যাচ্ছেতাই ব্যাপার হতে পারে।

ছায়া ॥ হলোই বা।

বলরাম ॥ তোমার সেলফ্ রেসপেক্ট নেই ?

ছায়া ॥ এর মধ্যে ওসব কথা আসছে কোত্থেকে ?

বলরাম ॥ তোমার না থাকতে পারে, আমার আছে। তুমি আমার স্ত্রী।

ছায়া ॥ তোমার কথা কে ভাবছে ? (সরে যায়)

বাচ্চু ॥ প্রভাতবাবু, সুকুমারবাবুকে একটু ডেকে আনুন।

[প্রভাত এতক্ষণ, আড়ি পেতে ছায়া ও বলরামের কথা শুনছিল]

প্রভাত ॥ যাচ্ছি স্যার। [চলে যায়]

ছায়া ॥ তাহলে ডঃ মল্লিক, আমরা কখন ওকে আর একবার ফেস করছি ?

ডাক্তার ॥ কেন, এক্ষুণি।....আমরা জানিয়ে যাবো যে আমরা দুজনে দিল্লী ফিরে যাচ্ছি।

বলরাম ॥ তিনজন নয়।

ডাক্তার ॥ না, আপনি না মিঃ মুখার্জী। আপনি এখানেই থাকবেন।

বলরাম ॥ কেন? ওই পাগলের হিরোইসম্ অ্যাপ্রিসিয়েট করবার জন্যে?

ডাক্তার ॥ ওঁকে বোঝাতেই হবে যে, আমরা দুজন চলে গেছি, সন্ধ্যেবেলায় তো অ্যাকচুয়েলি আপনার কোনো রোল নেই। তিনজনেই এলুম, তিনজনেই ফিরে যাচ্ছি—এতে ওঁর সন্দেহ হতে পারে! উই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট টু অ্যারাইজ্ হিজ্ সাসপিশান এগেন্। আমাদের চলে যাওয়ার ব্যাপারে ওঁর কোনো সন্দেহ থাকলে সন্ধ্যেবেলা টোটাল্ স্কীমটাই ফেল করবে। ডু ইউ আণ্ডারস্ট্যাণ্ড মিঃ মুখার্জী, ডোণ্ট ইউ?

[সুকুমার ও প্রভাত ঢোকে]

সুকুমার ॥ (বাচ্চুকে) আমাদের ডেকে পাঠিয়েছেন স্যার?

বাচ্চু ॥ হ্যাঁ, শুনুন। ওঁর সঙ্গে অ্যারেঞ্জ করুন,—এখন ডঃ মল্লিক আর মিসেস মুখার্জী—মানে, ঐ যে কী নাম যেন—

সুকুমার ॥ আজ্ঞে নূর-ই-কুতব-উল-আলম আর ইসমৎ বেগম।

বাচ্চু ॥ হ্যাঁ ওঁরা এই দরবারে ওঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দিল্লী ফিরে যাবেন।

সুকুমার ॥ বেশ। আমি তাহলে ওঁর কাছে গিয়ে বলি নূর-ই-কুতব মানে ডাক্তারবাবু শাহানশা আকবরের কাছে ওঁর হয়ে দরবার করবেন বলে দিল্লী ফিরে যেতে চান। উনি এখন নিজের ঘরে বসে শাহজাদা সেলিম সম্বন্ধে উনি যা বলেছেন তা নিয়ে

আফশোস্ করছেন। ওঁর ভয় হয়েছে—ওঁর এইসব কথা যদি কোনোক্রমে সম্রাট আকবরের কানে গিয়ে পৌঁছয় তবে তিনি হয়ত ওঁর আসল কথাটা না বুঝে ওঁকে বিদ্রোহী বলেই ধরে নেবেন। আচ্ছা, আপনারা তাহলে কাইগুলি আপনাদের ড্রেসগুলি পরে নিন।

ডাক্তার ॥ অলরাইট্....কাম অ্যালং....

সুকুমার ॥ আচ্ছা, তাহলে মিসেস মুখার্জীও আপনার সঙ্গে বোরখা পরে থাকছেন ?

ডাক্তার ॥ রাইট্। দি ইম্প্রেশন হি গেটস্ ফ্রম দি কনফ্রন্টেশন্ মাস্ট বি এ সাডেন্ ওয়ন্....ইট্ মাস্ট বি এ ট্রেমেণ্ডাস শক্। আসুন মিসেস মুখার্জী ! নাও লেটস্ গো অ্যাণ্ড গেট চেন্‌জড্।

[সুকুমার, ডাক্তার ও মিসেস মুখার্জী ভেতরে চলে যান]

টুটু ॥ আমার আবার ভয় করছে।

বাচ্চু ॥ আঃ কী আরম্ভ করেছ ?

টুটু ॥ মাদের সঙ্গে যদি আগের বারেই দাঁড়িয়ে থাকতুম তাহলেই বোধহয় ভাল হত।

বাচ্চু ॥ আরে দূর, কিছু ভয় নেই।

টুটু ॥ উনি খুব ডেঞ্জারাস্ নন তো ?

বাচ্চু ॥ আরে না না।

বলরাম ॥ বেদনা সাগরের অতলে। খুব শান্ত।

টুটু ॥ পাগলের পক্ষে আর চটে উঠতে কতক্ষণ।

বলরাম ॥ আরে বাবা তোকে মারবে না তো আর।

বাচ্চু ॥ কতক্ষণের বা ব্যাপার, দু'চার সেকেণ্ড।

টুটু ॥ কিন্তু অন্ধকারে একা একা পাগলের সঙ্গে, বাবা !

বাচ্চু ॥ আমি তো জাস্ট পাশেই থাকছি। অন্য সবাই এপাশে ওপাশে লুকিয়ে থাকবে। দরকার হলে টপ করে ঢুকে পড়তে কতক্ষণ ! তোমার মা ওঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই তোমার কাজ ফুরিয়ে গেল।

বলরাম ॥ কিন্তু প্ল্যানটা যদি ফেল্ করে।

বাচ্চু ॥ কী যে বলেন। ডঃ মল্লিক এখন এদেশের টপ সাইকিয়াট্রিস্ট।

টুটু ॥ আমারও মনে হচ্ছে প্ল্যানটা ফেল করবে না। কিন্তু ছাখো, আমার হাতগুলো কেমন কাঁপছে।

বলরাম ॥ আর টপ সাইকিয়াট্রিস্ট। কেন যে সাইকিয়াট্রিস্টগুলো বেকার প্ল্যান-ট্ল্যান্ করে বাপু কিছু বুঝি না। পাগলরা তো বেশ সুখেই থাকে। আমরাও বুঝি না, পাগলরাও বোঝে না।

বাচ্চু ॥ সুখ মানে ?

বলরাম ॥ তাদের কোনো লজিক মেনে চলতে হয় না—এই সুখ।

বাচ্চু ॥ পাগলরা লজিক মেনে চলবে কেন ? তাহলে তো তারা ভালই হয়ে যেত।

বলরাম ॥ আরে বাবা, আমিও তো তাই বলছি। তোমাদের ওই ডাক্তার একটা প্ল্যান করেছে, তার একটা লজিক আছে। তোমরা ধরে নিচ্ছ পাগল তোমাদের লজিক মানবে। আমার কথাও তো তাইরে বাবা। ও যদি লজিক মানবে তাহলে পাগল থাকবে কেন ?

বাচ্চু ॥ আপনার কথাটা বুঝলুম না।

বলরাম॥ কেন? না বোঝার কী আছে? তোমাদের প্ল্যান অনুযায়ী যখন ওই পাগল ওকে আর ওর গর্ভধারিণীকে একসঙ্গে দেখবে তখন ওকে লজিক্যাল ভাবতে হবে—এইতো? আরে বাবা প্ল্যানটা তো—তোমরা করেছ। ওই পাগলটা করে নি।

বাচ্চু॥ আপনি ডাক্তারের পুরো প্ল্যানটা ফলো করেন নি?

বলরাম॥ কেন করবো না? তাই তো ভাবছিলুম এই ডাক্তার-গুলো কেন যে মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করতে যায় বুঝি না।

বাচ্চু॥ কারা?

বলরাম॥ এই সাইকিয়াট্রিস্টগুলো!

বাচ্চু॥ তা কোত্থেকে পাশ করতে যাবে?

টুটু॥ হ্যাঁ, কোত্থেকে?

বলরাম॥ কেন? ল' কলেজ থেকে। ভাল ডাক্তার হতে গেলে তো দেখি ভাল করে বকবক করতে পারাটাই সব থেকে বড় কোয়ালিফিকেশন। যে যত বেশী বকবক করতে পারবে, সে তত বেশী বড় ডাক্তার। 'অ্যানালজিক্যাল ইল্যাসটিসিটি', 'সিমটোম্যাটাইজড্ ডাইভারশন', 'আশাব্যঞ্জক মস্তিষ্ক চালনা' ....কী সব স্টক ফ্রেজেস্! আরে তারা!

প্রভাত॥ এই রে! ঐ দেখুন! ওরা সব আসছে!

বাচ্চু॥ কোথায়?

প্রভাত॥ ওই তো শের আফগান, ডাক্তারবাবু আর ঐসব চেলা-চামুণ্ডা। ঐতো! ঐতো!

বাচ্চু॥ আপনি এখানে থাকুন।

প্রভাত ॥ আমি একা !

[টুটু, বাচ্চু ও মিঃ মুখার্জী ছুটে বেরিয়ে যান। শের আফগান, নূর-ই-কুতব-বেশী ডাক্তার, বোরখা পরা ছায়া ও দু'জন প্রতিহারীর প্রবেশ]

শের আফগান ॥ তাহলেই বলুন, আমি কি একই সঙ্গে বোকা আর বদমাইশ ?

ডাক্তার ॥ না না। বোকা কে বলেছে ?

শের আফগান ॥ তাহলে আপনার মতে আমি বদমাইশ ?

ডাক্তার ॥ না জনাবালী। আপনি বোকাও নন, বদমাইশও নন।

শের আফগান ॥ সাহেবে আলম। যদি আপনার কখনও মনে হয় আমি বোকা নয়, তাহলে আমাকে একটু বদমাইশ হতে দিন, যদি আপনার তাতে কোন অসুবিধা না থাকে।

ডাক্তার ॥ কেন আমার অসুবিধে হবে কেন ? আপনি কি আমাকে বদমাইশ ভাবছেন ?

শের আফগান ॥ সুভানাল্লাহ্। আপনাকে আমার চিরকালই ভাল লাগে। খুব সৎ। আচ্ছা, আপনারা এখান থেকে দিল্লী ফিরে যাচ্ছেন তো ?

ডাক্তার ॥ জী জনাব !

শের আফগান ॥ বিদায় নেবার আগে আমি বেগম সাহেবার সঙ্গে একটু কথা বলে নিতে চাই।....আপনার মেয়ে মেহেরকে কি আপনি খুব ভালবাসেন ?

ছায়া ॥ হ্যাঁ।

শের আফগান ॥ আমার শত্রু, ঐ আসলাম খাঁর দল আমার সম্বন্ধে যে সব গুজব রটিয়েছে সেগুলো কী আপনি বিশ্বাস করেন ?

ছায়া ॥ না, কখনও না !

শের আফগান ॥ আচ্ছা ! তাহলে আপনি চান····

ছায়া ॥ কী ?

শের আফগান ॥ আমি এমন কি আমার জীবনের বিনিময়েও মেহেরকে ভালবাসি ! বেশ, তাই হবে। কিন্তু আপনি নিজে কখনও শাহাজাদা সেলিমকে প্রশ্রয় দেবেন না।

ছায়া ॥ না, কখনও না। আমি তো দিই না। মেহেরও কখনও দেয় না।

শের আফগান ॥ বলবেন না, ও কথা বলবেন না। একথা শুনলে আমি ঠিক থাকতে পারি না !

ছায়া ॥ যাই হোক না কেন, তুমি তো মেহেরকে ভালবাস।

শের আফগান ॥ ও আপনি জানেন না ? আপনি জানেন ? কিন্তু দুঃখ কি জানেন ? মেহের বোধ হয় জানে না। বোধ হয় জানতে চায়ও না।

ছায়া ॥ ও নিশ্চয়ই জানে। আমি তো ওর মা। আমি জানি। ও আমাকে সব কথা বলে।

শের আফগান ॥ আপনি ওর মা, তাই ওর দোষ ঢাকছেন। কিন্তু আমি জানি····সাহেবে আলম। বড্ড দেরীতে, অনেক দেরীতে বুঝতে পারলাম, আমার বেগম আছে, আমার বেগম থাকা দরকার। আর সে বেগম····কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সব জেনেও আমি তাকে ভালবাসি। হয়তো বোকামি। বেগম

সাহেবা! আপনি আল্লার নাম করে বলুন তো যে আপনার মেয়ে এখনও আমাকে ভালবাসে। বলুন, বলতে পারবেন না।

ছায়া॥ আমি মিথ্যে বলিনি। সেইজন্যেই তো···

শের আফগান॥ বুঝেছি। তার মানে আপনার মতে সব জেনে-শুনেও আমার বোকামী করে যাওয়া উচিত। বুঝি সবই বুঝি! সবাই আমাকে দয়া করে। কিন্তু এখনও কেউ বুঝতে পারেনি ভালই হয়েছে, এরকমই হওয়া দরকার···হয়তো শের আফগানের নসিব এই রকমই হওয়ার কথা ছিল। (ডাক্তারকে) জনাব আলী! আপনি শাহাজাদা সেলিমকে বলবেন, যে দিল্লীর লড়াইয়ের মাঠ অনেক চওড়া, সেখানেই দেখা হবে। আর যদি বর্ধমান পর্যন্ত এগিয়ে আসেন, তাহলে এখানেও লড়াইয়ের জন্য অনেক ঢালু জমি আছে। (ছায়াকে) আর সেদিনও আপনি দেখবেন, সব কিছু জেনেও আমি আমার বেগমের ইজ্জতের জন্য লড়াই করতে পারি কিনা····এ পর্যন্ত কত মেয়েই তো এলো। তারা সবাই বলেছে, তারা মেহেরুন্নিসা। বুঝতেই পারছেন, যে সব মেয়েদের আমি ভোগ করেছি। কিন্তু যখনই তাদের জিজ্ঞাসা করেছি, তুমি কি মেহের? অমনি কেমন অসহায় হাসি হাসি মুখে তারা আমার দিকে তাকিয়েছে। বুঝতেই পারছেন! মোম নিভিয়ে দেওয়া অন্ধকারে বিছানায় দুজন উলঙ্গ নারীপুরুষের কী পরিচয় তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাইনি। আমাদের পোশাকগুলো ঝুলতে লাগলো দেওয়ালে, বিছানায়, মেঝেয় কতগুলো অশরীরি ছায়ার মতো। 'কীসের ছায়া? কতকগুলো মানসিক বিকার, কতকগুলো বিকৃত চিন্তা।

দিনে আমরা ভয় পাই না, রাতে পাই। কী বিকৃত! একজনের বিরুদ্ধে এগারো জন। খোলা তলোয়ার হাতে হাসছে, থামছে! তখন আমি আমার শিরার মধ্যে রক্ত প্রবাহের শব্দ শুনতে পাই। অন্ধকার রাতে বৃষ্টির পায়ের শব্দের মত। যুদ্ধের বিকেলে যেন আজান। আজান।.... আমাকে মাপ করবেন। আমি আপনাদের অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। বিদায় বেগম সাহেবা! সাহেব-এ-আলম বিদায়!

[কুর্ণিশ করতে করতে ডাক্তার ও ছায়ার প্রস্থান]

বোকা বোকা বোকা! তোমরা আমার হাতের বাঁশি, যেমন বাজাই তেমনি বাজো। হাল্কা করে ছুঁই, বাঁশী বেজে উঠে। যদি বলি গান গাও তো বাঁশী, বাঁশি গান গায়। (প্রভাতকে) ওই দাড়িওয়ালাটা ডাক্তার না? আচ্ছা ওরা তো জানত যে আমি পাগল, তবু আমি যেমন চেয়েছিলুম, সে রকম দাড়ি লাগিয়ে, আলখাল্লা পরে 'জনাব আলী—জনাব আলী' করছিল কেন বলত? সবটাইতো আমার পাগলামির খেলা তাই না?

[প্রভাতের পতন ও মূর্ছা। প্রতিহারী দু'জন ভয়ে দু'দিক দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। সেই মুহূর্তে বাকী সভাসদেরা ছুটে এসে ঢোকে।]

শের আফগান ॥ এই শোন, ওরা সব এই ঘরে এসেছিল, ওরা বোধ হয় আসলে খানিকটা মজা করতে এসেছিল, না? সবাই যেমন ভাবে, পৃথিবীর আর সবাই আমাকে নকল করুক, আমার ইচ্ছে মেনে চলুক, ঠিক তেমনি ওরাও চেয়েছিল, আমি ওদের

মত হয়ে যাই। আর কারো সম্বন্ধে একজনের নিজের ধারণা, নিজের বিচার যখন কেউ জোর করে সবার ওপরে চাপাতে চায়, তখন সহ্য করা যায়? তাই আমিও সহ্য করিনি। তাই আমিও ওদের এক পাগলের ইচ্ছের কাছে মাথা হেঁট করিয়েছি। ওদের কথা বানাতে হয়েছে, মাথা নোয়াতে হয়েছে। ঐ যে সেই নূরজাহান নাটকের রাত্তিরে সেই যে অ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল —শের আফগানের পোশাক পরে সেই যে আমি ব্যাকস্টেজে সেন্সলেস হয়ে পড়ে গিয়েছিলুম—মাথায় ভীষণ চোট লেগেছিল —তারপর থেকেই···কী, তোমরা এ ওর দিকে অমন করে তাকাচ্ছ কেন? কী ভাবছ, আমি পাগল? বেশ—আমি পাগল। দাঁড়াও, দু'পাশে দাঁড়াও।

[সকলে দু'পাশে দাঁড়ায়, প্রভাতও এই সময় উঠে দাঁড়ায়]

বসো—ওঠো—বসো—ওঠো

[সবাই বসে ও ওঠে]

আঃ কী হচ্ছে কী? অন্য কেউ এরকম করতে বললে তো তোমরা প্রতিবাদ করে উঠতে। আমি তো বুঝতে পারছি না তোমাদেরই বা পাগল বলা হবে না কেন? এই তো আমি তোমাদের সামনে শের আফগান দাঁড়িয়ে আছি। একি কখনও হতে পারে? শের আফগান কি কখনও বেঁচে থাকতে পারে এই নাইনটিন সেভেন্টিতে? [অথবা যে সালে নাটকটি হচ্ছে সেই সাল]। তোমরা বেঁচে আছো, অথচ সাড়ে তিনশো বছরের পুরোনো নীতিতে ওঠো আর বসো? তোমরা তো নিজেদের মধ্যে বলাবলি করো সামনে যে সকাল সে সকাল

আমাদের। আমরা সবাই মিলে সে সকালকে এনজয় করব! কিন্তু পারো কি? কী পারো? সংস্কারের কাঁটা, কতগুলো পুরোনো রীতিনীতি তোমাদের পথ আগলে রেখেছে। তোমরা কেউ একটা নতুন কথা বলতে পারো? এনিথিং ওরিজিন্যাল? চেষ্টা করে ছাখো, দেখবে তোমরা যা বলবে, কেউ না কেউ সে-কথা আগেই বলে মরে গেছে। তোমরা শুধু কতকগুলো পুরোনো কথাকে উগরে দিতে পারো। কতগুলো মরা কথা চিবিয়ে চিবিয়ে তোমাদের চোয়াল ব্যথা হয়ে গেছে। তোমাদের পাকস্থলী জীর্ণ হয়ে গেছে। তোমরা কেউ বেঁচে নেই, কেউ না। ....তোমরা বোধহয় আমার কথা কিছুই বুঝতে পারছ না, না? (প্রভাতকে) তুমি তো কিছুই বুঝছ না বোধ হয়.... তোমার নাম কী?

প্রভাত ॥ (প্রচণ্ড নার্ভাস) আমার? আজ্ঞে আমার নাম কাশেম খাঁ আলী....ইয়ে....কাশেম আলী খাঁ।

শের আফগান ॥ তোমার আসল নাম কি?

প্রভাত ॥ ইয়ে....ইয়ে....আমার আসল নাম ঝণ্টু...ইয়ে প্রভাত।....

শের আফগান ॥ প্রভাত? এই এক্ষুণি ভোরের কথা হচ্ছিল।

প্রভাত ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রভাতকুমার হালদার।

শের আফগান ॥ কতবার আমি তোমাদের আসল নাম শুনেছি। তোমরা যখন এ ঘরে, আমার আড়ালে হৈ হৈ করতে নিজেদের মধ্যে—তখন তো তোমরা নিজেদের নাম ধরেই ডাকতে। (সুকুমারকে) আমি আপনার নাম জানি, সুকুমার চৌধুরী?

সুকুমার ॥ জী জনাব !

শের আফগান ॥ (ননীকে) তোমার নামও জানি। ননী মিত্তির।

ননী ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার !

শের আফগান ॥ (উপেনকে) আপনার নামটাও জানি। কী যেন আপনার নাম ?

উপেন ॥ আজ্ঞে উপেন্দ্রকিশোর চট্টোপাধ্যায়।

শের আফগান ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ উপেন্দ্রকিশোর....বাঃ বেশ নাম তো।

সুকুমার ॥ আপনি ...আপনি তাহলে....

শের আফগান ॥ তাহলে কী ? কিছু না ! আসুন তো সবাই একসঙ্গে বসা যাক, একটু প্রাণ খুলে হাসা যাক, কী মজাটাই না করা গেল এতক্ষণ।

সকলে ॥ আপনি তাহলে সেরে গেছেন ? কী আশ্চর্য ! তাহলে... আমরা তো....আরে গ্যাখো।

শের আফগান ॥ বসুন, বসুন সবাই। [সকলে বসে, কিন্তু প্রভাত দাঁড়িয়েই থাকে। শের আফগান উঠে তার কাছে যান] তুমি হাসছ না কেন ? তুমি আমার ওপর রাগ করেছ ? এ্যাই— গ্যাখো, তোমার বাঁ-পায়ের জুতোটা ওখানে পড়ে আছে। নিয়ে এসে বস।

[প্রভাত জুতোটা তুলে নিয়ে এসে বাকী সকলের সঙ্গে বসে পড়ে]

(প্রভাতকে) রাগ করোনা বুঝলে। পৃথিবীতে সব লোকেরই ইন্টারেস্ট থাকে যাতে কিছু লোক পাগল হয়ে থাকে। ঐ যারা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল ওদের আমি চিনি। অনেক

—অনেক বছর আগে ওদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। আচ্ছা ওরা তো জানত আমি পাগল। তবু ওরকম বোরখা-টোরখা পরে, ওরকম বাঁকানো লাঠি নিয়ে জনাব আলী জনাব আলী করছিল কেন বলত? (প্রভাতকে) তুমি বলতো?

প্রভাত॥ আজ্ঞে ওঁরা ভেবেছিল যে আপনি....ইয়ে....আপনি....

শর আফগান॥ এই শোন। আমার চোখের দিকে তাকাও, তাকাও—সোজা মনির ভেতরে—তাকাও, ভয় পেয়ো না!

প্রভাত॥ আজ্ঞে....এইতো....দেখছি।

শর আফগান॥ না, না, তুমি ভয় পাচ্ছ। ভয় পেয়ো না, জানো। ভয় পেলে মানুষের মনে হয় পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, তখন মানুষের যাচ্ছেতাই কথা বিশ্বাস করতে হয়। পাগলের সামনে দাঁড়াতে মানুষের এইরকম ভয় হয়। কেন জানেন? সে যে আপনার এতকালকার সব বিশ্বাসের ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়—সে যে আপনাদের লজিক, যে লজিক কষ্ট করে মেনে এসেছেন তার বাইরে কথা বলে! কীই বা করা যাবে বলুন? পাগল হওয়ার এই তো মজা, তারা লজিক ছাড়াই ভাবতে পারে। বলা যেতে পারে তারা প্রতিদিনকার পরিবর্তিত লজিক নিয়ে ভাবতে পারে—আজ একরকম ভাবছে, কাল একরকম। গঙ্গার ঘাটে সার সার নৌকো দেখেছেন? সার সার নৌকো। জেলেদের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা টুপ্‌টুপ্ করে লাফ দিয়ে এ-নৌকো থেকে ও-নৌকোয় চলে যায়। পাগলদের লজিকগুলোও সেই রকম। হাল্কা ডালের ময়না পাখীর মত—আজ এ-ডালে কাল ও-ডালে। জানেন—ছোটবেলায় ঠাকুমার কোলে চড়ে বায়না করতুম;

ঠাকুমা, চাঁদ ধরব।' ঠাকুমা বলতেন, 'আকাশের ঐ চাঁদ তো ধরা যায় না, ডোবার জলে যে চাঁদের ছায়া পড়েছে, ঐটা ধরো।' ভাবতুম ঐটেই বুঝি সত্যি চাঁদ। না না, আমি কক্ষণো বলব না, আপনারা আমার মতো এইসব ভাবুন, আর ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যান। কিন্তু শুধু একবার, একজন আরেকজনের চোখের দিকে তাকান, যেমন করে আমি একদিন বহুদিন আগে তাকিয়েছিলুম। কী দেখবেন জানেন? দেখবেন এক বিরাট অজানা অচেনা পৃথিবীর দরজার সামনে ভিখিরির মত দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার পাশ দিয়েই হয়তো আপনারই কোন বন্ধু সেই দরজা ভেদ করে ভেতরে চলে গেল। অথচ আপনি কী অসহায়, আপনি সারাজীবন সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন!....বাইরে সন্ধ্যে হয় নি? আজ আলো আনবে না...

ননী ॥ হ্যাঁ, মোমবাতিগুলো আনব আমরা?

শের আফগান ॥ কেন, এই তো এখানে বেশ ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে। তোমরা আমার সামনে মোম জ্বালো, আর সরে গেলেই তোমরা ইলেকট্রিক আলো জ্বালাও। আমি বুঝিনা ভাবছ? আমি না দেখার ভান করেছি।

উপেন ॥ তাহলে?

শের আফগান ॥ না, কিছু না! এত আলো বড্ড চোখে লাগে। যাও, মোমগুলো নিয়ে এস।

[প্রভাত ছাড়া বাকী সবাই চলে যায়]

আমাকে ভয় পেয়ো না বুঝলে। ওই যারা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল ওদের আমি চিনি। অনেক—অনেক

দিন আগে ওদের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিল। তারপর কতদিন কেটে গেল....কখন আমার সমস্ত চুল সাদা হয়ে গেল....আর আমি একা এই ঘরে বসে....পাঁচিশ বছর....দীর্ঘ পঁচিশ বছর....

[মোম নিয়ে সবাই ঢোকে]

আঃ, থ্যাঙ্ক ইউ....থ্যাঙ্ক ইউ ফর দ্য লাইট।....কাছে, আরে কাছে সরে এসো....হৃদয়ের অনেক কাছে যেন....

[সবাই কাছাকাছি বসে]

জানো, পেছনে যদি একটা বিরাট বড়ো জানলা থাকত, আর আকাশে থাকত পূর্ণিমার চাঁদ, তাহলে চাঁদের ওপর জোর হুকুম খাটিয়ে নেওয়া যেত, বল ! বলা যেত, কই হে ভায়া চাঁদ, এক রিম আলো পাঠাও দিকিনি। চাঁদটাকে আমার ভীষণ ভালো লাগে। কত দিন আমি ওঘরে জানলায় বসে চাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেছি আর ভেবেছি, কে জানে....ও হয়ত এই সাড়ে তিনশো বছরের সব কথা জানে। দ্যাখো হে দ্যাখো, কি দারুণ একটা অ্যাটমসফিয়ার হয়েছে, শের আফগান ও তার সভাসদবৃন্দ ! তোমাদের ভাবতে অবাক লাগছে না ?

উপেন ॥ অবাক লাগছে যে, এসব সত্যি নয়।

শের আফগান ॥ সত্যি নয় ? কী সত্যি নয় ?

উপেন ॥ আজ্ঞে না, আমি আজ সকালে এই প্রভাতবাবুকে বলছিলাম—আজ সকালেই উনি জয়েন করলেন কিনা—বলছিলুম যে, এই সেট, কস্ট্যুম, মেকআপ—সব অকারণে নষ্ট হচ্ছে।

শের আফগান ॥ নষ্ট হচ্ছিল বলে আপনার দুঃখ হচ্ছিল ?

সুকুমার ॥ আজ্ঞে না....মানে তখন আমরা ভেবেছিলুম যে....

শের আফগান ॥ সবটাই ভান ?

ননী ॥ আজ্ঞে না, ভেবেছিলুম যে সবটাই সিরিয়াস্।

শের আফগান ॥ এখন কী মনে হচ্ছে ? সিরিয়াস্ নয় ?

সুকুমার ॥ আজ্ঞে না, মানে ···

শের আফগান ॥ লজিক—লজিক প্লিজ্। আপনারা একটা কথাও গুছিয়ে বলতে পারেন না ? আপনারা যদি থিয়েটার করতেন, তাহলে খুব খারাপ থিয়েটার করবেন। আপনাদের অ্যাটমস-ফিয়ারের কোন সেন্সই নেই। আপনারা যখন এই সব মেকআপ নিয়ে, এরকম কস্ট্যুম পরে, তলোয়ার ঝুলিয়ে এঘরে আসতেন বা পাশের ঘরে যেতেন, কখন কনস্ট্যাণ্টলি আপনাদের বোঝা উচিত ছিল যে আপনারা সাড়ে তিনশো বছরের আগেকার লোক। তাহলেই সব কিছু ঠিক মনে হত, কিছু আনন্যাচারাল্ মনে হত না। যেমন অনেক অভ্যেসের পর আজকের এই নাইনটিন্ সেভেনটির লাইফটা নরম্যাল মনে হচ্ছে। ইতিহাসে থাকার একটা দারুণ মজা—না ? আমরা কেমন ইতিহাসের জানলা থেকে দেখছি, সাড়ে তিনশো বছর পরে নাইনটিন্ সেভেন্টিতে সবাই কিরকম ছুটোছুটি করছে। তাইতো সবাই ইতিহাস পড়ে। ইতিহাসে যা কিছু ঘটে গেছে তাকে কেউ বদলাতে পারবে না। ইতিহাসে সব কিছু মহান। প্রেম, স্নেহ, দয়া, মায়া, মমতা, ঈর্ষা—সবকিছু মহান—মহান !

সুকুমার ॥ বিউটিফুল—বিউটিফুল।

শের আফগান ॥ হ্যাঁ বিউটিফুল। বিউটিফুল ছিল, কিন্তু এখন আর তো নেই। কারণ এখন তো আমি ভাল হয়ে গেছি।

O, now for ever
Farewell the tranquil mind ! Farewell content !
Farewell the plumed troops, and the big wars
That makes ambition virtue ! O, farewell !
Farewell the neighing steed and the shrill trump,
The spirit-stirring drum, th'ear-piercing fife,
The royal banner and all quality,
Pride, pomp, and circumstance, of glorious war !

[বড় মোমদানের মোমগুলো ছাড়া বাকী মোমদানের মোমগুলো নিভিয়ে দেন]

সেই ইতিহাসের রাজত্বে আমরা সবাই—সবাই নির্বাসিত, আচ্ছা ভাই, ফর দ্য লাস্ট টাইম, নিজেদের মধ্যে একটা ভদ্রলোকের প্যাক্ট হবে ?

[সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়]

আচ্ছা, ঐ যে যারা দেখা করতে এসেছিল—ঐযে জনাব নূর-ই-কুতব-উল-আলম, আর ঐযে ইসমৎবেগম, মানে আমার শাশুড়ী, এখন ওরা আমার এখান থেকে বিদায় নিয়ে দিল্লী ফিরে গেলেন ?

[সবাই মাথা নেড়ে সায় দেয়]

আসলে ওরা এখন পাশের ঘরে বসে ফিস ফ্রাই আর কাটলেট খাচ্ছে, তাই না ? ওদের কিছুতেই জানতে দেওয়া হবে না যে আমি ভাল হয়ে গেছি। আর একবার ঐরকম বোরখা-টোরখা

পরে ঐ রকম বাঁকানো লাঠি নিয়ে জনাব আলী—জনাব আলী —মেশ মজা করা যাবে—কেমন ?····কে ? কে ওখানে ?

ইয়াকুব ॥ (নেপথ্যে) সাহেব-এ-আলম !

ননী ॥ ইয়াকুব ! ইয়াকুব বুড্‌ঢা। রোজকার মত ঘড়ির কাঁটা ধরে এসেছে।

রমেশ ॥ (ননীকে) দাঁড়া, ওকে নিয়ে খানিকটা মজা করা যাবে।

শের আফগান ॥ না না ছিঃ, ওকে ঠাট্টা করছো কেন ? ওই একমাত্র লোক, যে আমাকে ভালবাসে বলে এই পঁচিশ বছর আমাকে ছেড়ে কোথাও যায় নি।

সুকুমার ॥ দূর বোকা, সব কিছুই আগের মত থাকবে, বুঝতে পারছিস না ?

শের আফগান ॥ হ্যাঁ ঠিক 'আগের মত। এই এতকাল ধরে যেমন চলে এসেছে, ঠিক তেমনি, তাহলেই সব সত্যি বলে মনে হবে। আমার জীবনের সমস্ত দলিল শাহজাদা সেলিমের লোকেরা নির্দয়ভাবে ধ্বংস করেছে। শুধু এক দরবেশ আমাকে ভালবাসতো বলে আমার জীবনী লিখে রেখেছিল, ওকে তোমরা ঠাট্টা কোরো না।

[মোম ও লেখার সরঞ্জাম হস্তে ইয়াকুব প্রবেশ করে]

····আইয়ে সাহাব আইয়ে। বৈঠিয়ে। যাও তোমরা সব···· বাইরে যাও। [সকলে চলে যায়]

ইয়াকুব ॥ (লেখার সরঞ্জাম প্রস্তুত করে) সাহেবে আলম····ম্যায় তৈয়ার।

শের আফগান ॥ লিখিয়ে :জনাব—দিল্লী শহরমে যো ফরমান দিয়

গ্যায়া উঁসমে আমীর ঔর রইস আদমী য়োঁকো যিত নাহি শকা গরীব ঔর কমজোরী লোগোঁকো উতনাহি লুকসান....ইয়ে ফরমান পহলেবালোঁকো রূপেয়া ঔর ইজ্জত দিয়া, গরীবকোঁ দিয়া ভুখ ঔর মৌৎ। সিরিফ ভুখ ঔর মৌৎ।

[পর্দা পড়ে]

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

[একই দৃশ্য। মঞ্চ নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। ছবির ফ্রেম থেকে ছবিদুটো খুলে নেওয়া হয়েছে। মেহেরুন্নিসার ছবির ফ্রেমে বোরখা পরে টুটু এবং শের আফগানের ছবির ফ্রেমে শের আফগানের ছদ্মবেশে বাচ্চু দাঁড়িয়ে আছে। নেপথ্য থেকে শের আফগান ও সভাসদদের কথাবার্তা শোনা যায়। শের আফগান, "না, না, তোমাদের আসতে হবে না, আমি একাই যেতে পারব"—বলতে বলতে হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ঢোকে। মঞ্চের একদিকের মোমদানের ওপর মোমটি জ্বালিয়ে অন্যদিকের মোম জ্বালাতে যায়, সেই মুহূর্তে টুটুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়—]

টুটু ॥ শের আফগান !

শের আফগান ॥ কে ডাকছে আমাকে !

টুটু ॥ শের আফগান ! শের আফগান ! শের আফগান !

[শের আফগানের আর্তনাদ ও মূর্ছা। ডাক্তারের নেপথ্য নির্দেশে মঞ্চে আলো জ্বলে ওঠে ও সকলের দ্রুত প্রবেশ]

মাগো আমার ভয় করছে, আমার ভীষণ ভয় করছে।

বাচ্চু ॥ না না, টুটু।

ছায়া ॥ এই টুটু, এই তো আমি! আমরা সবাই তো আছি!

ডাক্তার ॥ স্টপ....নট, অ্যানাদার। উই মাস্ট নট গো অন্ উইথ ইট্, দেয়ারস্ নো নীড....

ছায়া ॥ এই টুটু, ছাখ—ও সেরে গেছে, দেখতে পাচ্ছিস! দেখছিস?

বাচ্চু ॥ সেরে গেছে মানে?

বলরাম ॥ আসলে সবটাই ঠাট্টা। নে, এখন থাম একটু।

টুটু ॥ না আমার ভয় করছে, ভীষণ ভয় করছে।

ছায়া ॥ চেয়ে দেখ! ওর দিকে তাকিয়ে ছাখ! ও কোনোদিন পাগল ছিল না। শুনছিস?

বাচ্চু ॥ কী বলছেন আপনি? কোনোদিন পাগল ছিল না....সেরে গেছে,....মানে?

ডাক্তার ॥ ইট সারটেইনলি সীমস্ সো। অ্যাজ ফার অ্যাজ আই-অ্যাম কনসারন্ড্....আই শুড সে....

বলরাম ॥ আরে আলবাৎ সেরে গেছে! আমাকে বললো ওরা!

ছায়া ॥ অনেক আগেই সেরে গেছে। ওদের ও নিজে বলেছে।

বাচ্চু ॥ কিন্তু এই তো একটু আগেও....

বলরাম ॥ এ্যাক্টিং করছিল, এ্যাক্টিং। তোমাকে আচ্ছা বোকা বানিয়েছে।

বাচ্চু ॥ ইজ্ ইট্ রিয়ালি পসিবল্? নিজের একমাত্র বোন মারা যাবার আগের দিন অবধি তাকে এমনি করে ঠকানো!

শের আফগান ॥ কী বলছ?

বাচ্চু॥ কী বলছি মানে ?

শের আফগান॥ শুধু তোমার বোনই মরে নি !

বাচ্চু॥ আমার বোন ? আমি আপনার বোনের কথা বলছিলুম, আমার মা। তাকে আপনি তার মারা যাবার দিন পর্যন্ত আপনার মা মিনা বেগমের রোলে এ্যাক্টিং করতে ফোরস্ করেছেন।

শের আফগান॥ উনি তোমার মা ছিলেন, না ?

বাচ্চু॥ হ্যাঁ আমার মা ! আমার মা !

শের আফগান॥ তাহলে আমার ? আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আর এই কত দূরে অন্য বাড়িতে দিদি মারা গেছে। তোমার মা মারা গেছে। আর তুমি ঐ ওখানে থেকে ছুটে এলে। তুমি কি করে জানলে যে এই শের আফগান সেজেও লুকিয়ে আমি চুপি চুপি তার জন্য কাঁদিনি ?

ছায়া॥ কী বলছে ও ?

ডাক্তার॥ কোয়াইট···প্লীজ কোয়াইট।

শের আফগান॥ কী বলছি ? বলছি যে মিনা বেগম শের-আফগানের মা ছিলেন না ? মেহের তুমি তো জান। তুমি বলো।

টুটু॥ না না আমি জানি না। আমি এসব কিছু জানি না।

ডাক্তার॥ পাগলামিটা আবার ফিরে এসেছে। আপনারা একটু চুপ করে থাকুন।

বলরাম॥ পাগলামীর নিকুচি করেছে। অভিনয়—অভিনয় হচ্ছে।

শের অফগান॥ তুমি আমাকে অভিনয় করতে দেখছ ? তুমি ! তুমিই তো ওখান থেকে ঐ ছবি দুটোকে ছিঁড়ে ফেলেছ।

আর তার বদলে অন্য দুজনকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিলে তো তুমিই।

বলরাম ॥ হ্যাঁ, ঢের ঠাট্টা হয়েছে!

শের আফগান ॥ ঠাট্টা?

ডাক্তার ॥ আঃ, ওঁকে আর এক্‌সাইট করবেন না। ফর গডস্ সেক্—

বলরাম ॥ ওরা বলেছে এটা ঠাট্টা। ওরা বলেছে! ওরা।

শের আফগান ॥ তোমরা! তোমরা বলেছ এটা ঠাট্টা?

সুকুমার ॥ হ্যাঁ জনাব! সত্যি কথা বলতে কি আমরা বলেছিলাম যে আপনি সেরে গেছেন।

বলরাম ॥ উঃ এনাফ্। কী গো? আর কতক্ষণ তোমরা এসব পোশাকপত্তর পরে ছেলেমানুষি করবে?

ছায়া ॥ তুমি চুপ করো। আমরা যাই পরে ছেলেমানুষি করি —তোমার কী? ও যতক্ষণ না ঠিকমত সেরে যাচ্ছে আমি এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না।

শের আফগান ॥ কে সেরে যাবে? আমি? হ্যাঁ, আমি সেরে গেছি। কিন্তু তোমার ইচ্ছেমতো এখানেই ব্যাপারটা শেষ হবে না। তোমাকে আরও অনেক দূর আমার সঙ্গে যেতে হবে। জানো গত কুড়ি বছরের মধ্যে তোমাদের এই দুজনের মত এ রকম পোশাক পরে কেউ এখানে ঢুকতে সাহস করে নি?

বলরাম ॥ খুব জানি। আজ সকালেই তো আমি—

শের আফগান ॥ আলখাল্লা পরে এসেছিলে?

বলরাম ॥ তুমি মনে করেছিলে যে আসলাম খাঁ, আর আমি তাতে হাসিনি পর্যন্ত। কেনন্না আমি ভেবেছিলাম····

শের আফগান ॥ যে আমি একটা পাগল। এখন আমি তো সেরে গেছি। এখন ওকে ওরকম একটা বোরখা পরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তোমার হাসি পাচ্ছে—না? আমার তো ওকে একটা....ছিঃ আপনি ডাক্তার না?

ডাক্তার ॥ হ্যাঁ মানে আমি....

শের আফগান ॥ আপনি ওদের দুজনকে মেহেরুন্নিসা সাজিয়ে দাঁড় করিয়েছেন। জানেন? আপনি কি করতে গিয়েছিলেন? হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্যে সেই অন্ধকার ফাঁকা কালো রাত্রিটা আমার মাথায় চেপে বসেছিল? আমি আবার পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম। ভাবলাম একী? ছবি কথা কইছে। ফ্রেম থেকে সরে আসছে। আপনি অবশ্যি ভালোই ধরেছিলেন, একই পোশাকে দুজন! কী এখন আর অভিনয় করা চলবে? চলবে না? বেশ তাহলে এই পোশাকপত্তর ছেড়ে রঙটং মুছে তোমাদের দলেই মিশে পড়া যাক্—কী বল?

বলরাম ॥ আমাদের দলে, মানে? আমাদের সঙ্গে?

শের আফগান ॥ হ্যাঁ, তোমাদের দলে মানে, তোমাদের সঙ্গে। কোথায় যাব বল? রাস্তায় সিনেমায়? থিয়েটারে? নাকি তোমাদের সঙ্গে গিয়ে তোমাদের সংসারটা দেখে আসবো একবার?

বলরাম ॥ যেখানে যেতে চাও বল। এখন তো তুমি ভাল হয়ে গেছ। এক দারুণ আনন্দের দিনে ভাগ্যের অভিশাপে এই এতগুলো বছর ধরে একা একা যে জীবন তুমি কাটিয়েছ, আর কি তেমনি করে থাকতে পার? উঃ, ভাবতে অবাক লাগে

তুমি এই এতগুলো বছর এমনি একা কাটিয়েছ। সেদিন সেই অ্যাক্সিডেণ্ট-এর পর তুমি যদি বেঁচে না থাকতে তবুও আমার এতটা দুঃখ হতো না।

শের আফগান॥ হ্যাঁ। কী জানো? সেই যে থিয়েটার করতে করতে ব্যাক্স্টেজ-এ দোলনার দড়ি ছিঁড়ে গিয়ে আমি পড়ে গিয়েছিলুম, ঐ যে সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলুম, মাথায় চোট লেগেছিলো--তার পরেই আমার মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল জানো? এমনি অনেকদিন, বহুদিন ধরে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলুম জানো?

ডাক্তার॥ হ্যাঁ, কতদিন বলুন তো? বলুন? দিজ ইজ মোস্ট ইম্পরট্যাণ্ট।

শের আফগান॥ তা অনেকদিন। প্রায় দশ-এগার বছর। একদিন বুঝলে ডাক্তার, আমার মাথার গোলমালটা ঠিক হয়ে গেল। আমি চোখ খুললুম, বুঝতে পারলুম না, আমি জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আসলে আমি জেগেই ছিলুম! আশে-পাশে সব কিছু আমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখতে লাগলুম। তারপর সব বুঝতে পারলুম....থাকগে, কি হবে এসব কথা বলে। তুমি ঠিকই বলেছ ডাক্তার! এই পোশাকপত্র ছেড়ে রং-টং মুছে এখান থেকে পালাই। কিন্তু কোথায় যাব বলত? যেখানেই যাব সবাই তো আমাকে আঙুল দেখিয়ে বলবে "ঐ তো—ঐ তো শের আফগান যাচ্ছে।" "শের আফগান"। তোমরা সবাই আমায় ঘিরে থাকলেও বলবে, 'শের আফগান'।

বলরাম॥ না না, কি যা-তা বলছো! তাই কি কেউ বলে?

ছায়া॥ কার এতবড় সাহস ? এখন ওসব কথা আর ভেব না। যা হয়েছিল ওটা একটা এ্যাক্সিডেন্ট।

শের আফগান॥ হ্যাঁ এ্যাক্সিডেন্ট। এ্যাক্সিডেন্ট হবার আগেও সবাই আমাকে ঠাট্টা করে বলতো পাগল। তুমি, তুমিই সবচেয়ে বেশী করে বলতে। কেউ আমার হয়ে কিছু বলতে গেলে তুমিই তাকে সবচেয়ে বেশী ঠাট্টা করতে।

বলরাম॥ আরে ভাই ওসব কথা বাদ দাও। সেসব ঠাট্টা করে বলেছি।

শের আফগান॥ এ্যাই ! আমার চুলের দিকে তাকিয়ে দেখ।

বলরাম॥ (হেসে) সে আমার চুলও তো পেকে গেছে।

শের আফগান॥ তোমার চুলতো পেকেছে বাইরে, আমার চুল পেকেছে এখানে, এই ঘরের মধ্যে যখন আমি শের আফগান ছিলুম তখন। ডাক্তার, যেদিন আমি প্রথম চোখ মেললুম, দেখলুম একী আমার অনেক চুল যে সাদা। বুঝলুম আমি অনেক বুড়ো হয়ে গেছি। আমার যৌবন শেষ হয়ে গেছে। আমি শেষ। আমি ধ্বংস হয়ে গেছি। কোথায় এক বিরাট ভোজসভায় আমার নিমন্ত্রণ ছিল। সেখানে সব শেষ হয়ে গেছে। ভিখিরীরাও পাতা কুড়িয়ে নিয়ে বিদায় নিয়েছে। এমন সময় রাক্ষুসে নেকড়ের খিদে নিয়ে আমি সেখানে এসে পৌঁছুলুম।

বলরাম॥ কিন্তু—এই তো পৃথিবীর নিয়ম।

শের আফগান॥ কী নিয়ম ? আমার সমস্ত সুখকে তছনছ করে দেওয়া নিয়ম ? আমি যখন ঐ নূরজাহান নাটকে ফার্স্ট

এ্যাক্ট-এর শেষে সেকেণ্ডারী প্ল্যাটফরম্-এর ওপরে জ্যাম্প্ করে এসে লড়াই করছিলুম তখন আমি দেখতে পেলুম যে একজন প্রম্পটার-এর টুল থেকে বই নিয়ে উঠে গেল ; বইটাকে কামড়ে ধরল মুখে, আর একটা ছুরি নিয়ে আমার দোলনার দড়িটা কেটে দিতে লাগল। এটাও নিয়ম ? কোন নিয়ম ?

বাচ্চু ॥ কী ? কী বল্লেন ?

শের আফগান ॥ সেটা বোধহয় ওই নিয়ম—যে নিয়মে আমি পড়ে যেতে পারি, মরে যেতে পারি কিংবা এমনি করেই শের আফগান হয়ে থাকতে পারি চিরকাল।

ছায়া ॥ বিশ্বাস করো আমি জানতাম না। আমি এই প্রথম শুনলাম।

শের আফগান ॥ ওটার বোধহয় কোনো নিয়ম নেই না! ওটা বোধহয় ঠাট্টা।

ছায়া ॥ কিন্তু কে করেছে ? তুমি নাম বল ?

শের আফগান ॥ আজ এই এত বছর পরে সে কথা জেনে লাভ ? তাদের সবারই ঐ ভোজসভায় নিমন্ত্রণ ছিল। তারা নিশ্চিন্তে খেয়ে যাচ্ছিল যাতে আমি যখন পৌঁছুব তখন যেন তারা সহজেই আমার সামনে দিয়ে চলে যেতে পারে। যাবার সময় আমাকে অল্প একটু সহানুভূতির হাসি হেসে যাবে—এই ছিল তাদের মতলব। বাঃ বাঃ এরই নাম বন্ধুত্ব। ডাক্তার, পাগল হয়ে থাকতেই আমার ভাল লাগে। কেননা আমার এই পাগলামি আর একজনের আনন্দের প্রকাশ। আমি পাগল হয়ে সেই শক্তি অনড় পাথরটার ওপরে শোধ নিচ্ছি, যে পাথরে আমার

বন্ধু, আমার মাথা ঠুকে ভেঙে রক্তাক্ত করে দিতে চেয়েছিল। আর এই নিঃসঙ্গতা, এই নিঃশব্দ নিঃসঙ্গতা। চোখ মেলতেই দেখলাম চারিদিক ফাঁকা, কালো, অন্ধকার। আমি ভাবলাম বেশ তো একটা অন্য কিছু করা যাক। অন্য কিছু মানে আমি ঠিক করলাম যে আমার সেই ভাল লাগা রঙ্গমঞ্চের সমস্ত হাসি, গান, আলোকে আমি রোজ এখানে নিংড়ে বের করবো। বেগম সাহেবা, ঐ তো তুমি, পঁচিশ বছর আগের তুমি। যখন তোমার শুধু জেতবার পালা ছিল তখনকার তুমি। নমস্কার। তোমাদের সবাইকেই সকৃতজ্ঞ নমস্কার। তোমরা সবাই আমার সামনে সেই ভালোলাগা রঙ্গমঞ্চের দিনগুলোকে মূর্ত করে তুলেছিলে। অবিশ্যি ঠাট্টা করেই করেছিলে। কিন্তু আমি তো ঠাট্টা ভাবিনি তাই আমি সব কিছুকে সত্যি করে তুলেছি। পাগলামির সত্যি। এখানে, এই ঘরে, এই দরবারে, এই সিংহাসনে, এই সব পোশাক পরে, এই সভাসদদের নিয়ে—বিশ্বাসঘাতক সভাসদদের নিয়ে। (সভাসদদের প্রতি) আচ্ছা, আমি যে সেরে গেছি—একথা জানিয়ে তোমাদের কী লাভ হল? এতে তো তোমাদের চাকরি গেল। তাই না? কী জানো: কাউকে বিশ্বাস করাই হচ্ছে আসল পাগলামি!

বলরাম॥ বাঃ, বেশ বলেছে, না?

শের আফগান॥ যাও, যাও আজ তোমাদের সবাইকে আমি ক্ষমা করলাম। এই পোশাক তো আমি নিজে পরেছি। এই রং তো আমি নিজে মেখেছি। এটাই তো আমার জীবন। তোমার অনিচ্ছায় আর ক'বছর থাকবে আমার সঙ্গে? জানো

ডাক্তার, কয়েক বছর আগে আমি ও-ঘরের ঐ জানলা দিয়ে বাইরে ঐ পার্কটার দিকে তাকিয়েছিলাম। তখন খাঁ খাঁ করছে দুপুর। দেখলাম যে একজন সাধুবাবা পার্কে একটা গাছের ছায়ার নীচে বেঞ্চিতে শুয়ে ঘুমোচ্ছিলো। তখন কর্পোরেশন স্কুলের ছুটি হয়েছিলো। কতকগুলো বাচ্চা যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। তারা পার্কের কোণের বাগান থেকে একটা করে গাঁদা ফুল তুললো। ওরা সাধুবাবার সামনে কী একটা জটলা করলো। তারপর ওদের মধ্যে সবচেয়ে সাহসী বাচ্চাটা ঐ ফুলটা নিয়ে সাধুবাবার গলায় একটা সুড়সুড়ি দিল। সাধুবাবা ঘুম থেকে উঠে বসলো! কী হাসি হাসি মুখ তার। যেন তার স্বপ্নের সমস্ত হাসিটা ওর মুখে মাখানো। সেই মুহূর্তে ওযে একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী—সে-কথাটা ভুলেই গিয়েছিল। কিছুক্ষণ বাদেই ও আবার সন্ন্যাসীসুলভ ভাবে গম্ভীর হয়ে গেল। ঐ সন্ন্যাসীটা যেমন তার ধর্মের খাঁচার মধ্যে থাকতে ভালবাসে আমি তেমনি ইতিহাসের খাঁচার মধ্যে থাকতে ভালবাসি। জান হে, বরং তোমাদের জন্যেই আমার দুঃখ হচ্ছে। তোমরা এই পৃথিবীতে কখন কী হবে, ত্যাখোনা, জানোনা।

বলরাম॥ ও, তাহলে ছেঁটেকেটে ব্যাপারটা এই দাঁড়াল যে আমরা হচ্ছি পাগল।

শের আফগান॥ তাই যদি না হবে তাহলে এতদিন বাদে তুমি অন্তুতঃ ওকে সঙ্গে করে আমার সামনে আসতে পারতে না।

বলরাম॥ সত্যি কথা বলতে কি এখানে আসার আগে অব্দি তো আমার ধারণা ছিল তুমি পাগলই।

শের আফগান ॥ আর তোমার স্ত্রী ?

বলরাম ॥ উনি, ঠিক কী ভাবে বলা যায় ? উনি তোমার বক্তৃতায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেছেন। কী গো বোরখাটাতো পরাই আছে, এখানে ওর সঙ্গে থেকে পাগলামি করে বাকী জীবনটা ওর সঙ্গেই কাটিয়ে দাও।

ছায়া ॥ আঃ কী হচ্ছে কি, বাচ্ছা-বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সামনে।

[প্রভাত বেরিয়ে যায়]

শের আফগান ॥ থাক থাক, বলুক না। ওতো চিরকালই আমাকে ঠাট্টা করে এসেছে। আজ ডাক্তার বারণ করেছে বলেই কি শুনবে ? ঐ নূরজাহান নাটকের ফার্স্ট এ্যাক্ট-এর শেষে কে যে আমার দোলনার দড়িটা কেটে দিয়েছিল, তুমি তো আমার বন্ধু, তুমি তো জানতে, তুমি তো আমাকে বলনি। না না, আমি কাউকে বলব না। কারণ, কি হবে তোমাদের জীবনের কথা ভেবে, যে জীবনে তোমরা বুড়ো হয়ে গেছ। ডাক্তার, যাকেই তুমি আমার পোশাক পরাও না কেন আমি তো জানি যে আমি যা অন্য কেউ তা হতে পারে না। কেননা, আমি শের আফগান। গত পঁচিশ বছর ধরে তাই। পঁচিশ বছর ধরে আমি এই রং মেখেছি, এই পোশাক পরেছি। আর পঁচিশ বছর ধরে এই মেহেরুন্নিসা আমার সঙ্গে বাস করেছে আর ওর দিকে তাকিয়ে দেখ, ও এখন পরস্ত্রী। [পেছন থেকে আবহসঙ্গীত ভেসে আসে] কি খুকী, খুব ভয় পেয়ে গেছ, না ? ওরা বুঝতেই পারেনি যে আমি ওদের কথা মানবো না। না মানবো না। এতদিন তুমি এখানে স্থির, স্তব্ধ হয়েছিলে। ছবি, ছবি, তুমি জীবন পেয়েছে। তুমি সত্যি। তুমি আমার, তুমি আমার। গত পঁচিশ বছরের অধিকারে তুমি আমার। (মিঃ মুখার্জী বাধা দিতে যায়)....রোখো, মেরা হুকুম।

[শের আফগান লাথি মারে বলরামকে, বলরাম পড়ে যায়, সভাসদরা তরোয়াল উঁচিয়ে বলরামের চারিপাশে ঘিরে দাঁড়ায়। প্রভাত ঢুকে শের আফগান-এর সামনে দাঁড়ায় হঠাৎ বলরাম ছুটে গিয়ে আবার ছাড়াতে যায়]

বলরাম॥ ওকে ছাড়। ছেড়ে দাও। খুব ভাল বুঝতে পেরেছি তুমি কখনও পাগল নও।

[শের আফগান হঠাৎ প্রভাতের কোমর থেকে তরোয়াল বার করে বলরামের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। সবাই মিলে বলরামকে ধরে ফেলে—বলরাম 'না, ও পাগল নয় ও পাগল নয়' 'বলতে থাকেন। ছায়া—ও পাগল হয়ে গেছে। পাগল'—বলতে বলতে বেরিয়ে আসেন। শের আফগান জোরে হাসতে থাকেন সিংহাসনের পেছনে দাঁড়িয়ে। সবাই বেরিয়ে এলে ছায়া হঠাৎ খুব জোরে কেঁদে উঠবেন। সঙ্গে সঙ্গে শের আফগান-এর হাসি বন্ধ হবে সুকুমার ও সাধন ডানদিকের উইং দিয়ে ঢুকে দাঁড়ায়]

শের আফগান॥ একি! রক্ত! এই শোন, শোন। (সভাসদ তিনজনকে) এতক্ষণে আমি বুঝতে পেরেছি আমি কী করেছি এখন তো আমাকে শের আফগান সেজে থাকতে হবে চিরকাল তোমরা কেউ আমাকে ছেড়ে যেওনা। কেউ যেও না। কাছে থাক। থাক।

[পেছনে Music বাজতে থাকবে। শের আফগান পা-দানির সামনে বসে বাঁহাত প্রভাতের ঘাড়ে, ডান হাত সুকুমার ও সাধনের ঘাড়ে! সভাসদ তিনজন শের আফগান-এর কোলে মুখ গোঁজে। Music বাজতে থাকবে। এমন সময় সমাপ্তিসূচক পর্দা]

—